"প্রদীপের নীচেই অন্ধকার"



নিখিল সরকার
প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

কপিল নাচছে (গল্প)
ছায়া
ছোটবাবু
জীবন্ত
দ্বিতীয় ইনিংসের পর
দূরদৃষ্টি
ভালো ছেলে
সবাই যাচ্ছে
সাদা খাম

ছায়া সরণীতে রোহিণী

লালবাজার মোড় থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার পুবে বৌবাজার স্ট্রিটে ট্রামের তার ছিঁড়ে পাঁচ-ছ'টা ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের দু'পাশ দিয়ে বাস, মিনিবাস এবং অন্যান্য গাড়ি ফুড়ুত করে বেরিয়ে যেতে গিয়ে সামনে থেকে আসা ট্র্যাফিকের মুখোমুখি হয়ে রাস্তাটা এখন অচল করে ফেলায় গাড়ির পিছনে গাড়ি জমতে জমতে লালবাজার মোড় পর্যন্ত জ্যামের জের পৌঁছে গেছে। জনা চারেক ট্র্যাফিক কনস্টেবল ও একজন সার্জেন্ট ছুটে এসে কলকাতার এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটাকে চালু করার জন্য হিমসিম খাচ্ছে। কে জানে, পুলিশের কোন বড়কর্তা বা কোন মন্ত্রী জ্যামে আটকে পড়ল কিনা!

অপেক্ষা থেকে নিস্তার পাবার জন্য কিছু গাড়ি পাশের গলিগুলোয় ঢুকে পড়ছে। তাড়া আছে এমন মানুষেরা গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেছে। পরনে হালকা নীলের উপর সাদা নকশা সুতির শাড়ি, গায়ে ফিকে গোলাপী কার্ডিগান এবং কাঁধে মোটা কাপড়ের একটি রঙিন ঝুলি নিয়ে এক রমণী ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে নামল। ফুটপাথ ধরে সে দ্রুতপায়ে বিবাদি বাগের দিকে এগোবার চেষ্টা করল ভিড়ের মধ্য দিয়ে।

যদিও জানুয়ারির শেষ, কিন্তু কলকাতায় এবার শীত তেমন ভাবে আসেনি। এখন দুপুর আড়াইটে, রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। বিকেলে ফুরফুরে হাওয়া বইলে ভালই লাগে। বোধহয় বসন্ত এবার দু-তিন সপ্তাহ এগিয়ে আসবে। অবশ্য লালদিঘিতে যে ক'টা গাছ রয়েছে তাদের ভাবগতিক দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। ক্যালেন্ডারি মতে বসন্ত না এলে তারা যেন শীতবস্ত্র গা থেকে নামাবেই না। কিন্তু এই দুপুরে কর্মব্যস্ত অফিস পাড়ায় শীত-বসন্ত নিয়ে কেউই মাথা ঘামাচ্ছে না। ট্র্যাফিক অচল হওয়ায় সবাই বিরক্ত। এরই মধ্যে হালকা নীল ছাপা শাড়ির রমণী যেন একটুকরো বসন্ত। তার দিকে যারই চোখ পড়ছে, দ্বিতীয়বার তাকাতে হচ্ছে।

রমণীর দ্রুত গমন-চেষ্টা পদে পদেই ব্যাহত হচ্ছে। কলকাতার যে কোন ফুটপাথের মত এটিও টেলিফোন, ইলেকট্রিক, কর্পোরেশন, সি এম ডি এ প্রভৃতি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ধর্ষিত। গর্ত, ঢিপি, ইঁট, কাদা প্রভৃতির জন্য পদক্ষেপে সতর্ক থাকায় বাধ্য হয়েই চলার বেগ মন্থর করতে হয়েছে। ফলে তার গমন ভঙ্গিতে কবুতরীর আদল এসেছে। তার উপর রমণীর দেহ পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চ, যেটা বাঙালি মেয়েদের গড়পড়তা উচ্চতার থেকে বেশি। ঈশ্বরের এবং সেই সঙ্গে নিজের চেষ্টায় দেহ-কাঠামোটি যেভাবে ভরাট হয়ে রয়েছে, তাতে মনে হয় দুর্বলচিত্তের পুরুষদের সঙ্গে নির্মম রসিকতা করার জন্যই যেন এই দেহটি নির্মিত। বস্তুত এই ট্র্যাফিকের জট-সমস্যা সমাধানে যে সময় লাগবে, তার থেকেও দশ বা পনেরো সেকেন্ড সময় বেশিই লাগবে এবং সেজন্য কর্তব্যে ব্যস্ত সার্জেন্টটিকে দোষারোপ না করে এই রমণীর রচনাকারকেই দায়ী করা

উচিত। সার্জেন্টের অনুসরণে মিনিবাসের ড্রাইভার অ্যাক্সিলেটরে পায়ের চাপে আন্দাজের গোলমাল ঘটিয়ে সামনের স্টেটবাসের পিছনে যে ঢুঁ মারল, বলাবাহুল্য সেজন্য একজনই দায়ী।

রমণীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন সে জানেই, তার উপস্থিতি পুরুষ-চিত্তের কাজকর্মে কী ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে। মুখে হালকা প্রসাধন, কিন্তু সদ্য অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠা রোগীর মতই যেন তার দুগ্ধহীন কফি রঙের মুখের ত্বক দুর্ভাবনায় শুকনো। ভাল করে লক্ষ করলে দুটি চোখের ঘন কালো মণিতে ত্রাসের ছায়া দেখা যাবে। দূর থেকে যা বিনিদ্র রাতের ক্লান্তি বলে মনে হচ্ছে।

রবীন্দ্র সরণির মোড় পার হয়ে লালবাজারের পুলিসী সদর দফতর অতিক্রম করে সে রাধাবাজার যাওয়ার গলিতে ঢুকল এবং চলার গতি দ্রুত করল। কাঁধ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত কালো রেশমের মত কেশ ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে অথচ মহাদেবের ডমরু সদৃশ দেহটির গড়নে দ্রুত গমনজনিত কোন বেতালা অসঙ্গতি ফুটে উঠছে না। নিতম্বের উচ্ছ্বাস নিয়মিত ছন্দেই উত্থিত হয়ে স্তিমিত হয়ে চলেছে। নাভির নিচে শাড়ির ভাঁজগুলি প্রশস্ত সানুদেশের উপর বিছানো। তার দেহের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে বিস্তারের কোন বিবাদ নেই এবং অচঞ্চল ভঙ্গিতে গ্রীবা ও চিবুক তুলে সে হেঁটে চলেছে। পদক্ষেপের দৃঢ়তাই জানান দিচ্ছে তার পায়ের পেশি বলিষ্ঠ।

এই গলিতে নানাবিধ ঘড়ির দোকান দুধারে। মনোহারি দেয়াল ঘড়িতে দোকানগুলি যেভাবে শোভিত, তা বহু লোকই গতি মন্থর করে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। রমণী দোকানে ঢুকল। বিক্রয়কারিণী সিড়িঙ্গে চেহারার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বালিকা। রাগী সিংহের মত তার চুলগুলি ফাঁপানো। রমণী পরিচ্ছন্ন ইংরাজিতে তাকে বলল, "ছ' দিন আগে পুরুষদের একটি রিস্টওয়াচ সারাতে দিয়েছিলাম, আজ সেটি দেবার তারিখ।" এই বলে সে ঝুলি থেকে একটি ছোট চামড়ার পার্স বার করে তার থেকে বিল বার করল।

নম্বর দেখে শো-কেস থেকে একটি চৌকো স্বর্ণাভ দামী ঘড়ি তুলে নিয়ে বিক্রয়কারিণী সুন্দর করে হাসল। তার দাঁতগুলি শ্বেত প্লাস্টিকের মত এবং সাজানো। সম্ভবত তার চাকুরি দাঁতের জন্যই। দাম চুকিয়ে রমণী দোকান থেকে বেরিয়ে দুধারে সন্তর্পণে তাকাল। তারপর আবার দ্রুতগতিতে ব্রেবোর্ন রোডে পৌঁছে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

বড় বড় কয়েকটি অফিস-বাড়ি এবং দুটি রাস্তা অতিক্রম করে সে সাততলা একটি বাড়িতে ঢুকল। দশ-বারোটি অফিস এই বাড়িতে, কিন্তু লিফট মাত্র একটি। লিফটের দরজায় লাইন দিয়ে জনা দশেক অপেক্ষমাণ। রমণী তাদের দিকে একনজর তাকিয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।

লোকগুলি নেহাতই ষড়রিপুর দাস। তাই চোরাদৃষ্টিতে রমণীর সিঁড়িভাঙা দেখতে গিয়ে শ্বাস রোধ করে রইল এবং তাদের দ্রষ্টব্য বস্তুটি চোদ্দ ধাপ অতিক্রম করে সিঁড়ির বাঁকে অন্তর্হিত হওয়ার পর নিশ্বাস ফেলে হাঁপ ছাড়ল।

"এত বড় বাড়িতে দুটো লিফট থাকা উচিত।" এক মধ্যবয়সী মন্তব্য করল। "জরুরী কাজ রয়েছে অথচ—"

"লিফটম্যানটা বরাবরই এই রকম, উঠলে আর নামতে চায় না, রিপোর্ট করা উচিত।" যুবকটি এই বলে বন্ধ কোলাপসিবল দরজার কাছে এসে মাথা বাঁকিয়ে উপর দিকে

দ। "নাহ্, পাত্তাই নেই...হেঁটেই উঠি।" এই বলে সে লাইন ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে আড়াই তলা বরাবর পৌঁছে রমণীকে দেখতে পেয়েই লাফানোর বেগ কমাল। ধুতি-শার্ট পরা এক শীর্ণকায় লোক উপর থেকে নেমে আসছে, তাকে দেখে রমণী থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল "সাহেব আছেন?"

"আছেন," লোকটি মাথা কাত করল ঈষৎ সম্ভ্রমভরে।

রমণী তিনতলায় পৌঁছে বাঁ দিকের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। দরজার পাশে একটা কাঠের চৌকো টুকরোয় শাদা বড় অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা: ইস্টার্ন ম্যাগাজিনস প্রাইভেট লিমিটেড। তার নিচে আর একটি কাঠে ইংরাজিতে লেখা : বরুণা প্রিন্টার্স। তার পাশের কাঠে উপর থেকে নিচে ইংরাজিতেই তিনটি ম্যাগাজিনের নাম : চিত্ররেখা। মহারানী। শৈশব। নামগুলি তিনরকম রঙে, হলুদ, গোলাপী ও গাঢ় কমলায় লেখা।

এই অফিস ইস্টার্ন ম্যাগাজিনসের বৃহৎ দেহকাণ্ডের শুধু মুখটুক। এখানে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক তিনটি ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় দফতর ছাড়াও আছে সার্কুলেশন, অ্যাকাউন্টস ও বিজ্ঞাপন বিভাগ। এছাড়া বাঁধাই ও ছাপার এবং কম্পোজিং ও প্রসেসিংয়ের কাজকর্ম হয় বেলেঘাটায়। ফোটো বিভাগটিও সেখানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে প্রায় এক বিঘে নিজস্ব জমিতে প্রেসবাড়ি, গুদাম ও গ্যারাজ। সম্প্রতি আর্ট বিভাগটিও সেখানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ব্রেবোর্ন রোডের অফিস থেকে। বাচ্চাদের জন্য শৈশব নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হচ্ছে। দফতর করতে জায়গা চাই, তাই এই স্থানান্তর। প্রয়োজন হলে আর্ট ডিরেক্টর শম্ভু দত্তকে বেলেঘাটা থেকে ডেকে পাঠানো হয়।

বিরাট একটা ঘর, যার আয়তন দেড়খানা ভলিবল কোর্টের সমান। তিনতলার অর্ধেক নিয়ে ইস্টার্ন ম্যাগাজিনস। ঘরের দেয়াল সংলগ্ন কাঠের পার্টিশান দেওয়া কামরাগুলিতে তিনটি ম্যাগাজিনের দফতর। মাঝখানটিও গলা-সমান উঁচু কাঠের দেয়ালে ঘেরা। সেখানে মোটামোটা লেজার বই, স্টিলের চারটি আলমারি, লোহার র‍্যাক, আর নানান আকারের খাতা, ফাইল, চিঠিপত্র, ভাউচার ইত্যাদি নিয়ে ব্যবসায়িক কাজ চলে ছোটবড় সাতটি টেবিলে।

ইস্টার্নের মালিক, কর্ণধার এবং ব্যবসাটিকে বিরাট করে তোলার জন্য সব কৃতিত্বের অধিকারী গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামরা ব্রেবোর্ন রোডের দিকে উত্তর-পশ্চিম কোণে। নীল কার্পেট, এয়ারকুলার, দেয়ালে ফেল্টের বোর্ড, তাতে ম্যাগাজিনের মলাট পিন দিয়ে আঁটা ও মোটা কাঁচে ঢাকা টেবিল, যাতে ছয়জন বসে খেতে পারে। কাঠের গ্লাসে কলম, তাতে নানা রঙের ও ধরনের পেন্সিল। লাল ও জলপাই রঙের দুটি টেলিফোন, টেবল ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি এবং স্লিপের প্যাড, এই ক'টিই টেবিলের স্থায়ী জিনিস, অবশ্য সকাল ন'টায় গঙ্গাপ্রসাদ চামড়ামোড়া ঘূর্ণি চেয়ারে বসার পর থেকেই টেবল ভরে উঠতে শুরু করে নানান ধরনের দরকারী কাগজে। তিনটি চেয়ার ছাড়াও দেয়াল ঘেঁষে আছে অতিথিদের বসার জন্য দামী কাপড়ে মোড়া পুরু ফোমের গদি আঁটা জলচৌকির মত আসন ও ঠেশ দেওয়ার বালিশ।

গঙ্গাপ্রসাদ সাদাসিধে ধরনের। যতটুকু না হলেই নয়, শুধু ততটুকুরই পক্ষপাতী। প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ বলেই নিজের কামরাটিকে মূল্যবান, সুদৃশ্য জিনিস দিয়ে সাজাতে হবে এমন চিন্তা তিনি করেন না। যতটুকু সজ্জা বা আসবাব, সেটা তাঁর স্ত্রী বরুণার নির্দেশে

হয়েছে। স্ত্রীকে তাঁর ভয় পাওয়ার ও ভালবাসার কথা অফিসের বেয়ারাও বরুণার জন্যই তাঁকে টাই পরে বাড়ি থেকে বেরোতে হয় এবং অফিসে পৌঁছে গাড়ি নামার আগে সেটি খুলে তিনি পকেটে রেখে দেন। একবার টুপি পরার প্রস্তাব বরুণা দিয়েছিল এবং গঙ্গাপ্রসাদ ঢোঁক গিলে বলেছিলেন, "গরমের দেশে ওসব মাথায় দিলে চুল উঠে টাক পড়ে।" বরুণা সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

আটানব্বুই কিলোগ্রামের সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতার শরীরের ভার চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ এখন প্রকাশিতব্য বাচ্চাদের ম্যাগাজিন 'শৈশব'-এর প্রথম সংখ্যার জন্য নির্ধারিত মলাটের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে। টেবলে ছড়ানো আরো দুটি ওই একই মলাট, তবে রঙের ভিন্ন সমন্বয়ে। কোন রঙেরটি দিয়ে শৈশব শুরু হবে, তার চূড়ান্ত নির্বাচনে তিনি ব্যস্ত বা চিন্তায় মগ্ন।

আর্ট ডিরেক্টর শম্ভু দত্ত দশ মিনিট ঠায় বসে। মাঝে দু'বার কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রূকুটি দেখেই গভীরভাবে মলাট অধ্যয়নে নিজেকে নিযুক্ত করে টেবলের অপর দিকের চিন্তাস্রোত কোন খাতে বইছে, সেটা আড়চোখে বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রূ যতটা উঠেছে, ঠিক ততটাই ঝুলে রয়েছে দুই স্তরে চর্বির চিবুক। গোলাকার বিরাট মুখটিতে ঘামের বিন্দু ফুটেছে। আনমনে গঙ্গাপ্রসাদ বন্ধ এয়ারকুলারের দিকে তাকাতেই শশব্যস্ত শম্ভু দত্ত বলল, "চালিয়ে দেব ?"

"না। কিন্তু তুমি যে কেন ওই কালো রঙের ত্যারচা দুটো স্ট্রিপ কোণে রাখতে চাইছ বুঝছি না।" গঙ্গাপ্রসাদ হাতের মলাটটি টেবলে ছুঁড়ে ফেলে বললেন। ড্রয়ার টানলেন রুমাল বার করার জন্য। সাত আটটি রুমাল সেখানে।

"তাহলে কি তুলে দেব ?" শম্ভু দত্ত ক্ষীণস্বরে জানতে চাইল। গঙ্গাপ্রসাদ ছয় বছর আগে প্রথম যখন চিত্ররেখা প্রকাশ করে ম্যাগাজিন ব্যবসায়ে নামেন, শম্ভু দত্ত তখন থেকেই রয়েছে। সে জানে, তর্ক করে লাভ নেই।

"কালো রঙটার বদলে মেরুন দাও। আর এই বাচ্চাটার জাঙিয়াটা...।" গঙ্গাপ্রসাদ আবার ভ্রূ কোঁচকালেন, "খুলে দিলে কেমন হয়, পেছন ফিরেই তো রয়েছে।"

শম্ভু দত্ত চোখ সরু করে মলাটে দৃষ্টি রাখল। জাঙিয়াপরা, আদুড় গা, একটি শিশু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার জন্য প্রথম ধাপে পা রেখেছে। কয়েক ধাপ উপরে দুটি কিশোর-কিশোরী সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে যেতে পিছনে হাসিমুখে শিশুটির দিকে তাকিয়ে। পরিকল্পনাটা গঙ্গাপ্রসাদেরই, অর্থাৎ বরুণার। শৈশব ধরতে চায় কৈশোরকে।

"বুবুনের ছোটবেলার এইরকম একটা ছবি আছে।" গঙ্গাপ্রসাদের স্বর কোমল ও গাঢ় শোনাল। "ওর মায়ের তোলা। কলকাতায় চৌবাচ্চার পাড়ে রাখা বালতি ধরার জন্য যেই দু হাত তুলেছে আর তখনই পিছন থেকে স্ন্যাপ নিয়েছিল। আমরা তখন দর্জিপাড়ার বাড়িতে থাকি। আজও যখন ছবিটা দেখি, ইচ্ছে করে কোলে নিয়ে খুব একচোট ধামসাই। যা নাদুসনুদুস ছিল। অথচ সেই বুবুন এখন জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। দেখ শম্ভু, ম্যাগাজিন তো আর বাচ্চারা পকেট থেকে পয়সা বার করে কিনবে না, কিনবে তাদের বাবা-মা। ফিগারটা ভালই হয়েছে, তুমি বরং জাঙিয়াটা খুলে দাও, বাৎসল্য রসকে ইনভাইট কর। দেখলেই কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে করবে এমনভাবে বাচ্চাটাকে প্লেস কর, পাছা দুটো নরম নরম করে দাও।"

মলাটটা আবার তুলে নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। সেই সময় দরজা

সন্তর্পণে মুখ বাড়াল সেই রমণী, যাকে কিছুক্ষণ আগে হেঁটে আসতে দেখা গেছে। "আসব ?"

গঙ্গাপ্রসাদ মুখ তুলে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "আরে রোহিণী, তোমার কথাই ভাবছিলুম। এসো এসো, একটু পরামর্শ দাও তো।"

রোহিণী কাঁধ থেকে ঝুলিটি নামিয়ে শম্ভু দত্তর পাশের চেয়ারটিতে বসামাত্র গঙ্গাপ্রসাদ মলাটটি তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই বাচ্চাটাকে তোমার কেমন লাগছে ? টেন্ডার, সুইট, সফট নয় কি ?"

রোহিণী একঝলক তাকিয়ে স্মিত হেসে মাথা নাড়ল।

"জাঙিয়াটা খুলে দিলে কেমন হয় ! এইটুকু বাচ্চার কি সেক্স থাকে ?"

"না না, ওটা থাক।" রোহিণী ব্যস্ততা দেখাল না বটে তবে কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

গঙ্গাপ্রসাদ অপ্রতিভ হয়ে শম্ভু দত্তর ভাবলেশহীন মুখের দিকে বার কয়েক আড়ে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন, "কিন্তু আমার কেমন যেন একটা আদর করার ইচ্ছে...বুবুনের ছবিটা মনে পড়ার জন্যই বোধহয়...।"

শম্ভু দত্ত ইতিমধ্যে রোহিণীর সমর্থন পেয়ে সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছে। সে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "পয়সা দিয়ে যারা পাঁচ টাকার ম্যাগাজিন কিনবে, তারা মোটামুটি সচ্ছল, শিক্ষিতও। নিশ্চয় রুচিও আছে। তারা কি বাড়িতে বাচ্চাদের ন্যাংটো রাখে বা এইভাবে দেখতে চায় ? সাধারণত বস্তিটস্তি বা গ্রামট্রামে গরিবঘরের ছেলেপুলে ন্যাংটো থাকে।"

"আমি ঠিক সেদিক থেকে ভেবে 'না' বলিনি।" রোহিণী মুখ ঘুরিয়ে শম্ভু দত্তর দিকে তাকিয়ে বলল। "বাচ্চাটা জাঙিয়া পরেছে বলেই দেখতে ভাল লাগছে, আর এটাই তো প্রধান বিবেচ্য বিষয়—ভাল লাগা, তাই তো ?"

"নিশ...চয়।" গঙ্গাপ্রসাদ টেবলে চাপড় মারলেন। "ঠিক আছে শম্ভু, তাহলে আর ওটা খোলার দরকার নেই।"

মলাটগুলো গুছিয়ে নিয়ে শম্ভু দত্ত দ্রুত বেরিয়ে গেল।

"তোমার এবারের মহারানীর লেখাটার টাইটেল একটু বদলে দিয়েছি, দেখেছ ?"

"হ্যাঁ ভালই হয়েছে।"

"একটু বেশি কাব্য কাব্য হয়ে গেছিল। লেখার বিষয় বা বক্তব্যটা আঁচ করতে অসুবিধে হচ্ছিল। সোজা সহজ আর ক্যাচি হওয়া দরকার, চোখ পড়লেই কৌতূহল জাগবে এমন টাইটেল চাই। চা খাবে ?"

"না।"

"লিম্বু পানি ? পাতিলেবুর রস, গোলমরিচ, সন্ধব নুন আর চিনি দিয়ে ?"

"চিনিটা বাদ।"

টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। সেকেন্ডের মধ্যেই ঘরে ঢুকল সেই ধুতি-শার্ট পরা শীর্ণকায় লোকটি, সিঁড়িতে রোহিণীর সঙ্গে যার দেখা হয়েছিল।

"কমল, দু' গ্লাস লিম্বু পানি, একটা চিনিছাড়া।"

কমল বেরিয়ে যেতেই গঙ্গাপ্রসাদ জানতে চাইলেন, "মীনা চ্যাটার্জির সঙ্গে আজ তোমার ইন্টারভিউ না ?"

"সাতটায়। টিভি সিরিয়ালেও নামছে, তাই নিয়ে নাকি ব্যস্ত।"

"বড় পর্দা থেকে ছোট পর্দায় ! বোধহয় ফিল্মে আর তেমন সুবিধে হচ্ছে না কি যাত্রায় ?"

রোহিণী ফিকে হাসল। মীনা চ্যাটার্জিকে নিয়ে চিত্ররেখায় ফোটো ফিচারের প্রস্তাব গঙ্গাপ্রসাদেরই দেওয়া। সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠা, যোগব্যায়াম থেকে শুরু করে রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে ড্রেসিং টেবলে বসে মুখ, গলা, হাতের চামড়ায় এটা সেটা মাখা, মোটামুটি শরীরটাকে নানান ভঙ্গিতে দেখাতে হলে যা যা করা দরকার, মীনা চ্যাটার্জির সেই সব করার ছবির এবং একটি সাক্ষাৎকারের জন্য চিত্ররেখা চার পাতা বরাদ্দ করেছে। ওটা পাঁচ বা ছয় পাতাও হয়ে যেতে পারে, যদি ম্যাটার কম পড়ে।

"টি ভি-র জন্য আলাদা একটা বিভাগ চিত্ররেখায় করব ভাবছি। হাজার হাজার পরিবারের মগজে টি ভি জায়গা করে ফেলেছে। ভেবেছি, তোমাকেই এটার দায়িত্ব দেব। তুমি টি ভি দেখ তো ?"

"আমার টি ভি সেট নেই। উপরের চারতলায় আছে, কিন্তু গিয়ে দেখার আর ইচ্ছে হয় না। পরিবারের কর্তাটি একটু জ্বালাতনে।"

"মানে ?"

রোহিণী ঠোঁট চাপল। গালের পেশি একটু শক্ত হল এবং প্রসঙ্গ এড়াবাব জন্য বলল, "আপনি কি টি ভি দেখেন ?"

"ধুর ! সময় কোথায়। ছুটির দিনে ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচ কয়েকটা দেখেছি, দারুণ একসাইটিং। আর একবার রাতে ঢাকার একটা নাটক দেখেছিলাম। বরুণা তো ঢাকারই প্রোগ্রাম দেখে, কলকাতার থেকে নাকি ফার বেটাব। তবে নাটকটায় একটা জিনিস আমাকে স্ট্রাইক করল। ক্যারেক্ট্যাররা সবই মিডলক্লাস শিক্ষিত মুসলমান অথচ 'বাবা-মা' বলল, এমনকি পানি না বলে জলও বলল। পায়ে হাত দিয়ে হিন্দুদের মত প্রণাম করল। উচ্চারণে বাঙালে টানটোন নেই। মনে হচ্ছিল, কলকাতারই কোন হিন্দু পবিবার। তোমাকে একটা পোর্টেবল সেট কিনে দেব, দেখো আর চিত্ররেখায় শুরু কবে দাও।

ট্রে-তে দুটি গ্লাস নিয়ে কমল ঢুকল। ওরা গ্লাস দুটো হাতে তুলে নিল। প্রথম চুমুক দিয়েই গঙ্গাপ্রসাদ "আহ্ হ্" বলে ওঠার পব এবং কমল বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেই রোহিণী ঝুলি থেকে ভাঁজ করা বাংলা একটা খবরের কাগজ বার করে এগিয়ে ধরল।

"আজকের কাগজ। তিনের পাতায়, ফোর্থ কলামের একেবাবে তলায় ছোট্ট খবরটা পড়ুন।"

গঙ্গাপ্রসাদ কাগজটা খুলে উপর দিকের হেডিংগুলোয় চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন, "ভেতরের পাতাগুলো সকালে পড়ার আর সময় হয়ে ওঠে না। রাত্তিরে গিয়ে...।" থেমে গেলেন। তাঁর বিরাট বপু হঠাৎ সামান্য ঝুঁকে পড়ল। কপালে ভাঁজ উঠল। তিনি তীক্ষ্ণ চোখে রোহিণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোন নাম তো দেয়নি।"

"হ্যাঁ, নাম নেই। কিন্তু..." ইতস্তত করে রোহিণী চুপ করে গেল।

"পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, বহরমপুর জেল থেকে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড পাওয়া এক আসামী পালিয়ে গেছে। তাকে ধরার জন্য জোর তল্লাস চলছে। খবরটা নিজস্ব সংবাদদাতার। এইরকম খবরের কোন মানে হয় ? কিসের আসামী, কী তার নাম, কবে জেল ভেঙে পালিয়েছে, সে সব কিছুই নেই। এটা কি একটা রিপোর্ট হল !" গঙ্গাপ্রসাদ কাগজটা বিরক্তিভরে ছুঁড়েই প্রায় টেবিলে রাখলেন।

দু হাতের তালুতে গাল চেপে ধরে গোঁজ হয়ে তাকিয়ে রইলেন দেয়ালের ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে।

"পড়েই বুকটা কিরকম ছ্যাঁত করে উঠল।" রোহিণী প্রায় ফিসফিস করে বলল। "ওকে তো বহরমপুরেই রাখা হয়েছে।"

"কেউ পালালে যে সেটা শোভনেশই হবে, তার কি কোন কারণ আছে ?"

গঙ্গাপ্রসাদ ড্রয়ার খুলে একটা ছোট চামড়া বাঁধানো ডায়েরি বার করে, পাতা উল্টে, লাল ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। ডায়াল করতে করতে বললেন, "রাইটার্সে আই জি প্রিজনস-এর কাছ থেকে খবর পাই কিনা দেখি।"

রোহিণী সিধে হয়ে বসল। হাতের মুঠিতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ঝুলিটা। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল গঙ্গাপ্রসাদের মুখের দিকে।

"হ্যালো, আই জি প্রিজনস-এর অফিস ?...হ্যালো, আমি ইস্টার্ন ম্যাগাজিন থেকে বলছি। আই জি আছেন ?...নেই ? দেখুন, আমি একটা খবর জানতে চাই। আজ কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে : বহরমপুর জেল থেকে একজন যাবজ্জীবনের আসামী পালিয়েছে, ওর নামটা কি আপনারা বলতে পারেন ?...হ্যাঁ ধরছি।"

রোহিণী ঝুঁকে পড়ল টেবলে। টেলিফোনে ওধার থেকে কী খবর দেয়, সেটা যেন সে নিজেই শুনে নিতে চায়।

ফোনেব মাউথপিস হাত দিয়ে চেপে গঙ্গাপ্রসাদ চাপাস্বরে বললেন, "'দেখছি' বলল।" তারপরই, "হ্যাঁ হ্যাঁ কি বললেন ? এখনো কিছু জানেন না ! খবরটা আপনারাও দেখেছেন ! হ্যাঁ, হ্যাঁ...তাহলে কালই খবর নেব। আচ্ছা, ধন্যবাদ, নমস্কাব।" গঙ্গাপ্রসাদ রিসিভার রাখলেন।

"কী বলল, জানে না ?" রোহিণী শ্বাস বন্ধ করে বলল।

"হ্যাঁ। কাল খোঁজ নেব।" অনুত্তেজিত, শান্ত স্বরে কথাগুলো বলে গঙ্গাপ্রসাদ হাসলেন। "মনে হচ্ছে আপসেট হয়ে পড়েছ, ভয় পাচ্ছ ?"

রোহিণী শুধু তাকিয়ে রইল তাব সামনে গোলাকার, স্মিত হাসিতে ভরা, অভয় দৃষ্টিতে, চেয়ে থাকা মুখটির দিকে।

"কত বছর হল ?"

"ছ' বছব।"

"কোন রকম যোগাযোগ কি তুমি রেখেছ ?"

"না। একবারও নয়। আমার কোন দরকার নেই যোগাযোগের, মনে হয় কোনদিন দরকার হবেও না। আর ওর তরফ থেকেও সম্ভবত এই একই বক্তব্য।"

"তোমার মনোভাব দেখছি এখনো একই রয়ে গেছে।"

"বদলাবার মত কোন কারণ তো ঘটেনি।" রোহিণী খবরের কাগজটা তুলে চোখের সামনে ধরল। তার মুখের পেশী কঠিন দেখাচ্ছে।

"তুমি কিভাবে আছ, কোথায় আছ, শোভনেশ জানে না ?"

"না, জানার কথা নয়।"

"তাহলে তো তোমার ভয় পাওয়ার কথা নয়। এই তিরিশ-চল্লিশ লাখ লোকের শহরে একজনকে খুঁজে বার করা কি সহজ ব্যাপার ? তা ছাড়া ওরও তো ধরা পড়ার ভয় থাকবে, অবশ্যই এই পলাতক আসামী যদি শোভনেশই হয়।"

"গঙ্গাদা, আপনি আপনার বন্ধুটিকে ভালই চেনেন, আমার থেকেও ভাল চেনেন।

আপনাদের মধ্যে আলাপ কলেজ-জীবন থেকে, তার মানে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। আমি চিনি মাত্র বিয়ের আগে চার মাস আর তারপরে ছ' মাস।"

একষট্টি বছর বয়সী লোকটি অস্বস্তি ভরে নড়ে উঠে, গলা পরিষ্কার করে বললেন, "শোভনেশ একটু অন্য ধরনের, অদ্ভুত চরিত্রেরই। কতগুলো ব্যাপারে, বিশেষ করে নিজের পেশা ছবি আঁকার ব্যাপারে বড় কঠিন আর নির্মম ছিল।"

"দানব ছিল বলুন।"

গঙ্গাপ্রসাদ আড় চোখে ঘৃণায় দোমড়ানো রোহিণীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হালকা স্বরে বলে উঠলেন, "অতীতটা অতীতেই থাক, এবার বর্তমানের খবর বল। তারপর তোমাদের কদ্দূর, মানে দ্বিতীয়বার আমার উইটনেস হবার চান্সের কদ্দূর?"

শোভনেশের সঙ্গে রোহিণীর রেজিস্ট্রি বিয়েতে গঙ্গাপ্রসাদ সাক্ষী ছিলেন।

"এখনো আমার ডিভোর্স হয়নি। এখনো আমি মিসেস সেনগুপ্ত।"

"যার স্বামী খুনের দায়ে যাবজ্জীবন পেয়েছে, সে তো চাওয়ামাত্রই ডিভোর্স পাবে। কিন্তু তোমরা এগিয়েছে কতটা?"

"আমি এবার হুঁশিয়ার হতে চাই গঙ্গাদা। দশ বছর আগে যে-চোখে পৃথিবীকে দেখতাম, যে-সব ধারণা মানুষ সম্পর্কে কর[illegible]ম, তার অর্ধেকটাই বদলে গেছে। [illegible] সম্পর্কেও এখন আমি অন্য রকম ভাবি। এটা তো ঠিক, এক-একটা মেয়েকে সম্মান মর্যাদা নিয়ে শুধুমাত্র খেয়ে পরে যদি টিকে থাকতে হয়, তাহলে তাকে চালাক হতেই হবে। স্নেহ, মমতা, প্রেম, বন্ধুত্ব, সবকিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে ফেলার বয়স তো আর নেই।"

"তুমি আমার সম্পর্কেও এখন তাহলে সন্দিহান?"

"এই একটা জায়গায় আমি সব থেকে নিরাপদ।" রোহিণী আজ এই প্রথম সহজভাবে হাসল। দেখা গেল বাঁ দিকের গজদাঁতটি। দেহ শিথিল করে চেয়ারে হেলান দিল।

"সত্যিকারের দাদা।"

"আমি তোমার থেকে কত বছরের বড়? ছাব্বিশ, সাতাশ?"

"সব্বোনাশ, তাহলে তো বাবার বয়সী প্রায়!" রোহিণী আঁতকে ওঠার ভান করল। "তাহলে যে গঙ্গাকাকা-টাকা বলতে হয়।"

"শোভনেশের সঙ্গে তোমার বয়সের ডিফারেন্স কত?"

"ঠিক পঁচিশ বছরের।"

"ও আমার থেকে দু বছরের ছোট। আর রাজেনের সঙ্গে তোমার?"

"আমার থেকে ও চার বছরের ছোট, রাজেনের এখন তিরিশ।"

"তোমার তাহলে এখন...।" টেলিফোন বেজে উঠল। বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখে গঙ্গাপ্রসাদ লাল রিসিভার তুললেন।

"ব্যানার্জি। ...ওহ্ বরুণা...হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি পৌঁছব। গোছগাছ এর মধ্যেই করে ফেলেছ? এখন তো মাত্র...।" হাতঘড়ি দেখলেন গঙ্গাপ্রসাদ "পৌনে চারটে। আচ্ছা বাবা আচ্ছা, এখনি যাচ্ছি। ...ঘরে কে রয়েছে? রোহিণী...দিচ্ছি।"

গঙ্গাপ্রসাদ রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরলেন। কে ফোন করছে বলার দরকার হল না।

"হ্যালো।" হালকা গলায় রোহিণী শুরু করল। সে জানে, ওধার থেকে যিনি কথা বলছেন, তাঁকে একাই কথা বলতে দিতে হবে। তার কাজ শুনে যাওয়া।

"বৌদি আমি..."

"রোহিণী, আমরা বিকেলে বাসুদেবপুর যাচ্ছি, গাড়িতে, তিন দিন থাকব, রবিবার রাতে ফিরব, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে, তোমার দাদা অবশ্য কালই ফিরবে কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে রবিবার ফিরবে, একা একা থাকতে ভাল লাগবে না, মোটরে খুব বেশি হলে ঘণ্টা দুই। তুমি তো গ্রামট্রাম দেখোনি কখনো মানে ট্রেন থেকে দেখেছ, তাই তো ? কিন্তু থেকেছ কখনো ? অসম্ভব ভাল লাগবে বিশেষ করে মাঘ মাসের এই সময়টায়। ভোরবেলা মাঠে কুয়াশা, ঘাসে শিশির, খালিপায়ে হাঁটতে যা লাগবে ! হ্যাঁ, খেজুর রসও পাবে, আমাদের প্রায় দশটা খেজুর গাছ, না না এগারোটা ; আর তোমায় মৌরলা মাছ খাওয়াব। আমাদের পুকুরের। ভাজা, চচ্চড়ি, টক, আমিই রাঁধব ; তুমি কি ভাবছ আমি রাঁধতে জানি না ?"

"বৌদি..."

"অ্যাঁ ? মৌরলা কি তোমার পছন্দ নয় ? চিংড়ি ? গলদা যদি ওঠে, তাহলে নারকোল কুরে...তুমি কুচো চিংড়ি দিয়ে মোচার ঘণ্ট খেয়েছ ? হ্যালো, হ্যালো,...তাহলে আসছ তো ? শাড়িটাড়ি সব পাবে ওখানে, সব রাখা আছে, আমি তো ম্যাক্সি পরেই থাকি। অবশ্য আমার ব্লাউজ তোমার গায়ে হবে না, তাতে কিছু আসে যায় না, তুমি খালি গায়েই থেকো, ওখানে পুরুষমানুষ বলে কেউ নেই, তোমার দাদা তো কালই চলে আসবে। আর থাকলেই বা কি, ও মোটেই পুরুষমানুষ নয়, আমি জানি। ভাল কথা, তুমি কি সাঁতার জান ? হ্যালো, হ্যালো, রোহিণী ?"

"বৌদি আমার হার্টের ট্রাবলটা সকাল থেকে বেড়েছে, এখুনি ডাক্তারের কাছে যাব। কি রকম যেন বুকের মধ্যে হচ্ছে...ব্লাড প্রেশারটাও মনে হচ্ছে..." বলতে বলতে রোহিণী তাকাল গঙ্গাপ্রসাদের দিকে। ঘরে ঢুকল অ্যাকাউন্ট্যান্ট ক্ষিতীশবাবু। হাতে কয়েকটা চিঠি। সেগুলো হাত বাড়িয়ে নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ অনুমোদনের ভঙ্গিতে রোহিণীর দিকে মাথা নাড়লেন।

"হ্যালো রোহিণী, হার্টের অসুখ তো অফিসে এসেছ কেন ?"

"মীনা চ্যাটার্জি আজ বিকেলে ইন্টারভিউয়ের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট দিয়েছে।"

"দিলেই যেতে হবে ? এখুনি তুমি বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাক।"

"ডাক্তারের কাছে যাব না ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তার দেখিয়েই...নিশ্চয় গুচ্ছের ক্যাপসুল লিখে দেবে, ওগুলো কিনেই বাড়ি গিয়ে খাবে। তুমি কিছু ভেব না, এই বয়সে মেয়েদের হার্টের অসুখ আবার হয় নাকি ? বরং তোমায় দেখলেই পুরুষদের..."

"ওহ্, বৌদি আবার...।"

"রোহিণী" ওধার থেকে হঠাৎ স্বরটা ফিসফিসে হয়ে গেল। "তোমার দাদা কি টাই পরে আছে ?"

"অ্যাঁ, কি বললেন ?" গলা চড়িয়ে চিঠিতে মগ্ন গঙ্গাপ্রসাদকে শুনিয়ে রোহিণী বলল, "দাদা টাই পরে আছেন কিনা ?"

চমকে গঙ্গাপ্রসাদ মুখ তুললেন এবং নিমেষে কোটের পকেট থেকে টাইটা বার করে হাতে ঝুলিয়ে রোহিণীকে দেখালেন।

"দাদা তো পরেই রয়েছেন।"

"কী রঙের ?" ওধারের স্বরে সন্দেহ।

"মেরুন জমিতে সোনালী আর কালো স্ট্রাইপ।"

"আচ্ছা, এখন তুমি তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে চলে যাও, দেরি করো না। পরের বার যখন বাসুদেবপুর যাব তোমাকে নিয়ে যাব, ওখানে ভাল রেস্ট পাবে।"

রিসিভার রেখে রোহিণী বড় করে শ্বাস ফেলল। ক্ষিতীশবাবু বেরিয়ে যেতেই গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "বরুণা খুব সরল, ভাল মনের।"

রোহিণী শুধু হাসল। এতক্ষণ যত কথা সে বলেছে আর শুনেছে, তার মধ্যে অস্বস্তিটা চাপা পড়ে ছিল। ঘরটা হঠাৎ নীরব হয়ে যেতেই সে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল।

"লোকটা যদি শোভনেশ হয়..."

"তাতে কি হয়েছে? তোমার ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই।"

"প্রথমে আমারই খোঁজ করবে।"

"কোথায় পাবে তোমায়?"

"এই অফিসটা ও চেনে।"

"আমার কাছে আসবে? আসুক। আমি বলব, রোহিণী কোথায় আছে আমি জানি না। ফেরারিকে আশ্রয় দেবার প্রশ্নই ওঠে না। পুলিশকে ডেকে ধরিয়ে দেব না, তবে পুলিশের ভয়টা দেখাব। কিন্তু তার আগে জানতে হবে ফেরারি লোকটা কে?"

"আপনি কাল সকালে ফিরছেন। আমি অফিসে ফোন করে জেনে নেব।"

"অত ঘাবড়াচ্ছ কেন বল তো? তুমি এখন একটু অন্য কোন ঘরে বসো, দু জন ভিজিটার আসবে।"

"আমি মহারানীর ঘরে থাকব। তারপর ইডেনে যাব। রাজেনের নেট প্র্যাকটিস আছে, পরশু জয়পুর যাবে।"

"আমি তো বাড়ি যাব। ভালই হল, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

॥ দুই ॥

বি সি রায় ক্লাব হাউসের সামনে রোহিণীকে নামিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "টিভি-র জন্য নতুন বিভাগটার কথা মাথায় রেখ। একটা সেট তোমার ওখানে পাঠিয়ে দেব।"

গাড়িটা সোজা বাবুঘাটের দিকে চলে গেল। গঙ্গার ধার দিয়ে দক্ষিণে যাবে। গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ি ডায়মন্ডহারবার রোডে, মোমিনপুরে।

রাস্তা পার হবার জন্য রোহিণীকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। বাস বা মোটর এখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, রাস্তাটাও চওড়া। পার হতে হলে, ফাঁক পেয়েই ছুটতে হবে। ততক্ষণ সে দু ধারে তাকিয়ে সন্তর্পণে একবার পিছনেও তাকাল। কাস্টমস ও পুলিশ মাঠে ক্রিকেট খেলা এইমাত্র বোধহয় শেষ হয়েছে। মালি স্টাম্পগুলো তুলে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে। দূরের এবং কাছের মানুষদের ওপর দিয়ে সে চোখ বোলাল। ছয় ফুটের উপর লম্বা, শীর্ণ, ধুতি পাঞ্জাবিপরা একটি লোকের দিকে কয়েক সেকেন্ড দৃষ্টি ধরে রেখে সে মনে মনে অপ্রতিভ হল। জেল থেকে ধুতিপাঞ্জাবি পরে পালানো শক্ত ব্যাপার। তা ছাড়া লোকটার চুল কুচকুচে কালো, একটু কুঁজোও। নয়তো গলা, কাঁধ, মুখের গড়নে অনেকটা মিল আছে।

শোভনেশের চুল কাঁচাপাকা মেশানো, ঝাঁকড়া, ফাঁপানো। ক্যালেন্ডারের মৃত

সতী-কাঁধে দক্ষযজ্ঞের শিবের চুলের মত। জুলপিটা পুরু, গালের অর্ধেক পর্যন্ত। ছিপছিপে, আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত দড়ির মত শিরায় পুরো বাহু যেন বেঁধে রাখা। কব্জি চওড়া। বুকটা চাপা। কোটরে ঢোকা চোখ জ্বলজ্বলে। ঘনভুরুর চুলও ধূসর। এমন চেহারার একটি লোকও রোহিণীর এখন চোখে পড়ল না।

শেষ পর্যন্ত ছুটেই রাস্তা পার হতে হল। ঝুলিটার মুখ ফাঁক করে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে সে ক্লাব হাউসের লোহার ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকল। দুটি যুবক বেরিয়ে আসছে। রোহিণীকে দেখে তারা পরিচিতের হাসি হাসল।

"আছে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"মাঠে পাবেন।" ওদের একজন বলল।

এদের সঙ্গে রাজেনই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দুজনেই বাংলা দলে বছর চারেক খেলছে। ভদ্র, বিনয়ী। তার সঙ্গে রাজেনের সম্পর্কটা ওরা জানে। একতলায় সদর দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে উপরে ওঠার সিঁড়ি। ডানদিকে করিডোর ধরে সোজা গিয়ে ফুলবাগানের কিনারে সিমেন্টের সরু পথ দিয়ে ফেন্সিংয়ে পৌঁছল রোহিণী। মাঠে ঢোকা উচিত নয় ভেবে সে দাঁড়িয়ে রইল।

নেট প্র্যাকটিস শেষ হয়ে গেছে। এখন চলেছে ক্যাচিং প্র্যাকটিস। একজন বল তুলে ব্যাট দিয়ে সজোরে মারছে। দূরে ছড়ানো পাঁচ-ছ'জন ফিল্ডার আকাশছোঁয়া বল লুফছে। বাউন্ডারি ধরে ধীরে ছুটছে দুজন। নেটের পিছনে চেয়ারে, মাটিতে বসে আছে আরো চারজন। তাদের পাশে ছড়ানো কিছু সরঞ্জাম। রোহিণী খাঁ খাঁ কংক্রিট স্ট্যান্ডের উপর দিয়ে চাহনি ঘুরিয়ে মাঠের উপর রাখল। সমানভাবে ছাঁটা মসৃণ তকতকে ঘাস।

'এই হল ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনস', রাজেন প্রথম দিন তাকে মাঠে এনে বলেছিল, 'পৃথিবীর সব থেকে পুরনো ক্রিকেট ক্লাব হল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব, অবশ্য ইংল্যান্ডের কথা ছেড়ে। প্রায় দুশো বছর বয়স এই ক্লাবের। এই মাঠ উনিশশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত তাদেরই ছিল।' 'আর মাঠটার বয়স?' রোহিণী কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়। সে এইটুকু জানত, গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ডের দুই বোন, যাদের পদবী ছিল ইডেন, তারাই বাগান করেছিল। তাদের নামেই ইডেন উদ্যান। 'কিন্তু এই মাঠটা তখন সেই বাগানের মধ্যে ছিল না।'

স্ট্র্যান্ড ধরে আউট্রাম ঘাটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সেদিন রাজেন প্রায় ক্লাস-লেকচার দেবার ঢঙে বলেছিল, 'মোহনবাগান মাঠের কাছ থেকে একটা রাস্তা ইডেনের মধ্য দিয়ে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম পর্যন্ত সোজা চলে গেছিল বাগান আর মাঠটাকে আলাদা করে। সেই রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়া চলত। রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে ক্রিকেট মাঠটাকে বাগানের অন্তর্গত করা হয়। ক্যালকাটা ক্লাব এই মাঠটায় প্রথম কবে খেলে, সঠিক বছরটা জানা যায়নি, তবে আঠারশো পঁয়ষট্টি নাগাদই হবে আর কাঠের প্যাভিলিয়ন তৈরি করে আঠারশো একাত্তরে। তারপর সেই প্যাভিলিয়নও ছেড়ে দিয়ে এখনকার এই বি সি রায় ক্লাব হাউসে উঠে আসে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। এখন যে হাজার হাজার টন কংক্রিট দেখছ মাঠটাকে ঘিরে রয়েছে, সে সব কিছুই ছিল না যখন আমরা স্বাধীন হই। মাঠ ঘিরে ছিল শুধু দেবদারু গাছ। বলের আর গাছের রঙ একাকার হয়ে উঁচু ক্যাচ নিতে নাকি খুব অসুবিধে হত। বড় বড় ম্যাচের সময় ফুটবল মাঠ থেকে কাঠের গ্যালারি এনে বসানো হত। জ্যাঠামশাই ইডেনে খেলা দেখছেন ছত্রিশ সাল থেকে। উনচল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা এই মাঠে রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল খেলেছিল। সে

গল্প জ্যাঠামশাই এখনো করেন। আট আনা আর এক টাকা দু' আনার টিকিট। খেলা শুরু হত এগারোটায়, শেষ হত সওয়া পাঁচটায়। ভাবতে পার, সওয়া পাঁচটা পর্যন্ত ইডেনে খেলা হচ্ছে? তখন এত উঁচু কংক্রিটের স্ট্যান্ড ছিল না। খোলা মাঠ, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাঠে রোদ থাকত, গঙ্গার হাওয়া আসত। বাংলা সেবারই প্রথম ট্রফি জিতেছিল।'

ক্রিকেট খেলা দেখতে রোহিণীর মোটামুটি খারাপ লাগে না। বোম্বাইয়ে থাকতে টেস্ট ম্যাচ দেখেছে পাকিস্তানের সঙ্গে। আর ইংল্যান্ডের সঙ্গে কলকাতাতে। তবে পাঁচদিন দেখার ধৈর্য বা আগ্রহ তার নেই। হাজার হাজার লোকের সঙ্গে বসা, নানান রকমের কথাবার্তা, মন্তব্য, পোশাক-আশাক আর জনতার মেজাজ বদলে যাওয়া, এই সবই তার ভাল লাগে। মাঠের মধ্যের ব্যাপার-স্যাপার তাকে টানে না, যেহেতু খেলার অনেক কিছুই সে বুঝতে পারে না, খবরাখবরও রাখে না। রাজেন যখন বলল, বাংলা উনচল্লিশে প্রথম রঞ্জি ট্রফি জিতেছে, তখন সে বলেছিল, 'দ্বিতীয়বার কবে জেতে?' রাজেন ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করে বলেছিল, 'ঠাট্টা হচ্ছে?' রোহিণী বুঝতে পারে, বোকার মত কিছু সে বলেছে। সামলাবার জন্য সে বলে, 'আমি কি ক্রিকেটের রেকর্ড রাখি যে, বলে দিতে পারব কোন বছর দ্বিতীয়বার জিতেছে?' রাজেন যেন আশ্বস্ত হল। হাল্কা সুরে বলেছিল, 'এখনো পর্যন্ত দ্বিতীয়বারটা আসেনি।' এইবার রোহিণী দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ পিটপিটানিটা নকল করে বলে 'ঠাট্টা হচ্ছে?' রাজেন মাথা নেড়ে তারপর জানায়, কথাটা সত্যিই, বাংলা আর কখনো রঞ্জি ট্রফি জিততে পারেনি।

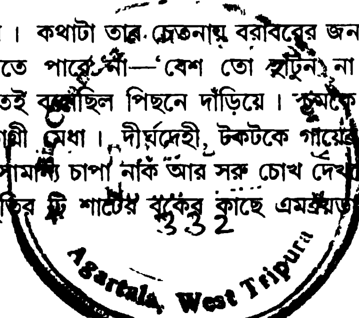
শুনে রোহিণী অবাক হয়ে গেছিল। তার মনে হয়েছিল, হাজার হাজার লোকের টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য পাগল হয়ে ওঠা, এই ঐতিহাসিক মাঠ, এত বড় সাজানো তকতকে বাড়ি আর প্রায় লক্ষ লোকের খেলা দেখার ব্যবস্থা, সবই যেন কি রকম অর্থহীন, হাস্যকর। অনেকটা তার নিজের জীবনের মতই।

ফেন্সিংয়ে দু হাত রেখে রোহিণী মাঠের মধ্যে রাজেনকে দেখতে পাচ্ছে। উঁচু করে মারা বলটা লোফার জন্য দৌড়তে দৌড়তে ঝাঁপ দিল দু হাত বাড়িয়ে। বল হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মাঠের কয়েকজন তারিফ জানাতে চেঁচিয়ে উঠল। রাজেন কনুই তুলে দেখছে ছড়ে গেছে কিনা। সাটিনের মত এমন মোলায়েম ঘাস, রোহিণীর ইচ্ছে করছে জুতো খুলে রেখে মাঠের মধ্যে গিয়ে হেঁটে বেড়াতে।

'বেশ তো হাঁটুন না।'

চমকে সে পিছনে তাকাল। কেউ নেই। খাকি শার্ট আর ধুতি-পরা একজন মালির সঙ্গে একটি লোক কথা বলছে, তাও পনেরো-ষোল মিটার দূরে। ক্লাব হাউসের কমপ্লিমেন্টারি আসনগুলির চালার উপরে দুটি পায়রা ছাড়া আর কোন প্রাণী সে দেখতে পেল না।

রোহিণী অপ্রতিভ হল। কথাটা তার চেতনায় বরাবরের জন্য যেন ছাপ দিয়ে গেছে। কিছুতেই সে যেন ভুলতে পারে না—'বেশ তো হাঁটুন না।' গভীর গমগমে স্বরে শোভনেশ তাকে অযাচিতই বলেছিল পিছনে দাঁড়িয়ে। চমকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিল সে আর সাত বছরের ভাগ্নী মেধা। দীর্ঘদেহী, টকটকে গায়ের রঙ, কাঁচাপাকা আলুথালু চুল, লম্বা মোটা জুলপি, সামান্য চাপা নাক আর সরু চোখ দেখলেই মণিপুরী বা নাগা বলে মনে হয়। ঘন নীল সুতির টি শার্টের বুকের কাছে এমব্রয়ডারি করা সাদা দুটি অলিভ পাতা।



অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের পশ্চিমের গ্যালারিতে ছবির সেই প্রদর্শনীতে তখন জনা দশেক দর্শক ছিল। দিদি সোহিনী যোগলেকর আর মেয়ে মেধার সঙ্গে রোহিণীও গেছিল ছবি দেখতে। প্রদর্শনীর স্পনসর ছিল রঙ তৈরির কোম্পানি, হিমালয়ান পেইন্টস। সোহিনীর স্বামী রঞ্জন যোগলেকর, যার ডাকনাম বাপু, হিমালয়ানের মার্কেটিং ডিভিশনের কন্ট্রোলার। অফিসের কাজে বাপুর সঙ্গে বোম্বাই থেকে এসে ওরা ছিল ওল্ড বালিগঞ্জে কোম্পানির গেস্ট হাউসে। ছবি দেখতে বাপু আসেনি। অফিসে তার কাজ ছিল, তাছাড়া আঁকা ছবি দেখতে তার ভালও লাগে না।

প্রদর্শনী-ঘরে ঢুকে ছবিগুলোর উপর এক নজর তাকিয়েই দিদির চোখে বিরক্তি আর ভয় দেখতে পেয়েছিল রোহিণী। বাঁ-দিকের দেওয়ালে ছ'-সাতটা তেলরঙের ছবি ছিল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে শোয়া, বসা, দাঁড়ানো নগ্ন নারীর। অত্যন্ত বাস্তব চিত্রণ। শুধু পেশি বা ভাঁজগুলিই নয়, দেহের কোন কোন জায়গায় কেশও নিখুঁত। মনে হয় একজন নারীকেই নানান ভাবে ও ভঙ্গিতে রেখে পাটে পাটে মেলে দেওয়া হয়েছে—তার ঘাড়, কাঁধ, উরু, তলপেট, হাঁটু, গোড়ালি, আঙুল, নিতম্বের কমনীয় গড়নকে। সোহিনী বার কয়েক অস্বস্তিভরে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রোহিণীকে বলেছিল, 'মেধাকে নিয়ে তুই ওইদিকের ছবি দেখ্।'

দেখতে দেখতে একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রোহিণী বলেছিল, 'দেখেছিস কী সুন্দর মাঠ, ইচ্ছে করছে ছবিটায় ঢুকে খালি পায়ে হাঁটি।'

আর ঠিক তখনই পিছন থেকে 'বেশ তো হাঁটুন না।'

শোভনেশ হাসছিল। গালের পেশিতে ও চোয়ালে শক্ত সবল ভাঁজ, ঠোঁটের ঢাকনা খোলা সরল দুপাটি দাঁত, চোখ দুটি আরো সরু হয়ে গেছে হাসির কুঞ্চনে। রোহিণীর বুকের মধ্যে ছমছম করে উঠেছিল। শোভনেশ আঙুল দিয়ে ছবিটাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'ওই যে দূরে একটা বেড়া আর তার পাশের চালাটা দেখা যাচ্ছে, তার ওধারে একটা গ্রাম আছে, আদিবাসীদের। নাম টুংলাপুট। হাঁটতে হাঁটতে ওখানেও চলে যেতে পারেন।' রোহিণী ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘাসের সবুজ প্রান্তরের চড়াই, দূরে একটা টিলা, ছোপ ছোপ জঙ্গলের আভাস, আকাশের রঙ দেখে মনে হয় সূর্য অস্তে নামছে। সারা প্রকৃতি জুড়ে শান্ত নীরবতা। ঠিক এই সময়েই শাঁখ বেজে ওঠার কথা। শোভনেশ হুক থেকে ছবিটা খুলে রোহিণীর দিকে এগিয়ে দিল। ফ্রেমের কোণে আঁটা কাগজে দাম লেখা আড়াই হাজার টাকা। রোহিণীর হাত কেঁপে যায়। আড়াই ফুট বাই আড়াই ফুট জলরঙের ছবিটা হাতে নিয়েও সে ধরে রাখতে পারেনি। কাঁচ ভাঙার শব্দে যে ক'জন দর্শক ছিল ফিরে তাকাল। তাড়াতাড়ি উবু হয়ে বসে রোহিণী কাঁচ কুড়োতে যেতেই দুটি কাঁধ ধরে শোভনেশ তাকে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, 'দোষটা আমারই, আপনি কুড়োবেন কেন?'

রোহিণী কুড়োবে কি কুড়োবে না ভেবে পেল না। রাজেন ইচ্ছে করেই বলটা তার দিকে গড়িয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। ফেন্সের দরজা দিয়ে আনমনে কখন যে সে মাঠে ঢুকে খালি পায়ে দাঁড়িয়েছে, মনে নেই।

প্র্যাকটিস শেষ হয়ে গেছে। জয়পুর রওনা হবার আগে এটাই শেষবার। রাজস্থানের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা। রাজেনের ধারণা, ম্যাচটা তারা জিতবে। কেন জিতবে তাই নিয়ে পরশু দিনটু আধ ঘণ্টা ধরে একটা লেকচার দিয়েছে।

"পাঁচ মিনিট।" রাজেন কাছে এসে বলল। "এক সেকেণ্ডও বেশি নেব না। তুমি ততক্ষণ বরং এই চেয়ারটায় বোস। আমি চান সেরে জামা-প্যান্ট চেঞ্জ করেই আসছি।"

রাজেন ছুটে চলে গেল। সাদা ট্রাউজার্স ও হাফহাতা স্পোর্টস শার্ট-পরা ছিপছিপে শরীর। রোহিণীর থেকে দু' ইঞ্চি লম্বা, বেলেমাটির মত গায়ের রঙ, কোঁকড়া চুল আর নাকটি চোখা। বাঁ চেয়ালের নিচে আঁচিল। বাঁ হাতে ব্যাট করে, ডান হাতে লেগব্রেক বল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সে হাত নেড়ে, ড্রেসিং রুমে ঢুকল। ফেন্সের ধারে একটা স্টিলের চেয়ার। রোহিণী বসল। সূর্য অস্তে নেমেছে, মাঠে ছায়া। চড়াইয়ের মতই দুটো কালো পাখি উড়ছে-বসছে আর খুঁটে খুঁটে কী খাচ্ছে। বিরাট স্কোর বোর্ডটার দিকে সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আগের খেলার কয়েকটা নাম আর স্কোর রয়ে গেছে। দূর থেকে লঞ্চের ভোঁ ভেসে এল। তার মনে হচ্ছে, একটা গামলার মধ্যে যেন বসে রয়েছে। বাইরে কি ঘটছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। সে জানে না জেল পালানো লোকটা কে, এখন সে কোথায়!

"পাঁচ মিনিট হয়েছে কিনা দ্যাখো!"

হেঁটে আসতে আসতে রাজেন চেঁচিয়ে বলল। রোহিণী ঘড়ি দেখার বদলে কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দোকান থেকে নেওয়া ঘড়িটা বার করল।

"সারাতে কত নিল?"

"তা দিয়ে তোমার দরকার কি?"

রাজেনের বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে রোহিণী ঘড়িটা পরিয়ে স্টিলের ব্যান্ডটা টিপল।

· "আমি ডান হাতে পরি।"

"না, বাঁ হাতে পরবে।" ভ্রূ কুঁচকে রোহিণী বিরক্তি জানাল। "আর এই হাবিজাবি লেখা শার্ট পরা কেন? সাধারণ জামা তো পরতে পার। ম্যানুফ্যাকচারের ব্র্যান্ডনেম বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কি জন্য, তুমি কি ডিসপ্লে বোর্ড? এ সব জামা তারাই পরে, যাদের পার্সোনালিটি কম।"

রাজেন প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দু হাত তুলে বলল, "সারেন্ডার করছি। এবার তাহলে চলা যাক।"

দুজনে ক্লাব হাউস থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু কবল। বোঝা যায়, ওরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে অভ্যস্ত।

"গাড়ি আছে।" রাজেন বলল।

"থাক, বেশি দূর যাব না। ইডেনের ভেতরে গিয়ে বরং একটু বসি। মীনা চ্যাটার্জির সঙ্গে ইন্টারভিউ সাতটায়, পাংচুয়াল হতে চাই।"

"কে মীনা চ্যাটার্জি?"

"বাংলা সিনেমা দেখ?"

"না। ও হোও···নাম শুনেছি। এই তো রাস্তায় পোস্টার দেখলাম, কি একটা ছবির নায়িকা। বেশ ভালই দেখতে। আমাদের উইকেটকিপার ছোট্‌কা মীনা চ্যাটার্জির অন্ধ ভক্ত। ফিল্ম রিলিজ হলে প্রথম দিনে দেখবেই। কী যে অদ্ভুত মানসিকতা। ওর নাকি পাড়ার মেয়ে, ছোটবেলায় একসঙ্গে প্রাইমারি স্কুলে পড়েছে।"

"তোমাদের ছোট্‌কার পাড়া কোথায়?"

"জোড়াবাগানে। তবে মীনা চ্যাটার্জিরা বোধহয় অল্প দিনই ছিল, তারপর পাড়া ছেড়ে কোথায় চলে যায়। গত বছর জামশেদপুরে যাবার সময় ট্রেনে কথায় কথায় ছোট্‌কা

কাকে যেন বলছিল, আমি আর ওতে কান দিইনি।"

রোহিণী বসার জায়গা খুঁজে এধার-ওধার তাকাচ্ছে। খোয়া, গর্ত, ধুলো এবং পুলিশী ঘোড়ার অসভ্যতার চিহ্ন ইতস্তত ছড়ানো। বিরক্ত হয়ে সে বলল, "আদিখ্যেতা করে যে কেন নন্দন কানন বলা হয়!"

"টেস্ট ম্যাচের সময় যদি আসো, তাহলে দেখতে জায়গাটার কি অবস্থা হয়। চলো. জলের ধারটায় বসি।"

শীত যতটা থাকার কথা, নেই। তাই সন্ধ্যা আসন্ন সত্ত্বেও ভিড় রয়ে গেছে। বাচ্চাদের ছুটোছুটি, মায়েদের ত্রস্ত ডাকাডাকি, বৃদ্ধবৃদ্ধার শান্ত পদক্ষেপ, ফেরিওয়ালাদের সুরেলা হ্রস্ব ডাক, পাখিদের কিচিরমিচির, সব মিলিয়ে রোহিণীকে খানিকটা জুড়িয়ে আনল।

"না এখানে নয়, বাঁদিকে তাকিয়ে দেখ।"

রাজেন তাকিয়ে দেখল। প্রায় তিরিশ হাত দূরে, বড় গাছের গুড়ির আড়ালে বসা একটি কিশোরীকে বাঁহাতে জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে এক ছোকরা কিছু বলছে। ঝোপঝাড় আর মোটা মোটা গাছে আর ঘন পাতায় এই দিকটা এখন আবছা হয়ে এসেছে। নজরটা একটু সরাতেই সে আবার অমন একটা ঘনিষ্ঠতার নমুনা পেল। মেয়েটির কোলে মাথা রেখে শুয়ে একজন।

"প্রকাশ্যে এইভাবে, এমন রুচিহীন অসভ্য···।"

রোহিণী বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করল।

রাজেন বলল, "দুপুরে এলে দেখতে, রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেই রেলিং দিয়ে দেখা যায়···কি অল্পবয়সী সব ছেলেমেয়ে, মনে হয় স্কুলে পড়ে, এমন কম্প্রোমাইজিং ভঙ্গিতে গাছতলায় বসে থাকে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে লোকজন দাঁড়িয়ে দেখে, হাসাহাসি করে, ওরা তাতে ভ্রূক্ষেপও করে না, বরং যেন মজাই পায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানেও ভরদুপুরে এরকম ছেলেমেয়েদের দেখেছি।"

"ডেফিনিটলি এরা কলকাতার নয়, সাবার্ব থেকে আসে। কলকাতার গেরস্ত, ভদ্র পরিবারের হলে চেনা কেউ দেখে ফেলার ভয়টা থাকত, অন্তত মেয়েদের থাকত।···এখানটায় বসি।"

ফাঁকা জায়গায়, তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে থাকা মধ্যবয়সী এক দম্পতির কাছাকাছি ওরা বসল।

"ভয়টা কি শুধু মেয়েদেরই থাকে?'

"তবে না তো কি, ছেলেদের থাকে?"

"যেমন? একটা উদাহরণ দাও।"

রোহিণী বলতে যাচ্ছিল, যেমন আমি। এই মুহূর্তে আমার থেকে ভীত পৃথিবীতে আর কেউ নেই। একটা খুনী জেল থেকে বেরিয়ে পড়েছে, সেটাই আমার কাছে ভয়ের ব্যাপার। আমাকে পেলে সে গলা টিপে মেরেও ফেলতে পারে। একটা অনিশ্চিত আতঙ্কে পড়ে গেছি।

"কি ব্যাপার তুমি অমন চোখ কুঁচকে মুখে বিশ্রী ভাঁজ ফেলে কি ভাবছ? উদাহরণ খুঁজছ?"

"দেখ রাজেন", রোহিণীর স্বর হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠল। "আগেও তুমি কয়েকবার বলেছ আমার মুখে ভাঁজ পড়ে, হাসলে গাল বসে যায়, চোখের কোণের চামড়া কুঁচকোনো, জানি তুমি একথা কেন বল।"

রাজেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল। এই রকম আবেগের বিস্ফোরণ, সাধারণত রোহিণীর মধ্যে ঘটে না।

"কবে আবার বলেছি ?"

কথাটা কানে না তুলে রোহিণী একই তীব্রতায় বলল, 'বয়স হয়েছে, এখন চোখের কোণে, ঠোঁটের কোণে যদি ভাঁজ পড়ে, কি করতে পারি বল ? তুমি বরং··· ।" রোহিণী থেমে গেল।

"বরং ?"

"বরং, ভুল শোধরাবার যথেষ্ট সময় রয়েছে। রাজেন তুমি আমার থেকে চার বছরের ছোট।"

"ওহ্ এই ব্যাপার।" রাজেন হাঁফ ছাড়ার ভান কবল শব্দ করে শ্বাস ফেলে। "আমি ভাবলুম, না জানি কি দোষের কথা বলে ফেলেছি। এই নিয়ে কতবার মনে করালে তুমি চার বছরের বড় ? গত দু বছরে, যদি মাসে একবার করেও হয় তাহলে চব্বিশবার। তার মানে চব্বিশবার আমাকে টর্চার করেছ, প্রতিবারে এজন্য যন্ত্রণা পেয়েছি বারো ঘণ্টা করে, মিনিমাম। তাহলে চব্বিশ ইনটু বারো, কত হয় ?"

"এটা রসিকতা করার ব্যাপার নয়।"

"দুশো অস্টাশি। কতটা ইনহিউম্যান হলে একজন মহিলা দুশো অস্টাশি ঘণ্টা ধরে একজন পুরুষকে দগ্ধে দগ্ধে রোস্ট বানাতে পারে, তার হিসেব দিতে পার ? এই নিষ্ঠুরতা গিনেস বুক অব··· ।"

"রাজেন।" রোহিণী তার হাঁটুতে রাখা, রাজেনের হাতটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। 'বিহেভ। ওই গাছতলার মত সীন আমি অপছন্দ করি।"

রাজেন আবার হাত রাখল। রোহিণী সরিয়ে দিল। রাজেন আবার রাখল, রোহিণী সরিয়ে দিয়ে সামান্য পিছিয়ে বসল। হাঁটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে।

"আহ্হ, এইটাই চেয়েছিলাম, দারুণ পোজ, তোমাকে সব থেকে সেক্সি দেখায় এইভাবে বসলে।"

"দেখাক।" বলেই রোহিণীর মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ ছুঁয়ে গেল। শোভনেশের ভারী গলার হুকুমের স্বর ধাক্কা দিয়ে উঠল, 'এইভাবে, ঠিক এইভাবে, নড়বে না। তোমাকে ভারী সফ্‌ট দেখায় এই পোজে।' রেগে রোহিণী বলেছিল, 'দেখাক্, আমি পারব না। এ সব আমার দ্বারা হবে না।'

প্রায় একইভাবে রাজেনও বলল, তবে একদমই অন্য প্রসঙ্গে, অন্য স্বরে। শোভনেশ বলেছিল, সফ্‌ট দেখায়, রাজেন বলল সেক্সি। দুটোই শুনতে ভাল লাগে। যে কোন মেয়েরই লাগবে।

"কিছু হয়েছে বোধহয়, মেজাজ এত খাট্টা কেন ?"

"কিছু হয়নি।"

"পরশু রওনা হব। ক্রিকেট এখন আর খেলা নয়, যুদ্ধ। যুদ্ধযাত্রার আগে পুরুষদের রণসাজ পরিয়ে, কপালে তিলকটিলক দিয়ে, দেবতার ফুল মাথায় ঠেকিয়ে, আরতিটারতি করে রমণীরা যুদ্ধে পাঠাত। কি দারুণ একটা সময়ই না ভারতে ছিল। পুরুষরাও তাই জেতার জন্য জান লড়িয়ে দিত। জেতার ইচ্ছাটা তৈরি হত মেয়েদের ভালবাসা প্রেম পাবার জন্য। আর এখন ?" রাজেন অর্থপূর্ণ নীরবতা তৈরি করল নাটকীয়তা আনতে। "রণসাজ, তিলক, আরতি নয় শুধু একটু করুণাঘন দৃষ্টিপাত, একটু সাজানো হাসি তাও

বরাদ্দ হয় না। এই জন্যই তো বাংলার ক্রিকেটের এই অবস্থা। বাঙালি মেয়েরা—"

"তোমার বাজে বকা কি বন্ধ করবে ?" রোহিণীর স্বরের ঝাঁঝ যে পড়ে গেছে, রাজেন সেটা বুঝতে পেরে দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করল। "ওখানে গিয়ে খেলব কি ? প্রথম বলেই তো আমি ফিরে আসব। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কৈলাশ মাট্টুর প্রথম ওভারের প্রথম বল। অফ স্টাম্পের এক হাত বাইরে ; ছেড়ে দেবার জন্য ব্যাট তুলেছি ; পিচ পড়েই সিম করে ছিটকে ঢুকে এল। ব্যাট নামাবার সময়ই পেলাম না ; অফ স্টাম্পের বেলটা উইকেটকিপারের কাছে উড়ে গেল। আমি বোকার মত মুখ করে ফিরে আসছি।... উফ্‌ফ কি লজ্জা। কেউ তো আর জানে না, জানার কথাও নয় কেন আমার কন্‌সেন্‌ট্রেশন ভেঙেচুরে তালগোল পাকিয়ে গেছ্‌ল। সবাই সান্ত্বনা দেবে, 'ব্যাড লাক রাজেন...বলটা অসম্ভব ভাল ছিল...এমন বলে গাওস্করও আউট হত।' আমার শুধু একটাই অপরাধ, হাঁটুতে হাত রেখেছিলাম।"

রোহিণী হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে উঠল। "আমার খুব অস্বস্তি লাগে যখন ভাবি আমি তোমার থেকে বয়সে বড়, আমি বিবাহিতও। ধরে নিচ্ছি আমার কিছু ফিজিক্যাল অ্যাসেট আছে, কিন্তু কতদিন আর সেটা থাকবে ? পদ্মপাতার জলের মতই তো মেয়েদের যৌবন !"

"রোহিণী, এ সব কথা বহুবার তুমি বলেছ। আমিও প্রত্যেকবার যা বলেছি, সেটাই রিপিট করব। সেই পুরুষগুলো অত্যন্ত নির্বোধ, যারা রমণীকে বিচার করে শুধুই তার রূপ আর যৌবন দিয়ে। এই দুটো নিশ্চয়ই পুরুষদের কাছে বাঞ্ছিত। সুন্দরী বউয়ের মালিক হয়ে কে না গর্ববোধ করে ? কিন্তু হৃদয়, আবেগ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সহমর্মিতা, শেষ পর্যন্ত এগুলোই কিন্তু অ্যাসেট হয়ে ওঠে।"

মুখ নিচু করে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে রোহিণী শুনে যাচ্ছিল। এখন তার মনে হচ্ছে, নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে হলে তার একজন পুরুষমানুষ দরকার, যার উপর সে নির্ভর করতে পারবে। আর, যদি শোভনেশই সেই ফেরারি হয়, যদি খুঁজে খুঁজে তার কাছে এসে হাজির হয়, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গের মত শক্তিশালী একটা আড়াল তার দরকার। রাজেন শরীর ও মনের দিক থেকে একটুও দুর্বল নয়। লড়াই করতে পিছোবে না। গঙ্গাদা তাকে ফ্ল্যাট দিয়ে, চাকরি দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, করবেও। তবু মনের গভীরে একটা নিরাপদ আশ্রয়, আশ্বাস, নির্ভরতা তার খুব দরকার। রাজেন কখনো কোন সময়ই তার কাছ থেকে নোংরা সুযোগ নেবার চেষ্টা করেনি, যদিও ফাজলামিতে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

রাজেন নতমুখ রোহিণীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। কথা বলার ঝোঁকে মুখটা উদ্ভাসিত, চোখ জ্বলজ্বলে। রোহিণীকে আনমনা দেখে সে বলল, "আমাদের দেশে মেয়েদের মুখটাই সব। মুখ সুন্দর হলেই সে সুন্দরী। তার গোটা শরীরটা যদি প্যাঁকাটির মত কিংবা জালার মত হয়ও, কোথাও যদি গড়নে ব্যালান্স, সামঞ্জস্য নাও থাকে, তবু সে রূপসী। আমাদের রুচি, সৌন্দর্যবোধ এভাবেই তৈরি হয়ে আছে। আমরা একদমই ফিজিক্যাল নই। দেখছ না, খেলায় আমরা কত পিছিয়ে।"

খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ রোহিণী বলল, "আমার ডিভোর্সটা করে ফেলা দরকার।"

"উকিলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। জয়পুর থেকে ফিরে এসেই যাব।"

"তোমার বাড়িতে কি বলেছ কিছু আমার সম্পর্কে ? বাবা, মা, দাদারা, বৌদিরা কি জানে ?"

"মা'কে বলেছি, তবে সব কিছু নয়। তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।"

রাজেনের বলার ঢঙে কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে রোহিণী উৎকণ্ঠিত হল। "সব কিছু বলোনি মানে? না, কোন কিছুই চেপে যাওয়া চলবে না। তুমি ফিরে এস, আমি যাব মায়ের কাছে। দরকার হলে আমার কথা আমিই তাঁকে বলব।"

রাজেনের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেল না। অস্বস্তি কাটাতেই যেন সে এধার-ওধার তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, "ঝালমুড়িওয়ালাটা তো এখানেই ছিল।"

বাগানের আলো জ্বলে উঠেছে। বহু মানুষ যেমন বেরিয়ে যাচ্ছে, আসছেও তেমনি নতুনরা। সর্বত্র আলো পড়েনি। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার আর ছায়া ছড়িয়ে আছে। অনেক নরনারী সেদিকে যাচ্ছে।

রাজেন হঠাৎ বলে উঠল, "এই ঠিক হয়ে বসো, একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে তোমায় দেখছে।"

রোহিণী প্রায় লাফিয়েই রাজেনের পাশে এসে আর্ত গলায় বলল, "কে? কোথায়?"

রাজেন হেসে উঠে বলল, "ওই দেখ, কিন্তু এত ভয় পাওয়ার কি আছে?"

সত্যিই একটা লোক ওদের থেকে কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে তাদের দিকে মুখ করেই বসে।

"এরা এক ধরনের মানসিক রুগি। সারা ময়দানে এদের দেখতে পাবে। যেখানেই মেয়ে আর পুরুষ একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে বসবে, এরাও সেখানে গিয়ে কিছু ভালবাসার ব্যাপার ঘটবে এই আশায়, সেটা দেখার জন্য বসে থাকবে।"

রোহিণী অবশ্য পাঞ্জাবি পরা, বেঁটে মোটা লোকটিকে দেখে হাঁফ ছাড়ল।

"কিন্তু আমরা তো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসিনি।"

"বসতে তো পারি।"

"বটে।"

"কিন্তু তোমার মীনা চ্যাটার্জির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় হয়ে এসেছে।"

হাতঘড়িতে সময় দেখেই রোহিণী দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আর একটা কথাও নয়। দশ মিনিটে পৌঁছে দিতে পারবে? গাড়িটা রেখেছ কোথায়?"

"ক্লাব হাউসের পাশে।"

রোহিণীর সঙ্গে রাজেনকেও হনহনিয়ে যেতে হল গাড়ি পর্যন্ত।

রাজভবনের কাছে রেলিং-ঘেরা গোলাকার দ্বীপটি ঘুরে গাড়ি দক্ষিণমুখো হবার পর রোহিণী বলল, "আচ্ছা, বহরমপুর থেকে কলকাতায় পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগে?"

রাজেন গাড়ির গতি বাড়াতে পারছে না ট্র্যাফিকের জন্য। সেজন্য বিব্রত হচ্ছে। সংক্ষেপে বলল, "অনেক ভাবে আসা যায়, কিসে আসতে চাও? ট্রেন, মোটর, ট্রাক, বাস, নৌকো, সাইকেল, হণ্টন, কিভাবে?"

রোহিণী ভেবে পাচ্ছে না একজন পলাতক আসামীর পক্ষে এর কোনটা ব্যবহার করে কলকাতায় আসা উচিত।

" যেভাবেই আসুক, মোট কথা একটা লোক ইচ্ছে করলে বাই রোড, জঘন্য রাস্তা আর ট্র্যাফিক জ্যাম ধরে নিয়েও পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারবে। কারুর আসার কথা আছে নাকি?"

"না।"

ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থামল ব্রেক কষার জন্য। রাজেন তার ওভারটেক করার কৃতিত্বে বাধা পেয়ে দাঁত চেপে "হারামজাদা" বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল।

"রাজেন, দু-চার মিনিট দেরি হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। পুলিশের নোট বইয়ে নম্বর তোলা বা হাসপাতালে যাওয়াটাও এখন খুব জরুরী নয়। তোমার একটা বড় ম্যাচ রয়েছে সামনেই।"

রোহিণী ডান হাতের তালু রাখল রাজেনের উরুতে। রাজেন আড়চোখে একবার তাকাল। পার্ক স্ট্রিটে ঢুকেই গাড়ির গতি মন্থর হয়ে গেল, প্রায় রিক্সার মতই।

"কি ব্যাপার?"

"চারদিন পরই খেলা, ইনজুরি টিনজুরি যাতে না হয়..."

"মতলবটা কি?"

"দু'ধারে কত খাবার দোকান, দেখতে দেখতে যাওয়াতেও কত সুখ বিশেষত প্রচণ্ড খিদের মুখে।"

"আজ থাক দেরি হয়ে যাবে।"

"রোহিণী, তোমার সম্পর্কে কত কিছু জানি, আবার অনেক কিছুই জানি না।" রাজেনের মুখ ও স্বর গম্ভীর।

কাঠ হয়ে গেল রোহিণীর আলগাভাবে বসার ভঙ্গি। কি জানতে চায়? সবই তো সে বলেছে।

"তুমি রাঁধতে জান কি?"

কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল ধাতস্থ হতে, তারপরই সে রাজেনের হাঁটুর কাছে বিশাল একটা চিমটি কাটল।

"তুমি একটা মিটমিটে, কি বলব, মিচকে শয়তান। ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। গাড়িটা এবার জোরে চালাও। সার্কুলার রোডটা ক্রশ করে আর একটু গিয়েই ডান দিকে।"

রাজেন গাড়ির গতি বাড়িয়ে বলল, "আমি কিন্তু এখনো জানি না রাঁধতে জান কি না। এটা জানার উপর, বলতে পার, আমাদের সম্পর্কটা কি হবে সেটা নির্ভর করছে।"

"জানি।"

"প্রমাণ চাই।"

"ডান দিকে, ডান দিকে রাখ, এই তো আঠারো নম্বর।"

অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি। রাস্তার দিকে প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্টেরই একটি করে ছোট্ট ঝুলবারান্দা। একতলায় গাড়ি রাখার পাকা আঙিনা। ফটকে উর্দি-পরা দারোয়ান। লিফট রয়েছে করিডরের দু'ধারে।

"তুমি ফিরবে কিভাবে। অপেক্ষা করব?"

"না, না, থাকতে হবে না। ঘণ্টাখানেক তো বটেই, তার বেশিও লাগতে পারে। আমি মিনিবাসে চলে যাব।" দু'পা গিয়েই রোহিণী থেমে গেল। ফিরে এসে ঝুঁকে মুখ নামিয়ে বলল, "রাঁধতে পারি কি পারি না সেটা একদিন প্রমাণ করে দেব।"

"কালকেই দাও। তা হলে প্রথম বলেই আউট হব না, এই গ্যারান্টি দেব।"

"দুপুরে মহারানীর ঘরে থাকব, টেলিফোন কোর।" বলেই দ্রুতপায়ে রোহিণী আঠারো নম্বর বাড়ির ফটকে ঢুকে গেল। গাড়িতে বসে রাজেন তাকিয়ে রইল যতক্ষণ না বোতাম টিপে রোহিণী লিফ্ট চালু করল।

॥ তিন ॥

পালিশ করা সেগুন কাঠের একপাল্লার দরজায় পিতলের পাতের উপর ইংরাজিতে লেখা : মীনা চ্যাটার্জি। কলিং বেলের বোতাম টিপতেই ভিতরে পিয়ানোর টুং টাং বেজে উঠল। দরজায় নজরদারি কাচ লাগানো ছোট গর্তটার দিকে রোহিণী তাকিয়ে ছিল। দরজা খোলার আগে ওটা দিয়ে তাকাবেই। তাকিয়ে যেন ভাল করে দেখতে পায়। গুণ্ডা-টুণ্ডা নয়, একটা মেয়ে।

দরজা ফাঁক করে পরিচ্ছন্ন শাড়ি ব্লাউজ পরা এক কিশোরী, সম্ভবত কাজের মেয়ে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"আমার আসার কথা ছিল, মিস চ্যাটার্জি কি আছেন ?"

"আপনি বসুন, দিদি এখনো ফেরেনি।"

ঢুকেই কাশ্মীরী কাজ-করা মাথাসমান উঁচু কাঠের পার্টিশন। তার লতাপাতার জাফরির ফাঁক দিয়ে ঘরটা ভাল দেখা যায় না। রোহিণী ইতস্তত করল বসার আগে। ঘরের একদিকে আধ হাত পুরু, টকটকে লাল কাপড়ে মোড়া রাবার ফোমের সোফা। চারজন অনায়াসে বসতে পারে। তার উল্টোদিকে গদি-পাতা নিচু চৌকি, যার পায়াগুলিতে পিতলের কুলপি লাগানো। ছড়িয়ে আছে কয়েকটি গেরুয়া ওয়াড় পরানো তাকিয়া। এ ছাড়াও আছে দুটি গদির চেয়ার। ঘরের মাঝে কার্পেট এবং নিচু আখরোট কাঠের গোল টেবল, তাতে কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি রঙিন ম্যাগাজিন। হালকা পাতিলেবু রঙের দেয়াল। আসমানি রঙের মোটা কাপড়ের পর্দা, যাতে খয়েরি ডোরা। কাঠের কয়েকটি ব্র্যাকেট বিচিত্র জ্যামিতিক কোণ রচনা করেছে দেয়ালে। তাতে রয়েছে কাঠের, পিতলের ও পাথরের মূর্তি ও পুতুল। এর মধ্যে একটি, তিন বছর আগে পাওয়া সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর অ্যাওয়ার্ড, বাকিগুলি উপহার পাওয়া। সারা ঘরে একটিই ছবি, সদর দরজার মাথায় দেড় ফুট লম্বা রামকৃষ্ণদেবের হাসিমুখ। মুখের নিচে সাদা ডায়ালে সোনালী কাঁটার ডিম্বাকৃতি ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়ি। টেবিলে ফুলগুলি প্লাস্টিকের নয়। সোফার দু'পাশে কাপ ডিশ রাখার জন্য কাঠের ছোট টেবিলে ছাইদানিগুলি পরিষ্কার। বাইরের কোন শব্দ ঘরে আসছে না। অন্দরে যাবার দুটি দরজা। তাতে পর্দা ঝুলছে। ভিতব থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অসম্ভব নীরবতা ঘরে বিরাজমান।

মেয়েটা পাখা খুলে দেবার জন্য সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল। খোলার দরকার আছে কি না জানতে চায়। রোহিণী বলল, "আস্তে, এক পয়েন্টে চালিয়ে দাও। আজ বেশ গরমই।"

সে সোফায় বসাই স্থির করল। সারা ঘরটা এবং অন্দরে যাবার একটি দরজা তার নজরের আওতায় থাকবে। মাথাটা ডানদিকে ঘোরালে অন্য দরজাটাও নজরে আসবে।

"আপনাকে চা কি কফি দোব ?"

"না।"

"কোল্ড ড্রিঙ্কস ?"

"না। উনি কখন আসবেন, কিছু বলেছেন কি ?" ভিতরে কোথাও ফোন বেজে উঠল।

"বলেছেন ফিরতে যদি দেরি হয়, তা হলে একটু যেন অপেক্ষা করেন।"

তৃতীয়বার বাজার মুখে রিং বন্ধ হয়ে গেল। কেউ রিসিভার তুলেছে। তার মানে

কেউ ভিতরে রয়েছে। রোহিণী শুনেছে, মীনা চ্যাটার্জি একাই থাকে, অবিবাহিতা। বছর চারেক আগে এক গুজরাটি ব্যবসায়ী শিয়ালদা কোর্টে মামলা তুলে মীনাকে তার স্ত্রী অভিহিত করে ষাট হাজার টাকা গহনা অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। সেই মামলার ফল খবরের কাগজে আর বেরোয়নি।

পর্দা সরিয়ে মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। রোহিণী লক্ষ করল, ভিতরে যাবার পর সে দরজাটা আধখোলাই রেখে দিল। মহারানীর সম্পাদক প্রশান্ত হালদারের কাছ থেকে মীনা সম্পর্কে কিছু আগাম তথ্য লিখে নিয়েছিল সে। রোহিণী ঝুলি থেকে ডায়েরি বইটা বার করে, ঝালিয়ে নেবার জন্য সেটা খুলল।

অফিসিয়াল বয়স ছাব্বিশ। তার মানে কি ত্রিশ ? ছবিতে যা দেখেছে বা ফিল্মে, তাতে কিছু বোঝা যায় না। মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে, এমন রোলেও গত বছর ওর ছবি রিলিজ করেছে। মোটামুটি মানিয়েই গেছে। মীনা এখন বয়সের এমন একটা অঞ্চলের মধ্যে, যেখানে বয়স নিরলস ও কঠিন যত্ন পেলে থমকে থাকে।

রোহিণী নিজের কথা ভাবল। বোধ হয় সেও এখন এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কত দিন থাকবে ? রাজেন বলেছে শরীরটাই সব নয়। ও আবেগপ্রবণ। শোভনেশ বলেছিল, শরীর ছাড়া মেয়েদের আর আছে কি ? সেও মাঝে মাঝে আবেগের বশবর্তী হত, কিন্তু রাজেনের মত এত কোমলতা সহকারে নয়। শোভনেশের রূঢ়তার একটা আকর্ষণ ছিল, ওর নির্যাতনের ধরনে আদিম একটা— ।

রোহিণীর মনে হল, কেউ যেন তাকে লক্ষ করছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠল তার পিঠ আর বুকের পেশি। মাথার মধ্যে শীতল হয়ে রক্তস্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এল। সে আড়চোখে তার ডান দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল। পাল্লা ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক। কাটা পর্দা একবার নড়ে উঠল। কেউ ফাঁক করে দেখছিল বোধ হয়। অথচ যখন সে ঘরে ঢোকে, দরজাটা তখন কিন্তু বন্ধই দেখেছিল।

কে ? শোভনেশ ?

ভয় পেয়ে মাথাটা খারাপ হল নাকি ? রোহিণী নিজেকে ধমকাল। এখানে শোভনেশ আসবে কি করে ? এটা তো মীনা চ্যাটার্জির ফ্ল্যাট ! ওর সঙ্গে শোভনেশের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে কি ? ছ বছর আগেও, যখন মীনা অ্যামেচার নাটক দলের সামান্য অভিনেত্রী ছিল, তখন কোন সম্পর্ক যদি থাকত, তা হলে সে জানতে পারত। আসলে এই নিস্তব্ধ ঘরে একাকী বসে থাকার আর মনে মনে শোভনেশের কথা ভাবার জন্য বোধ হয় সামান্য ব্যাপারেই তার ভয় লাগছে। দরজাটা হয়তো হাওয়ায় খুলে গেছে। পর্দাটা হয়তো পাখার হাওয়ায় নড়েছে।

রোহিণী আবার পর্দার দিকে তাকাল, নড়ছে না। এক পয়েন্টে পাখা ঘুরলে অত ভারী কাপড়ের পর্দা নড়বে কেন ? ঠিক তেমনি, শোভনেশই বা এখানে হাজির হবে কেন ? বহরমপুর থেকে পাঁচ-সাত ঘণ্টায় আসা গেলেও এবং মীনার সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় থাকলেও গত ছ'টা বছর তো জেলের বাইরের পৃথিবীর ঘটনার কিছুই ওর জানার কথা নয়। কত কি বদলে গেছে, সে কোথায় চলে গেছে, কি করছে সে সব জানবে কি করে ? মীনা তো দু বছর হল এখানে বাস করছে। শোভনেশ কি তা জানবে ? তা হলে সে এখানে এসে উঠবে কী করে ? তা হলে সে সল্ট লেকে তার ফ্ল্যাটের খবরও তো জানে না।

রোহিণী যুক্তিগুলোকে আঁকড়ে ধরে কিছুটা হাঁফ ছাড়ল। সকালে খবরটা পড়ার পর

থেকেই কী যে এই শোভনেশ-আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছে ! মানে হয় ? সে নিজেকে সহজ করার জন্য উঠে পড়ল। ব্র্যাকেটে রাখা অ্যাওয়ার্ড আর সুভেনিরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তার চোখ ডান দিকের দরজার দিকে সরে গেল। হঠাৎই একটা অন্যায় কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। ঘরে কে রয়েছে ?

হাতখানেক সরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে পর্দাটা ফাঁক করল। এমনভাবে সে দাঁড়াল, যেন কেউ হঠাৎ এসে পড়লে সে হাতটা চট করে নামিয়ে জিনিসগুলোকে দেখার ভান করতে পারে।

দরজাটা ইঞ্চি তিনেক ফাঁক হয়ে রয়েছে। জমকালো নক্সাদার বেডকভারে মোড়া একটা খাটের কিছুটা, ড্রেসিং টেবল আর এয়ারকুলারের কিছুটা আর যেটির আধখানা সে দেয়ালে দেখতে পেল তাতে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। এবং কৌতূহল অবশেষে ভব্যতার শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল।

কাচ বাঁধানো ছবিটার আধখানা সে দেখতে পাচ্ছে। পায়ের পাতা, হাঁটু আর হাঁটুতে রাখা একটা মুখ, যেটা ঝাপসা। শোভনেশের আঁকা ন্যুড এক নজরেই চেনা যাবে শুধু মুখটা দেখলেই। কুয়াশার মত ঝাপসা সাদা ছায়ার পিছনে মুখেব রহস্যময় ভৌতিক একটা আভাস পাওয়া যাবে। শোভনেশের সই থাকে ছবির নিচের বাঁ কোণে।

ছবিটার বাকি আধখটানায় রয়েছে শরীরের বাকি অংশ। রোহিণী সেটা দেখার লোভ আর সম্বরণ করতে পারল না। দরজার পাল্লাটা সে আঙুলের ডগা দিয়ে ঠেলল।

"কে ?"

বিদ্যুৎ ছোঁয়া লাগার মত একটা ঝাঁকি খেয়ে সে পিছিয়ে গিয়ে দ্রুত আবাব সোফায় এসে বসল। ঘরের লোকটা পুরুষ। বুঝতে পেরেছে কি দরজাটা সে ঠেলেছে ? যদি জিজ্ঞাসা করে, তা হলে কী বলবে ? লোকের বাড়িতে এসে দরজা ঠেলে শোবার ঘর চুপি চুপি দেখা শুধু রুচিহীনতাই নয়, একটা অপরাধও। না, বলা যাবে না। এই লজ্জাকর কাজ কিছুতেই স্বীকার করা যায় না, সে করবেও না।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলে রোহিণী কাঠ হয়ে বসে রইল। ছবিটার কিছুই প্রায় দেখাব সময় পায়নি। চোখটা কতক্ষণের জন্য ছিল ? পি টি উষা যতটুকু সময়ের জন্য ওলিম্পিক ব্রোঞ্জ হারিয়েছে ততটাই বোধ হয়।

ঘোর কালো পটভূমিতে ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া কালো রঙটায় সামান্য ম্যাজেন্টার আভাস। দাবার মত সাদা-কালো বরফি আঁকা পাথরের মেঝেয় বসা নগ্ন একটি নারী। দুই হাঁটু মুড়ে উঁচু করা, সামনে ঝুঁকে দুই হাতে হাঁটু জড়ানো এবং মুখটি জোড়া হাঁটুর উপর। স্তন দুটি উরুতে চেপে বসানো। ছবিটি আঁকা পাশ থেকে। মাথা থেকে মেঝেয়-রাখা নিতম্বের তলদেশ পর্যন্ত অর্ধ-জ্যা টানা ধনুকের মত তুলির রেখা—রোহিণী এই রেখার সঙ্গে পরিচিত। বরফি কাটা পাথরের মেঝেটার সঙ্গেও তার পরিচয় আছে।

"আপনি মহারানী থেকে এসেছেন ?"

রোহিণী এই নিয়ে আজ কতবার যে চমকে উঠল ! কোলে রাখা থলিটা আঁকড়ে সে মুখ তুলে তাকাল। লোকটি সাড়ে ছয় বা সাত ফুট লম্বা। তার মনে হল, কোথায় যেন একে দেখেছে !

"হ্যাঁ।"

"আপনার নাম ?"

শীর্ণ, পাটকাঠির মত। গলাটা লম্বা এবং সামনের দিকে বাড়ানো, কাঁধ দুটি অল্প ঝুঁকে

থাকায়, এই ধবধবে ফরসা, বছর পঁয়তাল্লিশের লোকটিকে কুঁজো দেখাচ্ছে। পরনে ধুতি আর হাতাওয়ালা পাঞ্জাবি, আজকেই পাট ভাঙা হয়েছে। মুখটা যেন তার চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় যে দেখেছে ঠাহর হচ্ছে না।

"রোহিণী সেনগুপ্ত।"

"সেনগুপ্ত!" লোকটির স্বরে কেমন যেন একটা কর্কশ আবরণ সেনগুপ্ত শব্দটিকে ঘিরে ফুটে উঠল।

"আমি মীনার ম্যানেজার, পি আর ও, এমন কি গার্জেনও বলতে পারেন।" চেয়ারে বসার পর লোকটি নিজের পরিচয় দিল। "আমার নাম সুভাষ গায়েন" তারপর রোহিণীর মুখে বিস্ময় লক্ষ করে বলল, "পাশাপাশি বাড়িতে আমরা থাকতাম। ওকে ছোটবেলা থেকেই চিনি।"

"কোথায়?"

"জোড়াবাগানে।"

"এখনো কি—"

"না। মীনারা ভাড়া থাকত। ওব বাবা ছিল নিমতলার কাঠের দালাল। যখন ওর বছর দশেক বয়েস, বাবা মারা যায়। খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে। ওরা উঠে যায় পাড়া থেকে।"

"কোথায়?"

"যেখানেই যাক, আপনার লেখার জন্য তার দরকার হবে না নিশ্চয়।" শিষ্ট স্বরে বললেও রূঢ়তার চাপা ঝাঁঝ চাপতে পারেনি। রোহিণীর মাথার মধ্যে উত্তাপ জমে উঠল। কথা বলা শেখেনি, অথচ নাকি অভিনেত্রীর পি আর ও! ভেবেছে মহারানী ধন্য হয়ে যাবে মীনাকে ফিচার করে? ইডিয়টটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, পাবলিসিটি ছাড়া মীনার মত থার্ড গ্রেডের অ্যাকট্রেসের লাইনে টিকে থাকা অসম্ভব, যতই অ্যাওয়ার্ড পাক না কেন।

রোহিণীর মুখভাব লক্ষ করছিল সুভাষ গায়েন। মৃদু স্বরে বলল, "জীবনের সব কথাই কি প্রকাশ করা যায়?" লোকে ওর অভিনয় জীবনের, বর্তমান জীবনের সম্পর্কেই ইন্টারেস্টেড, তাই তো? আপনি এর উপরই লিখুন, এটাই আমরা চাই। অতীতে তো অনেকের অনেক কিছুই ঘটেছে, সে সব ভুলেও গেছে বা ভুলে যাবার চেষ্টা করেছে। আপনিই বলুন, আপনি কি অতীতের সব ব্যাপার লোককে বলতে রাজি আছেন?"

রীতিমত অভব্য! কী করে একজন অপরিচিতা মহিলাকে এভাবে ইঙ্গিত দিতে পারে যে, গোপন করার মত ব্যাপার তার জীবনে আছে? রোহিণী তার বিরক্তি ও আপত্তি মুখভাবে ও কণ্ঠস্বরে সচেতন ভাবে জাহির করল।

"আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিটের পরিচয়, এর মধ্যেই বুঝে ফেললেন আমার অতীত কেমন ছিল? আপনি কি মুখ দেখেই অতীত পড়ে ফেলতে পারেন?"

"না, তবে কারুর কারুর পারি।"

একটা জবাব ঠোঁটে এসে গেছল রোহিণীর। কিন্তু কি রকম একটা খটকা লাগছে তার। এখানে শোভনেশের আঁকা ছবি ঘরে টাঙানো। কেন, কিভাবে এল? কোথাও থেকে কিনে এনে টাঙিয়েছে কি? পয়সা দিয়ে কেনা ছবি এই ধরনের লোকেরা পাঁচজনকে দেখাবার জন্য বাইরে রাখে, শোবার ঘরে রাখবে না। কেউ উপহার দিয়ে থাকলেও বাইরেই রাখবে। শ্লীল-অশ্লীল নৈতিক প্রশ্নেই কি লোকচক্ষুর আড়ালে

রেখেছে ? তা হতে পারে না। নীতিবাগীশরা ন্যুড ছবি শোবার ঘরে তো দূরের কথা, ঘুঁটে রাখার জায়গাতেও রাখবে না। তা হলে ? কিভাবে এল ছবিটা ?

লোকটা এত সাহস পেল কোথা থেকে ? শোভনেশের সঙ্গে কি কখনো পরিচয় ছিল ? ও কি জানে শোভনেশ তার স্বামী, যে একটি স্ত্রীলোককে খুন করেছে, যাবজ্জীবন সাজা পেয়েছে। তাই কি এমন কায়দা করে, ঘুরিয়ে সেটা জানিয়ে দিল ?

"আমার অতীত বলতে পারেন ?" প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে রোহিণী বলল।

তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সুভাষ গায়েন। রোহিণী লক্ষ করল লোকটির চোখের মণি সামান্য ধূসর। নাকের ডগা নিচের দিকে বাঁকানো। ঠোঁটের কোণ মুচড়ে রাখা। মুখটাই যেন একটা মুখোস।

সুভাষ গায়েন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। রোহিণীর আর একবার মনে হল, কোথায় যেন একে সে দেখেছে। কোথায়, কোথায় ? তার নিজের উপর রাগ ধরতে শুরু করল। এত কম তার স্মৃতি !

"আমায় কোথায় যেন দেখেছেন, কিন্তু মনে পড়ছে না, তাই তো ?" মৃদু স্বরে বলল সুভাষ গায়েন।

রোহিণীর মুখ জ্বালা করে উঠল। অপ্রতিভ বোধ করেও সে বলল, "হ্যাঁ।"

সুভাষ গায়েন হাসল। কিন্তু হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে বলল, "মীনার ফিরতে দেরি হবে, কত দেরি হবে বলা শক্ত। আপনি কি অপেক্ষা করবেন, না অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আর একদিন আসবেন ?"

"সেটা এতক্ষণ বলেননি কেন !" রোহিণী তার বিরক্তি জানিয়ে দিল এবং ক্ষোভও। "মিছিমিছি বসে থেকে সময় নষ্ট করলাম।"

তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সুভাষ গায়েনও উঠল।

"সময় নষ্ট হবে কেন, আপনি তো একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন। লাভই হয়েছে বলুন।"

প্রায় বিদ্রূপই শোনাল। রোহিণী টান টান সোজা হয়ে থুতনি তুলে বলল, "কথাটা ঠিক বোধগম্য হল না।"

খাপছাড়া ভাবে সুভাষ গায়েন বলল, "আপনার ফিগারটা চমৎকার। আর্টিস্টরা মডেল হিসেবে এইরকমই চায়।"

কথাটাকে অগ্রাহ্য করে রোহিণী বলল, "কী জিনিস আবিষ্কার করেছি, বলুন সেটা ?"

সুভাষ গায়েন দু'কদম পিছিয়ে ঘরের পর্দাটা তুলে ধরে দরজার পাল্লাটা ঠেলে খুলে দিল। তারপর তীব্র চোখে তাকিয়ে বলল, "ছবিটা শোভনেশ সেনগুপ্তরই আঁকা। আমি জানি, সে আপনার স্বামী, এখন জেলে।"

"আপনি ওকে চেনেন !" বিস্ময়ের ধাক্কায় রোহিণী নিজের ব্যক্তিত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল। তার মনের কাজকর্মের তাল কেটে গেছে। বিভ্রান্তিতে সে আচ্ছন্ন, বিমূঢ়।

সুভাষ গায়েন মাথা নাড়ল। দৃষ্টির তীব্রতা স্তিমিত হয়ে এসেছে। মুখ পাশে ফিরিয়ে বলল, "চিনি না। তবে চেনা থাকলে ও জেলে যেত না।"

"কেন ?"

সুভাষ গায়েন চুপ করে রইল। রোহিণী অধৈর্য হয়ে প্রায় চেঁচিয়েই বলল, "এ কথা বললেন কেন ? বলুন ? বলুন ? আপনাকে বলতেই হবে !"

"তাহলে আমিই জেলে যেতাম—ওকে খুন করে।"

"সে কি !"

"যাকে ও খুন করেছে, সে মীনার দিদি বীণা। তাকে আমি ভালবাসতাম, বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শোভনেশ যে তাকে নষ্ট করেছে, পচিয়ে দিয়েছে, সেটা আগে আমি জানতে পারিনি। যদি জানতে পারতাম, তা হলে—"

"বীনা তো মডেলের কাজ করত।"

"অভাবের সংসার, লুকিয়ে লুকিয়ে সে দু-তিনজন আর্টিস্টের কাছে কাজ করত। শেষকালে শোভনেশের এক্সক্লুসিভ ছিল, আর তখনই ওদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যে ছবিটা দেখলেন, ওটা বীণার। শোভনেশের উপহার, কিন্তু বাড়িতে ছবিটা আনতে লজ্জা পায়। এক বন্ধুর কাছে রেখে দিয়েছিল। বছর দুয়েক আগে সে মীনাকে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে তো।"

"আমি এসব জানতাম না।"

"কেন আপনি তো কোর্টে ট্রায়ালের সময় সাক্ষী ছিলেন। সেখানে বহু অজানা কথাই তো জানা গেছে।"

এতক্ষণে রোহিণী ধরতে পারল, কোথায় ওকে দেখেছে। কোর্টঘরে পিছনের দিকে একটা বেঞ্চে বসে কখনো আনমনে বিষণ্ণ চোখে, কখনো উদগ্রীব হয়ে সামনে ঝুঁকে ও সাক্ষীদের জেরা শুনত। বহু লোকই খুনের বিচার শুনতে যায়, রোহিণী ধরে নিয়েছিল, লোকটি তাদেরই মত কেউ।

"বিয়ের আগে আর পরেও বীণার সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।"

"শোভনেশ যদি আপনাকে বিয়ে না করত, তা হলে বোধহয় বীণা বেঁচে থাকত।"

"তার মানে ? ওর মৃত্যুর কারণ আমি ? এ সব কী বলছেন ?"

সুভাষ গায়েন মুখ ঘুরিয়ে একবার রোহিণীর দিকে তাকিয়েই শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দরজাটা যে রকম শব্দ করে বন্ধ হল, তার একটাই অর্থ। আর সে বেরোবে না।

কাজের মেয়েটি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অন্য দরজা দিয়ে। "আপনি কি বসবেন ?"

"না।"

॥ চার ॥

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে লিফটের জন্য বোতাম টিপে রোহিণীর মনে হল, সুভাষ গায়েনকে একটা খবর দেওয়া হল না। বহরমপুর জেল থেকে যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়া একজন পালিয়েছে। শোভনেশ ওখানেই ছিল। হয়তো জেল ভাঙা কয়েদি সে-ই।

লিফট এসে গেছে। রোহিণী লিফটে ঢুকে 'জি' লেখা বোতামটা টিপে ভাবল, কিছু কিছু খবর যদি কেউ কেউ জানতে না পারে তাতে অনেক সময় শান্তি রক্ষায় সাহায্যই হয়।

মিনিবাসে ভিড় ছিল। শেয়ালদার প্রাচী সিনেমার স্টপে পৌঁছে রোহিণী বসার জায়গা পেল। অবশ্য তার আগে ব্রিফকেস কোলে নিয়ে বসা টাই-পরা এক সুদর্শন পুরুষ তাকে আসন ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। সে রাজি হয়নি। ভাঙাচোরা কলকাতার রাস্তায় বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া বসে যাওয়ার থেকে, অনেক আরামের যদি না জানোয়ার-ঠাসা ভিড়

থাকে।

বাসে উঠেই সে সব যাত্রীদের মুখগুলো একবার দেখে নেয়। ভয় পাওয়ার মুখটি নেই। যতবার বাস থেকে লোক ওঠা-নামা করেছে সে দরজার দিকে তাকিয়েছে। একটা নতুন অভ্যাসের মধ্যে সে যে ঢুকে যাচ্ছে, এটা রোহিণী বুঝতে পারছে। কিন্তু সে নিরুপায়।

শোভনেশের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে সুভাষ গায়েন নামে এক অস্বস্তি। লোকটার একটা কথা তাকে কামড়াচ্ছে এবং আজীবন তাড়া করে যাবে- 'শোভনেশ যদি আপনাকে বিয়ে না করত, তা হলে বোধ হয় বীণা বেঁচে থাকত।' কথাটার অর্থ সুভাষ গায়েন আর খুলে বলেনি। কী হতে পারে?

অর্থটা হয়তো এই, শোভনেশ যদি বীণাকে বিয়ে করত, তা হলে বীণা মরত না। কিন্তু ব্যাখ্যাটা রোহিণীর কাছে খুব সোজা, অগভীর এবং যুক্তিকর মনে হল না। তা হলে এই রকমও হতে পারে, পাছে বর্তমান স্ত্রী রোহিণী পূর্ব প্রণয়ের কথা জেনে ফেলে, তাই শোভনেশ শেষ করে দেয় বীণাকে। কিংবা বীণা তার প্রণয়ীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষেপে গিয়ে এমন একটা কিছু করবে বলে হুমকি দিয়েছিল বা করতে যাচ্ছিল, যা বন্ধ করার জন্য শেষ উপায় হিসেবে শোভনেশ এই কাজ করতে বাধ্য হয়।

বিচারের সময় শোভনেশ একদমই মুখ খোলেনি। উদ্দেশ্যটা কী, কেন সে খুন করল সে সম্পর্কে একটা কথাও তার মুখ থেকে পুলিশ বা উকিল জেরা করে বার করতে পারেনি। শুধু সে বলেছে, 'আমি খুনী কি না প্রমাণ করার জন্য এত সময়, পরিশ্রম, অর্থ ব্যয় করার কী দরকার, যা শাস্তি দেবার দিয়ে দিন।' কিন্তু যতক্ষণ না সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়ে আদালত নিশ্চিত হচ্ছে, ততক্ষণ তো আর সাজা দেওয়া যায় না। 'হ্যাঁ, আমি বীণাকে খুন করেছি', শুধু এই কথার উপরই কি প্রকৃত অপরাধী সাব্যস্ত হয়?

মে দিবসের ছুটির দিন, ঘটনার সময় রোহিণী ছিল মোমিনপুরে গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতে। দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল তাদের দু'জনের। শোভনেশ বলেছিল, গোয়াবাগানে তার একটা জরুরী কাজ আছে, সেখান থেকে সে একটার মধ্যে মোমিনপুর পৌঁছে যাবে। রোহিণী একাই ট্যাক্সি নিয়ে দশটা নাগাদ মোমিনপুর রওনা হয়ে যায়, বৌবাজারে শোভনেশদের পঁচানব্বুই বছর-বয়সী বিরাট বাড়িটা থেকে। দুপুর একটার মধ্যে শোভনেশ না যাওয়ায় গঙ্গাপ্রসাদ ফোন করেন। ওধার থেকে কেউ রিসিভার তোলেনি। এরপর আরো চারবার ফোন করে হতাশ হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'পাগলের বংশ তো, দেখো হয়তো গোয়াবাগান থেকে মোমিনপুর পর্যন্ত বোশেখ মাসে হেঁটে আসতে কেমন লাগে বোঝার জন্যই হয়তো—ও অপেক্ষা করে লাভ নেই, আমরা খেতে বসে যাই।'

খাওয়া শব্দটা মাথায় বুদ্বুদ কাটতেই হঠাৎ রোহিণীর মনে পড়ে গেল, কাল সে রাজেনকে রেঁধে খাওয়াবে বলেছে। দুপুরে ওকে ফোন করতে বলেছে মহারানীর অফিসে। কিরকম একটা আবেগের ঢেউ তখন, রাজেনের ছেলেমানুষী কথাবার্তার ধাক্কায় তাকে এমনই দুলিয়ে দিল যে, সে তখন ঠিক করে ফেলে, রাতে ওকে খেতে বলবে। কিন্তু খাওয়াবেই যে, এমন কোন কথা দেয়নি। দুপুরে ফোন করলে বলে দেওয়া যায়, ম্যাচ জিতে ফিরতে পারলে রেঁধে খাওয়াব কিংবা চলো, সন্ধ্যাবেলায় অ্যামবারে গিয়ে শুধুই তন্দুরি চিকেন গোটা দুই খাই।

রাত্রে নিমন্ত্রণ করে রাজেনকে ফ্ল্যাটে আসতে বলাটা কতটা উচিত হবে, এখনো সে তা বুঝতে পারছে না। শোভনেশের মত রাজেন অ্যাগ্রেসিভ নয়। ভদ্র, মার্জিত ধরনের

বিশেষণগুলো ওকে মানায়। একবার, মাত্র একবার হালকাভাবে জড়িয়ে ধরা, গালে গাল ঘসা, ঘাড়ে, গলায়, থুতনিতে মিষ্টি কামড়, বুকে মুখ চেপে ধরা আর দু-তিন সেকেন্ডের জন্য ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখা ছাড়া রাজেন কোনরকম বাড়াবাড়ির চেষ্টা করেনি। একটু ফাজিল, হিউমার বোধটা প্রচুর পরিমাণে আছে, যেজন্য রোহিণীর ওর সান্নিধ্য ভাল লাগে। রাজেন ছটফটে, ছেলেমানুষ অথচ দরকারের সময় প্রবীণ হতে পারে। ওকে বাইরে থেকে কুনো স্বভাবের মনে হয়।

রোহিণী মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে ভেবেছে, এমন ছেলে ক্রিকেট খেলে কী করে? খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে ক্রিকেটারদের যে ধরনের কর্কশ কথাবার্তা, বন্য উদ্দাম আচরণের খবর পড়েছে, তাদের সঙ্গে রাজেনের তো কোন মিলই নেই! অবশ্য তারা টেস্ট খেলে। রাজেন অতদূর পর্যন্ত যায়নি, যেতে পারবেও না। 'পাগল, আমি টেস্টম্যাচ খেলব? বয়স কত হল জান?' রাজেন একদিন বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হল, তখনই ঠিক করে ফেলি : গাওস্কর কি বিশ্বনাথের রাস্তা ধরে নক্ষত্র হওয়ার থেকে রোহিণী নক্ষত্রের আলোয় বরং পথ চিনে—না না, সেটা যে খুব সহজ আমি মোটেই তা বলছি না, রোহিণীর আলোয় পথ চিনে এবং তার কাছে পৌঁছে যাওয়ার সাধনায় লেগে থাকলে একশো টেস্ট খেলার সুখ আর যন্ত্রণা হয়তো একদিন পেলেও পেতে পারি।'

কথাগুলো মনে পড়ায় রোহিণী হেসে ফেলল। জানালা থেকে চোখ বাসের মধ্যে আনতেই দেখল, রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি অল্পবয়সী ছেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ছেলে দুটিকে সল্ট লেকে তার পাড়াতেই দেখেছে। কার্ডিগানের বোতাম খোলা রয়েছে। সে সন্তর্পণে কোলে রাখা ঝোলাটার মুখ খুলে ভিতরে কিছু দেখার ছল করে কার্ডিগানে টান দিল। ছেলেদের এই বয়সে যে সব কৌতূহল চিমটি কেটে যন্ত্রণা দেয়, রোহিণী সেই চিমটি থেকে ওদের রক্ষা করতে চায়।

"কোথায় এলাম রে?" একজন বলল। অন্যজন ঝুঁকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। রোহিণী হাসল, তবে মনে মনে। রাজেনের মতই এ দুটো। বাস থেকে নেমে মিনিট দু তিন হাঁটতে হবে। রাস্তাটা নির্জন। দুধারে ফাঁকা প্লট আর ঝোপ। আলোগুলো টিমটিমে। অনেকগুলো তো জ্বলেই না। বাড়িগুলোর দরজা জানলা বন্ধ। বাইরে কিছু ঘটলে কেউ বেরোবে না।

"কাঁকুড়গাছির কাছাকাছি এসেছি।"

"এই যে রাস্তাটা দিয়ে বাসটা যাচ্ছে, এর নাম জানিস?"

"সি আই টি রোড।"

"হল না।"

"ভি আই পি রোড।"

"দূর, সে তো দমদম এয়ারপোর্ট থেকে উল্টোডিঙির মোড় পর্যন্ত।

"তাহলে কী?"

"তুই বল্।"

"বললুম তো দুটো নাম, আচ্ছা তাহলে নজরুল ইসলাম সরণি।"

"তাও নয়। ওটা তো ভি আই পি রোডেরই অফিসিয়াল নাম।"

রোহিণী ওদের কথা শুনছিল, ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে উঠল। রোজই এই রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কলকাতার এটাই বোধহয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পথ, কেন না

দমদমে প্লেন থেকে নেমে প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী, নানান দেশের প্রেসিডেন্ট বা রাজা-রানীকে কলকাতায় যেতে হলে এই পথ দিয়ে যেতেই হবে।

"তোকে ক্লু দিচ্ছি। রাস্তাটা একজন বাঙালির নামে, বিশ্ববিখ্যাত তাঁর নিজের ক্ষেত্রে।"

"তুই তো কুইজ ছাড়লি।"

রোহিণী লক্ষ করল, তার মত বাসের অনেকেই ছেলে দুটির কথোপকথন শুনছে আর মনে মনে উত্তর হাতড়াচ্ছে এবং সেই সঙ্গে টের পেল তার মধ্যে যে টেনশ্যনটা স্নায়ুগুলোকে টেনে রেখেছিল, ওই কৌতূহলই তা ঢিলে করে দিচ্ছে।

"রবীন্দ্রনাথ ?"

"ওঁর নামে তো রাস্তা রয়েছেই। আমি যাঁর কথা বলছি, তাঁর নামে আর কোন রাস্তা নেই।"

সারা বাস ভাবতে শুরু করল এবং রোহিণীও। হঠাৎ সে বলে ফেলল, "কতদূর পর্যন্ত রাস্তাটা ?"

এতগুলি লোকের চোখ টানতে পারায় ছেলেটি ঈষৎ ফেঁপে উঠেছিল, এবার ফুলে উঠল রোহিণীর মনোযোগের কারণ হয়ে উঠতে পেরে।

"বেলেঘাটায় ফুলবাগানের মোড় থেকে এই সামনে উল্টোডিঙির মোড়, এক মাইল কি তার বেশিও হতে পারে, এত বড় রাস্তাটা !"

"বলো কি ভাই। এতখানি রাস্তার নাম কেউ জানে না ?" এক মাঝবয়সী বিস্ময় এবং সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "এই রাস্তার চারপাশে কত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পলিটিসিয়ান, মিনিস্টার থাকে, তারা কেউ জানে না ?"

পিছনের সিট থেকে একজন ফোড়ন কাটল, "দাদা, বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি, এটা মানেন তো ? এই যে পলিটিসিয়ান মন্ত্রীদের কথা বললেন, ভোটের আগে যে সব প্রতিশ্রুতি দেয় সেগুলো ভুলতে কতক্ষণ সময় নেয় বলুন তো ?"

এবার কথাবার্তা অন্যদিকে মোড় নেবে। তাই রোহিণী ব্যস্ত হয়ে বলল, "যার নামেই রাস্তা হোক, সেটা কেউ জানে না আর আপনি জানলেন কী করে ?"

আপনি সম্বোধনে ছেলেটির ব্যক্তিত্ব অবশ্যই বেড়ে গেল, যেটা রোহিণীর অভিপ্রেত ছিল। বাস থেকে নেমে ওদের রক্ষণাধীনে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনোর চিন্তাটা তার মাথায় এসে গেছে।

"ফুলবাগানে শেতলা মন্দিরটার সামনে আর উল্টোডাঙায় হাডকো কমপ্লেক্সের গায়ে দুটো পাথর লাগানো আছে ছোট্ট দেয়ালে, কলকাতার পুরমন্ত্রী বসিয়েছে। তাতে এই রাস্তার নাম বলা আছে—আচার্য সত্যেন বোস সরণি।"

"অ্যাঁ !" আত্মবিস্মৃত জাতির একজন কেউ আকাশ থেকে পড়লেন। "নামটা বলা উচিত ছিল, একদম মনেই পড়ল না।"

"পুরমন্ত্রী যখন বসিয়েছে, তখন তো অফিসিয়াল নামই।"

"অথচ কেউ তা জানে না। ভাই তুমি ঠিক বলছ ?" মাঝবয়সী লোকটি তার সন্দেহ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলেন।

বাসটা বিধান শিশু উদ্যান স্টপ থেকে ছেড়েছে। ছেলেটি ভ্রূ কুঁচকে আহত স্বরে বলল, "সামনের স্টপই উল্টোডাঙার মোড়। নামুন, আপনাকে দেখিয়ে দেব।"

ছেলেটি যেন এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। রোহিণীর দিকে আর দৃকপাত না

করে সে দরজার দিকে এগোল, সঙ্গে অন্য ছেলেটিও। মাঝবয়সীর গন্তব্য বোধহয় এখানেই, নামার জন্য তিনিও প্রস্তুত হলেন। রোহিণী দমে গেল। বাস থেকে নেমে সম্ভবত একাই তাকে হাঁটতে হবে। এই অল্পবয়সীরা সব ব্যাপারেই কেন যে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এটা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু বয়সটা বছর পনেরো কম হলে সেও কি এখন বাস থেকে নেমে পড়ত ? উত্তরের জন্য সে অবশ্য মাথা ঘামাল না। তার মাথায় এখন অনেক কিছু রয়েছে ভাবার জন্য।

রোহিণীর সঙ্গে একজনই শুধু নামল এবং নেমেই লোকটি বাঁ দিকে হাঁটতে শুরু করল। প্রতিদিনই সে সি ডি ব্লকে সেকেন্ড অ্যাভিনুয়ের এই চক্করটায় মিনি বাস থেকে নামে। তার গন্তব্য ডান দিকে। ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়েই তার মনে হল, ছেলে দুটি থাকলে ভাল হত। অন্ধকারটা ঝাপসা, তারই মধ্যে খামচা খামচা রাস্তার আলো।

কোন এক বাড়ির টিভি থেকে খবর পড়া শুরুর আগের জিঙ্গল্ বাজছে। রোহিণী ঘড়ি দেখল। সাড়ে নটা। এত রাত হল কি করে ? সে দ্রুত পা চালাল। খিদে তো পেয়েছেই, তাছাড়া চঞ্চলা নামে বছর বারোর যে মেয়েটাকে কাল গৌরীর মা কাজের জন্য এনে দিয়েছে, সে যে কী করছে এতক্ষন কে জানে ! ওকে দোকান থেকে কয়েকটা জিনিস আনতে দিয়েছে আর দশটা ডিম। কী করে গ্যাস বার্নার জ্বালাতে-নেভাতে হয়, কাল ও আজ তা শিখিয়ে বলে রেখেছে রুটি করে রাখতে। মেয়েটা যথেষ্ট চালাক আর কৌতূহলী। এই বাড়িতে তিনটি ফ্ল্যাটে গৌরীর মা ঠিকে কাজ করে। বাসন মাজা, ঘর মোছা আর কাপড় কাচার জন্য রোহিণী তাকে আশি টাকা দেয়। যেহেতু দুপুরের পর সে থাকে না তাই কাজটা একবেলার। তবে দোকান-বাজার থেকে কিছু আনতে হলে গৌরীর মাকে সে টাকা দিয়ে রাখে, পরের দিন সকালে কাজে আসার সময় কিনে নিয়ে আসে। দুষ্প্রাপ্য কেরোসিনও কালোবাজার থেকে এনে দেয়। রেফ্রিজারেটর থাকাটা খুবই দরকার। তাহলে গ্যাস খরচ কমবে, একসঙ্গে তিনদিনের বাজার করে রেখে দিতে পারবে, দুদিনের রান্নাও। গঙ্গাদার কাছে হাজার পাঁচেক টাকা ধার চাইবে ভেবেও চাইতে পারেনি। বিনা ভাড়ায় ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছেন, চাকরি দিয়েছেন, এরপরও কিছু চাইতে তার লজ্জা করে।

বাড়ির সামনে নিচু পাঁচিল, নিচু লোহার ফটক। সোজা সিমেন্ট বাঁধানো পথ বাড়ির শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে গেছে পিছন দিকে। এই পথটায় রাত্রে গাড়ি রাখা হয়। তিনটি মোটর থাকে। পিছন দিকেই দারোয়ানের এবং জলের পাম্পের ঘর। চৌকো, সাদামাটা এই হালকা গোলাপি ও মাখন রঙ লাগানো বাড়িতে দুটি সিঁড়ি ষোলটি ফ্ল্যাটের জন্য। রোহিণীর সিঁড়িটি 'বি' ব্লকে। তিনতলায় তিনশো ছয় নম্বর ফ্ল্যাট। পূব ও দক্ষিণ বন্ধই প্রায়। উত্তরের ঘরের জানলা খুললে দেখা যায় মাঠ, যেখানে এখনো বাড়ি ওঠেনি।

গেটের আলো পাঁচ দিন ধরে জ্বলছে না। আজও তাই। মোটর রয়েছে দুটি। একটি এখনো ফেরেনি। একতলার কোলাপসিবল দরজার উপরে কম পাওয়ারের আলোটা জ্বলছে। ইলেকট্রিক মিটার বোর্ডগুলোর উল্টোদিকে আটটি লেটার বক্স। রোহিণী অভ্যাস মত বাক্সের কাঁচ দিয়ে দেখল, কোন চিঠি নেই। দিদি অনেকদিন চিঠি দেয়নি।

সিঁড়ির দোতলার ল্যান্ডিংয়ের আলো জ্বলছে না। তিনতলারটাও নেভানো মনে হচ্ছে। যদি জ্বলত, তাহলে দোতলায় আলোর ছিটে পড়ত। রোহিণী থমকে দাঁড়াল। হৃদস্পন্দন সামান্য বাড়ল। আলো তো কালও জ্বলছিল। কোথাও কোন শব্দ নেই। মনে হল একটা খসখসানি যেন সে শুনতে পেল। কাঠের মত সে দাঁড়িয়ে থাকল।

কোন মানুষ কি ? দারোয়ানের থাকার কথা গেটের কাছে। কিন্তু নেই। সিঁড়ির দরজা রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। বাইরের যে-কেউই উপরে উঠে যেতে পারে। কাছাকাছি কোন বাড়িতে কিছুদিন আগে ডাকাতি হয়ে গেছে। কলিংবেল টিপে দরজা খুলিয়ে জনাচারেক ফ্ল্যাটে ঢোকে। ছোরা দেখিয়ে বেঁধে রেখে গহনা, নগদ টাকা, ঘড়ি, টেপ রেকর্ডার এমনকি দামী ছ'টা শাড়ি পর্যন্তও নিয়ে গেছে। আলমারি খুলে শাড়ি ও গহনা বার করার সময় বাধা দিতে গিয়ে গিন্নি ছোরার খোঁচা খেয়েছে ঘাড়ে আর পেটে। নগদে ও জিনিসে সত্তর হাজার টাকা ডাকাতরা নিয়েছে।

রোহিণী প্রথমেই নিশ্চিন্ত হল, ডাকাতরা তার ফ্ল্যাটে আসবে না। ওরা খোঁজ খবর করেই আসে। আর নিশ্চয় এটা জানবে যে, একটা খুদে ট্রানজিস্টর, দুটো সুটকেস, কয়েকটা শাড়ি, যার মধ্যে সর্বোচ্চ দামেরটি সাড়ে ছশো টাকার, একটা সিলিং ফ্যান, টেবল ল্যাম্প ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। নগদ প্রায় সাতশো টাকা আছে ডিক্সনারির মধ্যে, খুঁজে বের করা খুবই শক্ত। শোভনেশের দেওয়া হীরের আংটি, কানের মুক্তোর টপ, এগুলোর কোনটাই সে পরে না। আছে সুটকেশে একটা খামের মধ্যে। এর জন্য ফন্দিফিকির করে ডাকাতরা এলে তাদের মজুরি পোষাবে না।

আবার খসখস হল। রোহিণী কয়েক ধাপ নেমে এসে একতলার ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়াল। ডাক্তারবাবুর ফ্ল্যাটের কলিংবেলে আঙুল রাখল। দরকার মনে করলেই টিপবে। উনি বৃদ্ধ, কিন্তু ওর চাকরটা বেশ বলিষ্ঠ। অন্যদিকের ফ্ল্যাটে এক মাড়োয়ারি পরিবার। প্রত্যেকের আনফিট শরীর, তাছাড়া নিরীহ গোবেচারা ধবেনর। ডাকাত শুনলে হয়তো চেঁচামেচি করবে, কিন্তু দরজা এঁটে।

লোডশেডিং হলে চলাফেরায় খুব অসুবিধে হয় শুনে গঙ্গাদা বলেছিলেন, একটা পেন্সিল টর্চ ব্যাগে রেখে দিও। টর্চ কিনেওছে। কিন্তু ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ায় সেটা টেবলে রেখে দেয়। ভুলে গেছে নতুন ব্যাটারি লাগাতে। একটা কাজ অবশ্য কবা যেতে পারে, দারোয়ান বা তার বৌকে ডেকে সঙ্গে করে উপরে ওঠা।

কিন্তু আর খসখস হচ্ছে না। চোর ডাকাত হলে এতক্ষণ অপেক্ষা কবত না। নেমে এসে তার পাশ দিয়ে ভালমানুষের মত বেরিয়ে যেত। রোহিণী আবার সিঁড়ি দিয়ে এক পা এক পা করে উঠতে শুরু করল। আর তখনই বাইরে মোটর থামার শব্দ হল।

সাহস পেয়ে সে দোতলা পর্যন্ত উঠল। তিনতলার সিঁড়িতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখ সইয়ে নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল দেয়ালে হাত রেখে। ঠিক কোন ধাপটায় ল্যান্ডিং, সেটা বুঝতে পারছে না। একবার হোঁচটও খেল। ডান পাটা সন্তর্পণে তুলে উপরের ধাপে ফেলতে গিয়ে সে আর সিঁড়ি পেল না ফলে সামনে ঝুঁকে পড়ে। ভারসাম্য রাখতে এক পা এগিয়ে দিতেই জুতোব ঠোক্কর লাগে নরম একটা জিনিসে।

রোহিণী এবং কুকুরটি একই সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। তবে দুজনের মুখ থেকে দু'রকম আওয়াজ বেরোয়। রোহিণী থরথর করে কাঁপতে থাকে আর কুকুরটি, বাইরের ফটকে যার আস্তানা, চোরের মতই নিচে নেমে গেল।

একতলায় সুইচের শব্দ এবং সিঁড়ির সবকটি আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের কণ্ঠস্বর ও দুমদাম পা ফেলার আওয়াজ ভেসে এল। চারতলার তুষার দত্ত সপবিবারে ফিরলেন।

রোহিণীকে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, প্রথমে ছেলে দুটি তারপর বড় মেয়ে

নন্দা—যার বয়স ষোল, তারপর একদা বডি বিল্ডার ও বেঁটেখাটো তুষার দত্ত—যিনি কলপ দিয়ে যৌবনকে চিরস্থায়ী করে রাখতে চাইছেন, এবং সবশেষে সিঁথিতে সিঁদুর লেপা ও চশমা পরা, আরতি নামে একটি চর্বির বস্তা, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের কারোর সঙ্গেই রোহিণীর ভাল পরিচয় নেই। শুধু দু-তিনবার ওদের ফ্ল্যাটে গেছে জরুরী ফোন ধরার জন্য।

"সিঁড়িটা অন্ধকার ছিল, বেকায়দায় পা-টা এমন মচকে গেল।"

রোহিণী কৈফিয়ত দেবার মত স্বরে তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলেই বুঝতে পারল, সত্যিই সে ভয় পেয়ে গেছিল। মুখে করুণ ভাব ফুটিয়ে সে হাসারও চেষ্টা করল।

"পা ফেলতে পারছি না, তাই দাঁড়িয়ে পড়েছি।"

রোহিণী যদি জানত, কী সর্বনাশকে সে এই একটি বাক্যদ্বারা ডেকে আনছে তাহলে মুখে চাবি দিয়ে রাখত।

"হাড় টাড় ভাঙল নাকি? দেখি দেখি, কোন পা?" তুষার দত্ত হাত বাড়িয়ে প্রায় হুমড়ি খেলেন রোহিণীর পায়ের গোড়ায়।

"না না ভাঙেনি।" রোহিণী দুহাত মেলে ধরে ঝুঁকে পড়ল।

"কি করে জানলেন ভাঙেনি?' তুষার দত্তের হাত পৌঁছে গেল রোহিণীর ডান পায়ের পাতায়। "এই পায়ে?"

রোহিণী সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, "বাঁ পায়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের আঙুলগুলো বাঁ পায়ের পাতাটা জুতো সমেতই আঁকড়ে ধরল। তারপর পাতা থেকে গোছ পর্যন্ত তুষার দত্তর অর্থপেডিক পরীক্ষা শুরু হল। জুতোটা আগেই খুলে নিয়েছিল, পা-টা কিঞ্চিৎ তোলার চেষ্টা করতেই রোহিণী মরীয়া হয়ে বলল, "দেখুন তো, আপনি গুরুজন পায়ে হাত দিচ্ছেন, আমার কী যে লজ্জা করছে!"

"তাই বলে পাটা ভেঙেছে কিনা দেখব না?"

রেহাই পাবার জন্য রোহিণী সাহায্যের আশায় অসহায় মুখে ওর ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর দিকে তাকাল। তারাও বিভ্রান্ত।

"মনে হচ্ছে স্প্রেন হয়েছে, সম্পূর্ণ রেস্ট দরকার। পায়ে চাপ দিয়ে ওঠা তো উচিত নয়।"

"পারব, পারব, এই কটা তো সিঁড়ি।"

রোহিণী ব্যগ্র স্বরে তিনতলার ল্যান্ডিংয়ের দিকে তাকাল। "বারোটা মাত্র, পারব।"

"পারবেন তো নিশ্চয়, কিন্তু দুটো সিঁড়ি ভাঙাও এখন উচিত হবে না। আপনি বরং—"

তুষার দত্ত তার পরামর্শকে বাস্তবায়িত করার আগেই রোহিণী হাত বাড়িয়ে নন্দাকে তার বাঁ দিকে টেনে আনল।

"এই তো নন্দা, ওর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে যাব।"

সকাল থেকে কি যে ঝামেলা! রোহিণী দাঁতে দাঁত ঘষল। এভাবে ভয় পাওয়ার কোন মানে হয়? বাইরে, মনের ভেতরে সবখানেই তো অন্ধকার। আনাচে কানাচে কুকুর তো আছেই, তার উপর এই সব উপকারী জীবেরা। এখন ঘরে পৌঁছনো পর্যন্ত তো খোড়ার অভিনয় করে যেতেই হবে।

"ওর একার পক্ষে কি সম্ভব? দুজনেই পড়ে যাবেন, আমি বরং—"

তুষার দত্ত বোকামি করে আর সময়ক্ষেপ করল না। রোহিণীর প্রতিরক্ষা তৈরি হবার আগেই তার অরক্ষিত ডান বাহু জড়িয়ে ধরল বগলের তলা দিয়ে বাঁ হাত ঢুকিয়ে।

আরতি চুপ করে ব্যাপারটা দেখে যাচ্ছেন। ঠাণ্ডা গোবেচারা মানুষ। নিচুস্বরে কথা বলেন আর সংসারের কাজ করেন অবিরাম। রোহিণী অস্বস্তিভরে তার দিকে তাকাল। নন্দা তার বাবার এই কাজটা অনুমোদন করতে না পেরে বলল, "বাবা তোমায় আর ধরতে হবে না, আমার গায়ে যথেষ্ট জোর আছে।"

তুষার কটমটিয়ে একবার শুধু মেয়ের দিকে তাকাল। "এইবার আস্তে আস্তে পা ফেলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আহহ্ অত তাড়া কিসের।"

রোহিণীর ইচ্ছে করছে ছুটে তিনতলায় উঠে যেতে, কেন না তুষার দত্তর বাম বাহু তার পাঁজরের যে জায়গায় চাপ দিচ্ছে তাতে বিপন্নকে সাহায্য দেবার রীতিটা রক্ষিত হচ্ছে না। নন্দা তার অস্বস্তির কারণটা বুঝেই ডান বাহু ছেড়ে পিঠের উপর দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে বাম বগলের নিচে ঢোকাতে গেল। কিন্তু তুষার দত্তর বাইসেপ দুর্ভেদ্য করে রেখেছে অঞ্চলটা। নন্দা একটু ফাঁক খুঁজছে হাতটা গলাবার জন্য, তুষার দত্ত আরো চেপে ধরেছে রোহিণীর পাঁজর। আরতি ওদের পিছনে, সামনে ছেলে দুটি।

রোহিণী ঠিক করল, আর নয় এবার কিছু করা দরকার। নন্দা বাবার ব্যাপারটায় লজ্জা পাচ্ছে এবং নিজের হাত রেখে একটা আড়াল তৈরি করতে চাইছে, এতে রোহিণী নিজেও কুঁকড়ে যাচ্ছে। এইটুকু মেয়ে, কী ভাবছে তার সম্পর্কে : বিরক্তিতে রাগে সে বাকি দুটি সিঁড়ি একলাফে পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"আমার কিছুই হয়নি, মিছিমিছি আপনাদের কষ্ট দিলাম।" রোহিণী নিজের দরজার কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল।

"এটা কোন কষ্টের ব্যাপারই নয়।" তুষার দত্ত এখন বিনীত ও ভদ্রলোক। "বরফ দেওয়া দরকার। আমি এক্ষুনি আইসব্যাগ আর বরফ আনছি।"

লোকটি পড়িমরি চারতলায় উঠে গেল, তার সঙ্গে ছেলে দুটিও। নন্দার মুখে লজ্জার কালো ছাপ। আরতি কিছুই বোঝেননি। উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন, "বরফ দেওয়া ভাল। তাহলে আর ব্যথা হবে না।"

রোহিণী যথাসাধ্য হাসল এবং আবার বোতাম টিপল। তখন নন্দা ব্যস্ত হয়ে বলল, "আন্টি, আপনার কাজের মেয়েটা বিকেলে চলে গেছে। আমি গেটে দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন ও চলে যাচ্ছে। আমায় বলল, একা থাকতে ভয় করছে, আর আসবে না।"

"সে কি ! ভয় করছে ? আশ্চর্য তো !"

"তাই তো বলল। আমি বললুম, তিনতলায় আবার ভয় কিসের ? নতুন বাড়ি, ভূতটুত এখনো বাসা বাঁধেনি, তাছাড়া এত লোক রয়েছে। তা আমার কথায় আর কিছু না বলেই হাঁটতে শুরু করে দিল। মেয়েটার মাথায় বোধহয় ছিট আছে।"

রোহিণী দমে গেল খবরটা শুনে। যাও বা একটা কাজের মেয়ে পাওয়া গেল, একদিনেই ভেগে পড়ল।

"সঙ্গে করে কিছু নিয়ে যেতে দেখলে ?"

"না, খালি হাতেই তো গেল। তবে লুকিয়ে কিছু নিয়েছে কিনা জানি না।"

থলি থেকে চাবি বার করে রোহিণী দরজা খুলল। "আচ্ছা।"

মুখের হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই সে দরজার পাল্লা বন্ধ করে দিল।

অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে রোহিণী চোখ বন্ধ করল। সারা দিন নয়, যেন সারা জীবন ঘুরে এসে এখন সে চটপট একটা হিসেব-নিকেশ করে ফেলার কাজে ব্যস্ত। অনেকগুলো বছর পিছিয়ে না গেলে এখনকার এই অবস্থাটা কেন হল, তার ফর্দ তৈরি করা যাবে না। তবে একটা জিনিস এখনো তার অটুট আছে, তার মূলধন, তার দেহ। এটা পাঁচ মিনিট আগেও পরীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই দেহই তাকে এখন এই অন্ধকার জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখল।

চোখ সয়ে যেতে সে মেঝেয় ঘষে পা বাড়াল। ডাইনিং স্পেস, ডান দিকে খাওয়ার টেবল। সোজা গেলে শোয়ার ঘর, বাঁ দিকেও একটা ঘর, যেটা ফাঁকাই পড়ে আছে। টেবলটার পাশে রান্নাঘর আর কলঘর। অনাবশ্যক আসবাব একটিও নেই। রোহিণী হোঁচট না খেয়ে সুইচ বোর্ডের কাছে পৌঁছল।

উত্তরের জানলাটা খোলা। অন্ধকাবেব ফ্রেমের মধ্যে চৌকো একখণ্ড সাদা ক্যানভাসের আভা। অনেকটা কুয়াশার মত, যা ভোরবেলায় মাঠের দু হাত উপরে জমাট হয়ে থাকে। ঝাপসা সাদা ছায়ার পিছনে ছমছম করা রহস্য স্থির হয়ে রয়েছে। ক্যানভাসটায় রয়েছে একটা কৃষ্ণচূড়া, যে নিষ্পত্র ডালগুলো দিয়ে লজ্জা ঢাকার কাজে ব্যর্থ হয়ে রাস্তার ইলেকট্রিক বাতির সামনে অপ্রতিভ অবস্থায়। রোহিণী আচ্ছন্নের মত জানালাব দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেক কিছুই তার মনে পড়ে যাচ্ছে।

কলিং বেল বেজে উঠল। সুইচ টিপে ডাইনিংয়ের আলো জ্বালিয়ে সে একনজর জায়গাটায় তাকাল। চারটে ঠোঙা আর কিছু রেজগি টেবলে রয়েছে, যা সকালে ছিল না। চঞ্চলা তাহলে জিনিস কিনে দিয়েই কাজ ছেড়েছে। মেয়েটা বিশ্বাসী আর খাটিয়ে ছিল। চলে গিয়ে লোকসানই হল।

আবার বেল বাজল। লোকটা যে নাছোড়বান্দা টাইপের, এটা সে বহুদিন আগেই বুঝে গেছে। এখন বরফ এনেছে আর সেই বরফ পায়ে ঘষে দেবার জন্য বায়না জুড়বে। ব্যাটার বড্ড নোলা, এবার শাস্তি দিতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রোহিনী ঊর্ধ্বাঙ্গ মুচড়ে কার্ডিগানটা থেকে নিজেকে বার করতে করতে এবং অন্যমনস্কতাব জন্য শাড়ি যাতে বিস্রস্ত হয়ে কিছুটা বেআব্রু করে দেয় সেদিকে লক্ষ রেখে, সে দবজার আই হোলে চোখ রাখল।

যা ভেবেছিল তাই-ই, কিন্তু পেছনে গম্ভীর মুখে মেয়েও দাঁড়িয়ে। হাঁফ ছেড়ে কার্ডিগান আবার শরীরে সেঁটে নিয়ে রোহিণী দরজার অর্ধেকটা খুলল। তুষার দত্ত কিছু বলার আগেই সে তার হাত থেকে আইসব্যাগটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "ওহ্ এনেছেন, দিন। ভালই হল। ধন্যবাদ।"

সে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে তখন তুষার দত্ত ব্যস্ত হয়ে, "দাঁড়ান দাঁড়ান" বলে মেয়ের দিকে তাকালেন।

"আন্টি, আপনার তো আজ রান্না হয়নি।"

"দেখতে হবে মেয়েটা কিছু রেঁধে রেখেছে কিনা।"

"মা বলল, আপনার যদি অসুবিধা না হয় তো আমাদের সঙ্গে খাবেন।"

"মানে আমিই বললুম যে, ওনার কাজের মেয়েটা তো চলে গেছে—"

বাপ আর মেয়ের মধ্যে চাহনির একটা জ্বলন্ত সংঘর্ষ ঘটে গেল। তার স্ফুলিঙ্গ নিভে যাবার আগেই রোহিণী বলল, "আচ্ছা, আমি আগে দেখে নিই রেঁধে রেখেছে কিনা।"

দরজা খুলে রেখেই সে রান্নাঘরে এসে আলো জ্বালল। সকালে মাজা বাসনগুলো গ্যাসবার্নারের পাশে উপুড় করে রাখা, রান্না হয়েছে এমন প্রমাণ কোথাও নেই। রুটিও করে রেখে যায়নি। ফিরে আসতে আসতে দেখল, ওরা দুজন ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছে।

"আরে, রেঁধে রেখেছে দেখছি!' বিস্ময়টা একটু বেশি মাত্রায়ই হয়ে গেল, কিন্তু রোহিণী সেটা কমাবার চেষ্টা করল না। "ডিমের ঝুরি করতে বলেছিলাম, সেদ্ধ করে রেখেছে! ভালই হল, ভাজাভুজি যত কম খাওয়া যায়--।"

দুজনের মুখে হতাশা ফুটে উঠল। কিন্তু রোহিণীর এতে কিছু করার নেই। খিদেয় পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়ি কচলাচ্ছে, তবুও সে উপরের ফ্ল্যাটে যেতে ইচ্ছুক নয়। ওরা লোক ভাল, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, একটু বেশি ভাল।

"ডিম সেদ্দটা কি একটা খাওয়ার জিনিস হল। আপনাকে ধোঁকা আর মাছের ডিমের চাটনি খাওয়াব। চলুন, চলুন।" তুষার দত্ত হাত ধরে টানবার মত ভঙ্গি করলেন। রোহিণী এক পা পিছিয়ে গেল।

"না, রাত্তিরে আমি বেশি খাই না।"

"ফিগার রাখার জন্য?" তুষার দত্ত কোন রকম ঢাক ঢাক না রেখেই রোহিণীর গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত চাহনির বুরুশ চালালেন। নন্দার চোখে যে সেটা এড়াল না, রোহিণী তা লক্ষ করে বলল, "ফিগার রাখাটা কি খুব দোষের বা অস্বাভাবিক কিছু?"

"না না না, তা বলছি না—"

"আপনার খিদে পায়নি তুষারবাবু?" কোমল স্বরে রোহিণী জানতে চাইল।

"নিশ্চয় পেয়েছে।" প্রায় সগর্বে তুষার দত্ত ঘোষণা করলেন।

"তাহলে খেতে যান।"

গম্ভীর মুখে রোহিণী দরজা বন্ধ করে দিল। উপরে গিয়ে টেলিফোন ধরা বা করার পথটাও এবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ঘাড়েপড়া একটা ঝঞ্ঝাটে জড়ানোর থেকে দূরে থাকতে এটা করতেই হল। লোকটা যা মাথামোটা, তার প্রত্যাখ্যানটা বুঝতে পারল কিনা কে জানে! তবে নন্দা বুঝতে পেরেছে।

এবার কিছু একটা রান্না করে খেতে হবে। চঞ্চলা ডিম, পেঁয়াজ, মুসুর ডাল, আর সকালের জন্য বিস্কুট কিনে রেখে গেছে। কাল গৌরীর মা না আসা পর্যন্ত জানা যাবে না, মেয়েটা কেন পালাল। ডিমের ওমলেট না শুধুই সেদ্ধ, কোনটা তাড়াতাড়ি করা যাবে? সেকেণ্ড পাঁচেক ভেবে নিয়ে রোহিণী বাটিতে জল দিয়ে তিনটে ডিম সেদ্ধ করতে বসাল। সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট ক্যালোরি এর থেকে পাওয়া যাবে।

কিবা শীত, কিবা গ্রীষ্ম, রাতে শোয়ার আগে রোহিণীর স্নান করার অভ্যাস। ডিম সেদ্ধ হবার আগেই সে শরীরকে যাবতীয় আবরণ থেকে রেহাই দিয়ে অন্ধকার শোবার ঘরে ম্যাক্সিটা খুঁজতে শুরু করল। চঞ্চলা কোথাও তুলে রেখেছে। ঘরে না পেয়ে নগ্ন অবস্থাতেই সে ডাইনিংয়ে এল। বন্ধ জানলাটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। শোবার ঘরে উত্তরের খোলা জানলা দিয়ে শুধু মাঠ আর কৃষ্ণচূড়া গাছটা দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকেও সে নিশ্চিন্ত। একা একটা ফ্ল্যাটে থাকার জন্যই তার দেহ সম্পর্কিত জড়তা ভেঙে গেছে। নগ্ন হয়েই বহুরাতে সে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙে ভোরে কলঘরে গেছে, ব্যায়াম করেছে এবং গৌরীর মা আসার আগে সায়া-শাড়ি পরেছে। একটা হালকা স্বাচ্ছন্দ্য আর অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দ সে পায়, যতক্ষণ নিরাবরণ হয়ে একা থাকে।

তন্ন তন্ন করে সে সারা ফ্ল্যাট খুঁজল। দুশো টাকা দিয়ে কিনে বোম্বাই থেকে দিদি চার মাস আগে ম্যাক্সিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। এটা পরে সে নিচের কল থেকে বালতিতে জল তুলে এনেছে, যখন পাওয়ার কাটের জন্য পাম্প না চলায় ট্যাঙ্কে জল ছিল না। উপরে উঠে ফোনও ধরেছে এবং নন্দা ফিসফিস করে তখন অনুরোধ জানায় তার জন্যও একটা আনিয়ে দিতে। জিনিসটা তার খুব প্রিয়, খুঁজে না পেয়ে তার বিরক্তি চরমে উঠল। খাটে বসে সে হতাশ হয়ে ডাইনিং থেকে আসা আলোয় ঘরের মধ্যে যতটা সম্ভব দেখার জন্য এধার-ওধার তাকিয়ে আয়নায় নিজের আবছা মূর্তিটা দেখে চমকে গেল।

ঠিক এইভাবেই! দোতলার খড়খড়ির জানলাটা খোলা ছিল। নিমগাছটার উপর দুপুরের রোদ ঝরছিল। পাতাগুলো গনগনে তাত শুষে নিয়ে কোমল হালকা আলো পাঠিয়ে দিচ্ছিল ঘরে। সেকেলে বিরাট ঘরের ভারী কড়িবরগার উঁচু ছাদ আর সাদা-কালো বরফি কাটা মার্বেলের মেঝের মধ্যবর্তী শূন্যতায় সেই আলো স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে। 'এই আলোটা আমার পছন্দ।' শোভনেশ বলেছিল। জানলার কাছে কালো চামড়া-মোড়া পুরনো ভারী ডিভানে বসেছিল রোহিণী। 'এইবার কাপড়চোপড়গুলো খুলে ফেল।' বিষাক্ত সাপ দেখে ভয় পাওয়ার মত সে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। 'সে কি?' বিশ্বাস করতে পারছিল না শোভনেশের কথা। 'তাতে কি হয়েছে! এখানে শুধু তুমি আর আমি, বাইরের কেউ তো দেখতে পাবে না। তাড়াতাড়ি করো।' শেষ দিকে কঠিন হয়ে গেছল শোভনেশের স্বর, প্রায় আদেশের মত। রোহিণী জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। নিমগাছটা বাড়ির বাগানের মাঝামাঝি, তার দুপাশে বাড়ির দুটো অংশ, যেখানে অন্য শরিকরা থাকে এবং গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যার প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তিনতলায় জানালার সবগুলোই বন্ধ, তবে খড়খড়ির একটি দুটি পাখি খসে গেছে। এই জানালাগুলো কখনো সে খোলা দেখেনি। ছাদে লোক নেই। কেউ দেখতে পারে না ঠিকই কিন্তু সেজন্য নয়, রোহিণী কখনো কোনদিন কারুর সামনে বিবসনা হয়নি। তার মন কিছুতেই সায় দেয়নি এই প্রস্তাবে। হোক না সেটা স্বামীর বা খ্যাতনামা কোন আর্টিস্টের। 'কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' শোভনেশ অধৈর্য, বিরক্ত হয়ে গলা চড়ায়। 'না আমি পারব না, ন্যুড হয়ে মডেল সাজা আমার দ্বারা হবে না।' রোহিণী বন্ধ দরজার দিকে এগোয়। ড্রইং বোর্ডে সাঁটা কাগজের সামনে পেন্সিল হাতে শোভনেশ দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় দশ কদম ছুটে এসে সে রোহিণীর দুটো কাঁধ সাঁড়াশির মত আঙুলে চেপে ধরে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন?' রোহিণী বলে, 'শুধুই আমি করেছি? বিয়ে তো দুজনে করেছি। কিন্তু তা কি এইভাবে মডেল হবার জন্য? এসব আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যে তোমার সামনে কাপড় খুলত, তাকে ডেকে আন।' এরপর শোভনেশ যা করল, রোহিণী তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। দু হাতে ব্লাউজের গলা ধরে পড়পড় করে ছিঁড়ে দিয়ে শোভনেশ তাকে ঠেলতে ঠেলতে ডিভানের কাছে এসে ধাক্কা দেয়। রোহিণী চিত হয়ে পড়তেই সে শাড়ি ধরে টান দিয়ে খুলতে শুরু করে। আকস্মিকতার ধাক্কা কাটিয়ে রোহিণী পা ছোঁড়ে, সেটা শোভনেশের হাঁটুতে লাগে। সেই ফাঁকে ধড়মড়িয়ে উঠে সে দৌড়ে গিয়ে দরজার খিল খুলে তিনতলায় ছুটে আসে নিজের ঘরে। বিছানায় বসে হাঁফাতে হাঁফাতে পাশে তাকাতে চোখ পড়ে আয়নায়।

ঠিক এইভাবেই সেদিন সে বসেছিল।

কলিং বেল একবার টুং করে বেজেই থেমে গেল। রোহিণী অবাক হল এবং অস্বস্তি বোধ করল। আশ্চর্য! এত রাতে? কে হতে পারে? অপেক্ষায় রইল আবার বেজে

ওঠার। একটা কিছু গায়ে চাপাতে হবে। ছেড়ে রাখা শাড়িটাই টেনে নিল।

ডিম অনেকক্ষণ সিদ্ধ হচ্ছে। বেশি শক্ত হলে খেতে বিশ্রী লাগবে। শাড়িটা জড়িয়ে রান্নাঘরে এসে বার্নার নিভিয়ে সে বেল বাজার জন্য আবার অপেক্ষায় রইল।

আর বাজছে না। এবার সে কৌতূহলী হয়ে পড়ল। এত রাতে তুষার দত্ত বাঁদরামো করবে না। তাহলে কে ? পায়ে পায়ে দরজায় এসে আই হোলে চোখ রাখল। ফাঁকা সিঁড়ি, দেয়াল। একটা লোকও নেই।

দরজা খুলে উঁকি দিল। তারপর নিচের দিকে চোখ পড়তেই হতভম্ব হয়ে বলে উঠল, "একি !"

তার খুঁজে না-পাওয়া ম্যাক্সিটা পাট করা অবস্থায় দরজার গোড়ায়। হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানিটা কমল, একটা বড় শ্বাস বেরিয়ে এল এবং ঠোঁট মুচড়ে হাসি ফুটল। এ কাজ অবশ্যই নন্দার। বেচাবা লোভ সামলাতে পারেনি, বিবেকটাও। এখানকার সব ফ্ল্যাটেরই সদর দরজার লক্‌টা এমনই ঝঞ্ঝাটের যে, বন্ধ করলে শুধু ভিতর থেকেই নব ঘুরিয়ে খোলা যায়। বাইরে থেকে দরজা খুলতে হলে চাবি চাই ই। যদি ভিতরে কেউ না থাকে এবং চাবি সঙ্গে না নিয়ে তখন কেউ বাইরে আসে এবং দরজাটি যদি তখন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সমূহ বিপদ। হয় দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে কিংবা পাইপ বা কার্নিস বেয়ে বারান্দা দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা খুলতে হবে নয়তো চাবিওয়ালা ডেকে চাবি বানিয়ে দরজা খুলতে হবে। এব প্রত্যেকটাই সময়সাপেক্ষ এবং ঝঞ্ঝাটেব।

রোহিণী এখানে আসার পর একবার এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। তার সামনের ফ্ল্যাটে বাসকারী এক তামিল দম্পতি, শ্রীনিবাসনরা চাবি সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়ে সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল। ভিতবে কেউ ছিল না। রাত্রে ফিরে বিপদে পড়ে। বিপদে রোহিণীও পড়ে, রাতের মত তার ফ্ল্যাটে ওদের অতিথি হয়ে থাকতে বলে। একটি মাত্র বিছানা এবং মশারিও একটি। শ্রীনিবাসনরা শান্ত, ভদ্র, উচ্চশিক্ষিত। রোহিণীব অসুবিধো বুঝে তারা রাতের মত বেলেঘাটায় বন্ধুর বাড়িতে চলে যেতে চেয়েছিল। তাদের নিবস্ত কবে সে উপরে যায়।

শোনামাত্র তুষার দত্ত খুশিতে টগবগিয়ে ওঠে।

'দরজাটা ভেঙে দিলেই তো হয়, কিছু ভাববেন না, আমি ভেঙে দিচ্ছি।'

'সে কি। দরজা ভাঙবেন ?'

'কেন আমি কি পারি না ভেবেছেন ?' খুবই উত্ত্যক্ত দেখাচ্ছিল তুষার দত্তকে। 'শাল কাঠের তক্তা মাথা দিয়ে ভেঙেছি, লোহার পাটি দাঁতে চেপে দুহাতে পাকিয়ে পাকিয়ে বিড়ে বানিয়েছি আর এ তো প্লাইউডের একপাল্লার দরজা ! কাঁধ দিয়ে একটা ছোট্ট পুশ করব দেখবেন মড়াত একটা আওয়াজ হবে শুধু।'

'দরজাটা রিপ্লেস করার টাকা দেবে কে ?'

তুষার দত্ত গোলমালে পড়ে যায় রোহিণীর কথার টানে বাস্তব ভূমিতে নেমে এসে। চার-পাঁচ শো টাকা তো কম করে লাগবেই। তার পেশির বর্ম দুর্ভেদ্য হতে পারে কিন্তু টাকাপয়সা হিসাবের মল্লযুদ্ধে তুষার দত্ত সহজেই কুপোকাত হয়।

'জানি, আপনি মড়াত কেন, পটাস করে দরজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু আপনাকে এত রাতে আর কষ্ট করতে হবে না।' রোহিণী প্রায় আবেদনই জানিয়েছিল। 'মিসেস শ্রনিবাসন আমার সঙ্গে থাকবেন, আপনি যদি মিস্টার শ্রীনিবাসনের একটু শোয়ার ব্যবস্থা করেন এখানে।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, এত বড় সোফাটা তাহলে আছে কি জন্য। মশারি না টাঙালেও চলবে, মশা মারার ধূপ জ্বালিয়ে দিচ্ছি।'

ইংরাজির মত বেশ ভালই বাংলা বলতে পারে রজনী শ্রীনিবাসন। রাতে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রোহিণী এই শীর্ণকায়া তামিল বৌটির সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারে সে বি-কম, স্বামীর অফিসেই স্টেনোগ্রাফার আর সেই মাল্টি ন্যাশনাল সংস্থায় অ্যাকাউন্টসের একটা বিভাগের কর্তা কৃষ্ণমাচারি শ্রীনিবাসন। ফ্ল্যাট ভাড়ার এগারোশ টাকা দেয় অফিসই। 'চাকরি না করলেও চলে, কিন্তু করবে, না কেন, যদি আয় বাড়িয়ে কমফর্ট আর সিকিউরিটি বাড়াতে পারি। এখন ছেলেমেয়ে নেই, কিন্তু হবে তো। মেয়ের বিয়ের জন্য, আমাদের ব্রাহ্মণদের, অনেক টাকা লাগে।' কোয়েম্বাটোরের মাঝারি সরকারি অফিসার রজনীর বাবা দেড় লাখ টাকার বিনিময়ে জামাই সংগ্রহ করেছেন। 'খুব সস্তাতেই বলতে হবে।' রজনী আপ্লুত হয়ে বলেছিল। তখন রোহিণী মনে মনে ভেবেছিল, এই ফ্ল্যাট ভাড়া দিলে গঙ্গাদা এগারোশ টাকা মাসে মাসে পেতেন। তার জন্যই পাচ্ছেন না। সে কৃতজ্ঞ থাকল।

পরদিন সকালেই তুষার দত্ত চাবিওয়ালা ডেকে আনে। তখন একটা পরামর্শ সে রোহিণীকে দেয় : 'দুটো চাবির একটা ফ্ল্যাটের বাইরে কোথাও রাখুন, তাহলে এইরকম দুর্ভোগে পড়তে হবে না।'

'কোথায় রাখব?'

'আমার কাছে রাখতে পারেন, অবশ্য যদি বিশ্বাস করেন।'

'না না অবিশ্বাসের কি আছে। আমার চুরি করার মত দামী জিনিস কিছুই নেই।'

একটা চাবি সে তুষার দত্তর বৌয়ের হাতে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকে তার মনের গভীরে একটা অস্বস্তি মাঝে মাঝে খচখচ করে। সে কোথায় যেন অনাবৃত, অনিরাপদ হয়ে রয়েছে। যে কোন সময় তার জীবনের ঢিলেঢালা গোপনীয়তা আক্রান্ত হতে পারে, ব্যক্তিগত অংশের অনেকটাই যেন হারিয়ে গেল। তার ব্যক্তিত্ব যেন এখন থেকে অন্যের হাতে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

সেদ্ধ ডিম খেতে খেতে রোহিণী ভাবল, চাবিটা উপর থেকে চেয়ে এনে রজনীর কাছে রাখলে কেমন হয়! ওরা দুজনে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসে। দিনের বেলায় তো চাবির দরকার পড়বে না। নন্দার ভীষণ কৌতূহল আন্টির ব্যক্তিগত জীবন জানার জন্য। হয়তো ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকে। এটা ওটা ঘাঁটে।

আইসব্যাগ থেকে কিউবগুলো বার করে বাটিতে রেখেছিল। কিছুটা গলেছে। বাটি তুলে চুমুক দিয়ে জলটুকু খেয়ে সে স্নান করতে গেল। পশ্চিমে ছোট্ট বারান্দা, শোবার ঘর দিয়ে সেখানে যেতে হয়। অন্তর্বাসগুলো জলকাচা করে বারান্দার রেলিংয়ে মেলে দিয়ে সে রোজ যা করে না, বারান্দার দরজাটা আজ বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াবার সময় ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে তার মনে হল, মেয়েদের বসবাসের জায়গা যতটা ছিমছাম পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত, ঘরটা মোটেই সেরকম অবস্থায় নয়। এতটা অগোছালো হয় না যদি দিন-রাতের জন্য কাজের লোক থাকত। একটু গুছিয়ে নিলে ভাল হয়। কিন্তু এখন আর শরীর বইছে না। চঞ্চলা মেয়েটা ঠিক কেন যে পালাল, কাল গৌরীর মার কাছ থেকে সেটা জেনে নিতে হবে।

কালকের জন্য আর কি কি করণীয় কাজ রইল? চিরুনি থেকে কয়েকটা চুল টেনে বার

করে রোহিণী জানালায় গেল। ফুঁ দিয়ে আঙুল থেকে চুল উড়িয়ে জানলার পাল্লা বন্ধ করল। বিছানায় মাথার কাছেই জানালাটা, শীতকালে খুলে রাখলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কিন্তু সব ঋতুতেই ঘরের জানালা খুলে শোয়ার অভ্যাসটা ছোটবেলা থেকেই বাবা তৈরি করে দিয়েছেন। ঘরের অপর জানালাটি খুলে সে বাইরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবাকে মনে পড়লেই ছোটবেলার অনেক কথা, ঘটনা তার স্মৃতিতে জেগে ওঠে। মেয়েদের ইংরাজি বলা-কওয়া শেখানোর জন্য তাঁর চিন্তার আর শেষ ছিল না। রেডিওয় রাত নটার ইংরাজি খবর শোনা বাধ্যতামূলক ছিল। দুই বোনকে পুজোর অঞ্জলি দেবার ভঙ্গিতে রেডিওর সামনে বসতে হত, শুধু ইংরাজি উচ্চারণ শেখার জন্যই নয়, পৃথিবীতে রোজ কত ঘটনা ঘটছে, সে সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকার জন্য। 'শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে তা না হলে কথা বলবে কি করে? হাঁদা গ্র্যাজুয়েট হয়ে লাভ কি?' খবর শেষ হলে বাবা ইংরাজিতে প্রশ্ন করতেন, ইংরাজিতেই উত্তর দিতে হত। অধেক শব্দের মানেই বুঝত না রোহিণী, কিন্তু সোহিনী চমৎকার গুছিয়ে মেমসাহেবদের মত উচ্চারণে বলে দিত। বাবার চোখমুখ তখন জ্বলজ্বল করে উঠত গর্বে। 'আমার এই মেয়েটারই হবে।' কি হবে সেটা অবশ্য আর বলতেন না।

ইংরাজি খবরের পর, সাড়ে নটার মধ্যে শোওয়া আর ঠিক পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা। তারপর পার্কে গিয়ে দৌড়ানো। বাবা হাঁটতেন জোরে জোরে, ডায়াবিটিস ছিল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য রোহিণী প্রথম গল্প লিখে বাবাকে দেখায়, একটা ভিখারি মেয়ের ধনীগৃহে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে তার লাঞ্ছনা ও অপমান ছিল বিষয়। বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমার এই মেয়েটার ট্যালেন্ট আছে।'

মশা যেন আজ কমই মনে হচ্ছে। ঘরের আলো নিভিয়ে সে টেবল ল্যাম্প জ্বালাল বেড সুইচ টিপে। খবরের কাগজটা নিয়ে বেডকভার সরিয়ে বিছানায় শুলো। মশারিটা আর টাঙাতে ইচ্ছে করছে না। বেডকভার দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢেকে সে কাগজটা খুলে আবার সেই ছোট্ট খবরটায় চোখ রাখল

গঙ্গাদা কাল সকালে বাসুদেবপুর থেকে ফিরে খোঁজ নেবেন। হয়তো লাইটার্সে যাবেন। যদি জেলভাঙা লোকটা সত্যিই শোভনেশ হয়, তাহলে ত্রিশ চল্লিশ লাখ লোকের শহরে একজনকে খুঁজে বার করা সহজ নয় ঠিকই, কিন্তু গঙ্গাদাকে খুঁজে বার করতে তো ওর এক মিনিটও সময় লাগবে না। বাড়ি চেনে, অফিসও চেনে। গঙ্গাদা বলেছেন, তিনি কোনরকম হদিশ দেবেন না, বরং পুলিসে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু অফিসের অনেকেই তার এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা জানে। তাদের কারুর কাছ থেকে তো জেনে নিতে পারবে। শোভনেশ তার সন্ধান পাবে অথবা পাবে না, এই উৎকণ্ঠাটাই সব থেকে ভয়ঙ্কর। সারাক্ষণ কুরবে, মুহূর্তের জন্যও তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

'যদি আপনি জানতেন, ওর মডেল মৃত বীণা চ্যাটার্জির সঙ্গে ওর দৈহিক সম্পর্ক আছে, তাহলে কি আপনি শোভনেশ সেনগুপ্তকে বিয়ে করতেন?'

'না।'

এক সেকেন্ডও ভাববার জন্য সময় নেয়নি রোহিণী। উকিলের নয়, শোভনেশের মুখের দিকে চোখ রেখে সে জবাব দিয়েছিল কঠিন স্বরে।

'কেন বিয়ে করতেন না? উনি তো ভারতখ্যাত আর্টিস্ট, ওনার ছবি তো বহু টাকায় বিক্রি হয়।'

'হতে পারে, কিন্তু চরিত্রহীন লোকেদের আমি ঘৃণা করি।' রোহিণী তখন দেখেছিল, তার কথা শুনেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে শোভনেশের চোখ। হাত মুঠো করে বীভৎস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে থাকে। সে ভয় পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, কোর্ট ঘরটা যদি জনশূন্য হত শোভনেশ তাহলে ছুটে এসে তার গলা টিপে ধরত। ত্রাসের চাপেই সে একসময় জেরার মুখে বলে, 'হ্যাঁ, আমার মনে হত, উনি আমাকেও গলা টিপে মারতে পারেন···একবার চেষ্টাও করেছিলেন।'

'কেন করেছিলেন ?'

কোর্টকে তা জানাবার আগে রোহিণী দেখেছিল, শোভনেশ দু' হাতের ফাঁদে আঙুলগুলো একটা অদৃশ্য গলায় জড়িয়ে, পিষে, ক্রমশই কঠিন করে ঝাঁকাচ্ছে।

মাথার মধ্যে উত্তাপ জমে উঠলে যা হয়, রোহিণীর চোখ থেকে ঘুম ছুটে পালাল। সে জানে, এখন আর ঘুমকে তাড়া করে ধরা যাবে না। সে জানে, কেননা এমন অশান্ত, উত্তেজক রাত সে বহুবার যাপন করেছে, এখন স্মৃতির দরজা খুলে তাকে ঢুকতে হবে একটা সুড়ঙ্গে। দুধারে সার দেওয়া ঘর। হাঁটতে হাঁটতে সে ঠিক করবে কোন ঘরটায় ঢুকবে। ঘরে ঘরে আলাদা আলাদা ঘটনা। আজও তো ঘটেছে অনেক কিছু। সেগুলোও নিশ্চয় কোন ঘরে জমা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোন এক রাতে সেখানে সে ঢুকবে।

রোহিণী খবরের কাগজটা মেঝেয় ফেলে দিল। বেড সুইচ টিপে আলো নেভাল। জানলা দিয়ে বাইরের আলো এসে আবছা করেছে সিলিং।

ছ' বছর আগের একটা ঘরের সামনে থমকে গিয়ে সে ভিতরে ঢুকল।

ওল্ড বালিগঞ্জে হিমালয়ান পেইন্টসের গেস্ট হাউসের বিশাল অ্যাপার্টমেন্টে জামাইবাবু ককটেলে ডেকেছিল জনা চল্লিশ গণ্যমান্যকে। দোতলায় নিচু পাঁচিলঘেরা ছাদে সবাই জমায়েত। এক দিকের দেয়ালে ছ'সাতটা চীনা লণ্ঠনের টিমটিমে আলো ছাদটাকে আধো-অন্ধকার করে রেখেছে। টবের গাছে জোনাকির মত হলুদ, নীল, টুনি জ্বলছে। উর্দিপরা বেয়ারারা কাবাব, চিজ, মাংসের সিঙাড়া, কাজুবাদাম আর সোডা, বরফ রাম ও স্কচ হুইস্কির গ্লাস সাজানো ট্রে হাতে ঘুরছিল। হিমালয়ান পেইন্টসের কলকাতা অফিসের নানান স্তরের কর্তারা ছাড়াও ছিল সাংবাদিক, কবি, ছবির সমালোচক, ফিল্ম পরিচালক, ছবি আঁকিয়ে, ব্যবসায়ী এবং আরও কিছু লোক।

শোভনেশের ছবির প্রদর্শনীর সফল সমাপ্তির জন্য তার স্পনসরের দেওয়া পার্টি।

রঞ্জন আর সোহিনী অতিথিদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, যাদের কাউকেই প্রায় তারা চেনে না, হেসে হেসে, বহুকালের পরিচিত এমন মুখ করে আলাপ করে যাচ্ছিল। এক দিকের পাঁচিলের ধারে আলো কম, ছায়া ছায়া একটা কোণে রোহিণী একা দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে ছিল টোম্যাটো জুসের গ্লাস।

সকালেই মেধাকে শান্তিনিকেতন দেখার জন্য দিদি সেখানে তার এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দুদিন থেকে আসবে। মদ টদ খেয়ে অনেকেই বেসামাল হয়ে বিশ্রী পরিস্থিতি তৈরি করে। যদিও সেসব ঝঞ্ঝাট সামলানোর জন্য লোক মজুত থাকে, তবু দিদি একদমই চায় না ছোট ছেলেমেয়েরা এই ধরনের পার্টিতে থাকুক।

'একা কেন ?'

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল শোভনেশ। রোহিণী একটু অপ্রতিভ হয়। যার জন্য

আজকের অনুষ্ঠান, সেই লোকটি একধারে একা-দাঁড়ানো— হোস্টের শালী ছাড়া পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই— এমন একজনকে আলাপ করার জন্য বেছে নেওয়ায় সে কৃতার্থ বোধ করে। প্রদর্শনীতে ছবিটা তার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা মনে তখনো টাটকা।

'কাউকেই চিনি না জানি না, এই বেশ আছি।' রোহিণী দুর্বল স্বরে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলে।

'সে কি! বিখ্যাত বিখ্যাত লোক সব এরা। চলুন আলাপ করিয়ে দিই।' এই বলে রোহিণীর বাম বাহু মুঠোয় ধরে আকর্ষণ করে শোভনেশ।

'না না।' রোহিণী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 'আমার দরকার নেই আলাপ করে। হোস্টের শালী এই পরিচয়ে এঁদের সঙ্গে কথা বলে খুব স্বস্তি পাব না।'

শোভনেশের আঙুলগুলো জড়িয়ে রয়েছে তার বাহু। হয়তো ইচ্ছে করেই, কিন্তু রোহিণীর মনে হল ইচ্ছে করে নয়। পার্টি এখন প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়ে ওঠার পথে। ছোট ছোট জটলায় ভাগ হয়ে গেছে এক এক ধরনের মানসিকতার গণ্ডি। শুরুতে মৃদু নম্র কণ্ঠে যারা কথা বলছিল এখন তাদের গলা চড়ছে। বিলম্ব করে যারা গ্লাস মুখে তুলছিল, এখন তারা একটু ব্যস্ত হয়ে ট্রে থেকে ভরা গ্লাস তুলে খালি গ্লাস রাখছে।

'আপনার দেবার মত পরিচয় নিশ্চয় আছে, আর সেটা মুখে বলার দরকার হয় না। আপনি আপাদমস্তক একটি মেয়ে, এটাই সেরা পরিচয়।'

জবাব না দিয়ে রোহিণী স্মিতমুখে চুমুক দিল রসে। 'আপনি কি খাচ্ছেন?' শোভনেশ জানতে চায়। 'টোমাটোর রস বোধহয়! কোন মানে হয়?'

রোহিণী বুঝে ওঠার আগেই শোভনেশ তার গ্লাস থেকে খানিকটা হুইস্কি রসের মধ্যে ঢেলে দিল।

'আগে কখনো খাননি তো?'

'না।' বিমূঢ় হয়ে গেছিল রোহিণী।

'তাহলে আমার অনুরোধে আজ খাবেন।

শোভনেশের স্বরে খানিকটা আবদার, খানিকটা অনুরোধ, খানিকটা হুকুম, ঘনভুরুর ছাউনির নিচে জ্বলজ্বলে চোখ, সাদা অসমান দাঁত এবং দীর্ঘ দেহটিকে সামনে ঝুঁকিয়ে ঝোড়ো চুলের মাথাটা তার মুখের কাছে রাখা। রোহিণীর আপত্তি অসাড় হয়ে গেছিল। সে গ্লাস তুলে চুমুক দেয়। একটু তেতো স্বাদ ছাড়া সেই রসের আর কিছু বদলায়নি।

'ভাল মেয়ে।' শোভনেশ তারিফ জানায় আর রোহিণীর মাথায় আলতো টোকা মারে, বন্ধুর মত। 'এইবার চোঁ চোঁ করে শেষ করে দিন।'

রোহিণী তাই করেছিল বলামাত্র। 'আর একটা আপনার জন্য আনি, ধরুন এটা।' শোভনেশ তার গ্লাসটা রোহিণীর হাতে গচ্ছিত রেখে চলে গেল এবং ফিরে এল দুটো গ্লাস হাতে। টোম্যাটোর রস আর নিজের জন্য হুইস্কি।

'দিন গ্লাসটা আর এটা ধরুন।'

হুইস্কির গ্লাস তার সামনে এগিয়ে ধরা। সভয়ে রোহিণী প্রথমেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দিদিকে খুঁজল। একবার যদি দেখতে পায়, তাহলে এই বয়সেও তাকে চড় খেতে হবে। তার হাতে ধরা শোভনেশের আধ-খাওয়া গ্লাসটা ছাদের পাঁচিলে রেখে চাপা স্বরে সে বলল, 'না, সরিয়ে নিন।'

'আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখুন।' গ্লাসে খানিকটা টম্যাটোর রস ঢেলে লাল করে দিয়ে

শোভনেশ বলল, "ককটেল ! কেউ আর বুঝতে পারবে না।'

'না।'

কয়েক টন ওজনের দৃঢ়তা একটি শব্দের মধ্যে বোঝাই করে রোহিণী কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকে। দিদির ভয়ে নয়। কেউ তাকে বাধ্য করবে, তা যতই মজা করে বলুক না কেন, এটা সে মন থেকে মানতে পারে না। তার ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে কেউ যদি ধরে নেয়, যা বলব তাই সে মানবে, তাহলে ভুল করবে।

শোভনেশও তাকিয়ে থেকেছিল তার চোখের দিকে, অবাক্ হয়ে। প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড এইভাবে ওরা ছিল। রোহিণী তার অপলক কাঠিন্য নরম করেনি। শোভনেশের চাহনিতে কিন্তু ক্রমশ প্রীতিভরা তারিফ ফুটে ওঠে। কথা না বলে সে প্রায় ছুটে গিয়ে আর একটা টোম্যাটো রস নিয়ে এসে এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বলে, 'নাও।'

রোহিণীর গ্লাসধরা মুঠিটা শোভনেশ চেপে ধরে রেখেছিল কিছুক্ষণ। 'নিন' না বলে 'নাও', রোহিণীর কাছে সম্বোধনের এই বদলটা এড়াল না। ধীরে ধীরে তার চোখ নরম হয়ে আসে। ঠোঁটে হাসি ফোটে।

'একটু ঢেলে দিন।' সে গ্লাস এগিয়ে দেয়। শোভনেশ মাথা নাড়ে অসম্মতি জানিয়ে, বলে, 'তোমার ছবি আমি আঁকব !'

শোভনেশ পিঠে হাত রাখল। রোহিণীর তখন মনে হয় নাতিগরম সেঁকের মত হালকা চাঞ্চল্যকর একটা অনুভব তার শরীর স্পর্শ করেছে। হাতটা পিঠ থেকে নিচে নামছে তার দেহের কোমল বর্তুলতা জরিপ করতে করতে। শোভনেশের লম্বা হাত যতদূর নিচে নামতে পারে ততটাই পৌঁছে নিতম্বের উপর সফর করে আবার একই ভাবে ঘাড় পর্যন্ত উঠে এল।

রোহিণী প্রথমে এত অবাক হয়ে পড়ে যে, হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেবে, বা নিজেকে সরিয়ে নেবে, দুটোর কোনটাই করতে পারল না। বাবা মারা যাবার পর তার দেহে এমন নিশ্চিন্তে কোন পুরুষ হাত দেয়নি। বিক্ষুব্ধ কোন প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে ঘটল না। মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত বোধ থেকেই সে বুঝেছে হাতটা নোংরা নয়। তার দেহকে এই হাত অসম্মান করছে না।

'অ্যাভারেজ বাঙালি মেয়ের তুলনায় তুমি অনেক লম্বা। কত হাইট ?'

'পাঁচ-আট।'

'মাই গড ! ওজন ?'

'মাস ছয়েক নিইনি। আটান্ন থেকে ষাট কেজির মধ্যে বোধহয়।'

'ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে কৌতূহল যদিও খুব প্রবল, তবু প্রশ্ন করব না। অনুমান করে নিয়েছি।'

'এবার কিন্তু আমার হাত থেকে গ্লাস পড়ে যাবে।'

'গ্লাস তো ছবি নয় !'

'দুটোতেই কাচ আছে, দুটোই ভঙ্গুর।'

'কিন্তু ভঙ্গুরতার মধ্যেই তো আনন্দ রয়েছে। হুইস্কি বা টোম্যাটোর রস বা নিসর্গচিত্র কোনটাই অদরকারী নয়। তুমি কোনটা বেছে নেবে ?'

'ছবিটাকে মানে নিসর্গচিত্রকে, আপনি কোনটা বাছবেন ?'

'তোমাকে।'

'আপনি বোধহয় একটু বেশি খেয়ে ফেলেছেন।'

ঠিক এই সময়ই বেঁটে এবং ভীষণ মোটা একটি লোক, রোহিণী যাকে ছবির প্রদর্শনীতে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিল, তাদের দিকে এগিয়ে এল। বরং বলা যায়, গড়িয়ে এল। পরনে খয়েরি স্যুট, হাতে গ্লাস।

'ওরে ব্যাটা, তুই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফুসুর ফুসুর চালাচ্ছিস আর—।' লোকটি থেমে গেল। ফ্যালফ্যাল চোখে রোহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ তো আমার থেকেও লম্বা !'

'আমার কলেজ-দিনের বন্ধু গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি, প্রেস আছে, দু-তিনটে ম্যাগাজিন আছে। গঙ্গা কী নাম রে সেগুলোর ?'

গঙ্গাপ্রসাদ স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারছিল না। জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। চোখ বিস্ফারিত।

'নাম দিয়ে কি হবে য়্যা, যে নামেই ডাক না কেন গোলাপকে—এই তো ইনি, এনার নাম কি আমি জানতে চেয়েছি ?'

'আমার নাম রোহিণী।'

'গঙ্গা, আমি এর ছবি আঁকব।'

'সে কি রে শোভু ! তোর যে একজন কে আছে, যাকে ন্যাংটো করে শুইয়ে বসিয়ে ছবি আঁকিস, আবার এঁকে কেন ?'

রোহিণী এই প্রথম শোভনেশকে বিব্রত এবং বিরক্ত হতে দেখল। কথাব বিষয়টা এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি শোভনেশ বলল, 'বেশি খেয়ে ফেলেছিস গঙ্গা, এবার বাড়ি যা। বরুণা আজ ঝাঁটার শক্তিপরীক্ষা করবে তোর পিঠে।'

'সেইজন্যই তো তোর কাছে এলুম। বাড়ি পৌঁছে দিবি চল, নিচে গাড়ি রয়েছে। বরুণাকে তুই ফেস করবি। যা যা বানিয়ে বলার বলবি। এনার সঙ্গে··· হ্যাঁ ভাই, কি যেন নাম বললে ?'

'রোহিণী।'

'রোহিণী—নক্ষত্র, চন্দ্রপত্নী তাই তো ? আপনার সঙ্গে—তোমার সঙ্গে, অনেক ছোট তো, তুমিই বলি—পরে আলাপ করব, এই নাও আমার কার্ড, ঠিকানা ফোন নম্বব সব পাবে।'

কোটের পকেট হাতড়ে গঙ্গাপ্রসাদ কার্ড বার করে রোহিণীকে দিল। ওকে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য শোভনেশ ওর দুটো কাঁধ শক্ত করে ধরল।

'লাগছে লাগছে ছাড়, ওরে বাবা আমি ঠিক আছি। আমার বডি, সোল, মেমারি, ইন্টালিজেন্স সব ঠিক আছে। এই রোহিণীর হাত থেকেই তো সেদিন ছবিটা পড়ে ভাঙল। কি, ঠিক বলেছি ? মেমারি। তুই বললি ছবিটা ওকে প্রেজেন্ট করবি, আজও করিসনি। কি, ঠিক আছে মেমারি ?'

অপ্রতিভ শোভনেশ তখন গঙ্গাপ্রসাদকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'চল এবার, অনেক হয়েছে। গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।'

'অনেক মোটেই হয়নি। ছবিটা ওকে কবে দিবি বল ? আমি গিয়ে দিয়ে আসব। রোহিণী তোমার বাড়ির ঠিকানাটা দাও, আমি গিয়ে দিয়ে আসব।'

'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?' রোহিণী বিব্রত অথচ হাসিমুখ করে বলে। গঙ্গাপ্রসাদকে তার মজার লোক মনে হচ্ছে।

'ব্যস্ত হব না ? য়্যাঁ, ব্যস্ত হব না ? শোভু বলল, হোয়াট আ বডি ! ছবিটাকে কত গভীর

ভাবে দেখছে দ্যাখ। বাহ্যজ্ঞান রহিত একেই বলে। ছবি এদের হাতেই তুলে দিতে ইচ্ছে করে, আমি বললুম, দিয়ে দে প্রেজেন্ট করে। মনে থাকে যেন, আমি বললুম। ও বলল, কিছু মনে করবে না তো ? বললুম, হ্যাঁ রে কি বললুম বল তো ?' গঙ্গাপ্রসাদ তেরচা চাহনিতে তাকাল শোভনেশের দিকে।

'আপনার মেমারি বোধহয়—'। রোহিণী হাসি চেপে মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে কথাটা বলতেই গঙ্গাপ্রসাদ আড়ষ্ট হয়ে গেল। দুলুনি বন্ধ করল। মনে হল, খোলসের মত শরীর থেকে অপ্রকৃতিস্থ ভাবটা খসিয়ে দিচ্ছে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সে বলল, "রোহিণী তুমি কি কোথাও চাকরি কর ? বিয়ে হয়েছে ?"

'বিয়ে হয়নি আর একটা প্রাইভেট ফার্মে রিসেপশনিস্ট রয়েছি।'

'কোথায় ?'

'এই কলকাতাতেই।'

'বলবে না ? ঠিক আছে। জেনে রাখ, ঠিকানা বার করে তোমার বাড়িতে গিয়ে ওই ছবি দিয়ে আসব।'

'পারবেন বাড়ির ঠিকানা বার করতে ?'

'আমার নাম গঙ্গা ব্যানার্জি। এই চল্লিশ লাখের শহরে একটা আলপিন হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করে দিতে পারব, আর এ তো একটা আস্ত মানুষ। রিসেপশনিস্টকে খুঁজে বার করা কি খুব শক্ত, এই রকম ফিগার যার ? ছোটখাট ফার্মে নিশ্চয় তুমি নেই ?'

রোহিণী শুধু স্মিত হাসিতে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছিল গঙ্গাপ্রসাদকে তারপর শোভনেশ টেনে নিচে নিয়ে যায়।

দিন দশেক পর রবিবার সকালে মা জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'রুনু, দ্যাখ তো গাড়ি করে কারা এল ?'

রোহিণী জানলায় এসে দেখে, মোটর থেকে গঙ্গাপ্রসাদ নামছে, হাতে কাগজে মোড়া জিনিসটি বোধহয় সেই ছবিটাই, গাড়ির মধ্যে বসে আছে শোভনেশ।

দরজা খুলে সত্যি সত্যিই বিস্মিত চোখে সে গঙ্গাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'কি বলেছিলুম ? কলকাতা শহরে তোমাকে খুঁজে বার করব ঠিক করলে, সেটা কারুর পক্ষেই এমন কিছু শক্ত কাজ হবে না।'

খাটে দুই হাঁটুতে মাথা রেখে অন্ধকারে রোহিণী বসে। স্মৃতির ঘর থেকে বেরিয়ে সে সুড়ঙ্গটায় এখন দাঁড়িয়ে। পা টিপে টিপে ছ'বছর আগের অতীত থেকে সে বেরিয়ে আসছে।

গঙ্গাদা আজ সকালে বললেন, 'তাহলে তো ভয় পাওয়ার কথা নয়। এই তিরিশ চল্লিশ লাখ লোকের শহরে একজনকে খুঁজে বার করা কি সহজ ব্যাপার ?'

আসলে বেশির ভাগ সাফল্যই হয়ে যাওয়ার ব্যাপার ! সেদিন গঙ্গাদা তাদের বাড়িতে এসেছিলেন অনেকটা এইভাবেই। ঠিকানাটা পেয়ে গেছিলেন। হিমালয়ান পেইন্টসের কলকাতা অফিসে খোঁজ নিয়েছিলেন, রঞ্জন যোগলেকরের শ্বশুরবাড়িটা কোথায় ? তার শালী কোথায় চাকরি করে ? খুব সহজেই শুধু একটা টেলিফোনেই কাজটা হয়ে যায়। সুভাষ গায়েনের সঙ্গে দেখা, এটাও সেই হয়ে যাওয়ারই ব্যাপার। এমনকি, সি আই টি রোডটার নাম যে আচার্য সত্যেন বোস সরণি-- এটা জানাও তো ওইভাবেই।

এখন ইচ্ছে করলে যে কেউই তার ঠিকানা বার করে ফেলতে পারে ! তাহলে তার

নিরাপত্তাটা কোথায় ?

রোহিণী অন্ধকার ঘরে পায়চারি শুরু করল। তার পায়ের শব্দে নিচের ফ্ল্যাটের লোকেরা, যদি ঘুমিয়ে না পড়ে থাকে, কি ভাববে ? যা খুশি ভাবুক, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

নিরাপত্তার কথা এবার ভাবতেই হবে, কিন্তু সেটা শোভনেশের ভয়ে নয়। বয়স, মেয়েদের যেটা সব থেকে বড় ঘাতক, একদিন তো দেখা দেবেই। ইদানিং মাঝে মাঝেই তার মনে হয়েছে, কতকাল সে একা এইভাবে চলতে পারবে ? বয়স ক্রমশ বাড়বে। ধীরে ধীরে প্রৌঢ়ত্ব আসবে, তারপর বার্ধক্য, সে বুড়ি হবে ! রোহিণী অবাক হতে হতেও ভয় পেল। তখন কে তাকে খাওয়াবে ? এই ফ্ল্যাটে কতকাল আর গঙ্গাদা তাকে থাকতে দেবেন ? কত বছর আর সে চাকরি করতে পারবে ? ভাবতে ভাবতে রোহিণীর বুকের মধ্যে কনকনে একটা যন্ত্রণা উঠল। সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তাহলে আর রাজেনকে অপেক্ষায় রাখা ঠিক হবে না। এই শরীর সজীব তীক্ষ্ণ সটান থাকতে থাকতেই নিরাপদ জায়গায় একে সরিয়ে রাখতে হবে। আজ ইডেনে বসে রাজেনকে সে যখন বলেছিল, 'ধরে নিচ্ছি আমার কিছু ফিজিক্যাল অ্যাসেট আছে, কিন্তু কতদিন আর সেটা থাকবে ? পদ্মপাতায় জলের মতই তো মেয়েদের যৌবন।' তখন সে দু'জনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানটার কথা ভেবেই বলেছিল। পুরুষের লোভ তো মেয়েদের যৌবনের দিকেই। বৌয়ের যৌবন ধসে পড়লে স্বামীরা ওপরের তুষার দত্তর মত হয়ে যায়। রাজেনও হতে পারে, এইরকম আভাসই সে ওকে দিয়েছে।

কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, বয়সটাকে বাধা হিসাবে দেখার কোন যুক্তি নেই। তার থেকে কম বয়সী লক্ষ লক্ষ বাঙালি মেয়ের থেকেও সে বেশি দিন যৌবন ধরে রাখতে পারবে, এই প্রত্যয় তার আছে ! রাজেনকে তার ভাল লাগে বললে কম বলা হবে, ওর সান্নিধ্য সে প্রার্থনা করে। রাজেনের ক্ষমতা আছে মন প্রসন্ন করে তোলার। স্ত্রী হিসাবে নিজেকে ভাবলে, ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার চিন্তায় তার মনে আড়ষ্টতা আসে না, যেটা শোভনেশের সঙ্গে আসত।

রাজেনের শরীরে জোর আছে, পুরুষালি দেখতে, ভাল মাইনের চাকরি, শিক্ষিত তো বটেই। বনেদি বাড়ির ছেলে, সেটা চালচলনে বোঝা যায়। সব থেকে বড় কথা, সব কিছু জেনেই সে বিয়ে করতে চেয়েছে। কাল কি ওকে বলব রাতে খাবার জন্য ? অনেক দিন সে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে, তিনতলায় উঠে দরজা পর্যন্তও এসেছে, কিন্তু ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢোকেনি। রোহিণী তাকে একটু বসতে, এক কাপ চা খেয়ে যেতে অনুরোধ করেছে। রাজেন রাজি হয়নি। অদ্ভুত সংযমী প্রেমিক ! 'যতদিন না তুমি বৌ হতে রাজি হচ্ছ, আমি ভেতরে যাব না।' ছেলেমানুষের মত অভিমান দেখিয়েছে। অথচ আমার হাতের রান্না খেতে চায় !

রোহিণী বালিশে মুখ চেপে হেসে ফেলল। রান্না খেতে গেলে যে ফ্ল্যাটে ঢুকতে হবে, বলার সময় সেই খেয়াল ওর ছিল না। কাল দুপুরে টেলিফোন করবে অফিসে। প্রথমেই ওকে এটা মনে করিয়ে দিতে হবে।

কাজের মেয়েটা পালিয়েছে, নিজেকেই কাল দোকান আর বাজার বয়ে আনতে হবে। কি রাঁধবে ? নুডলসের কিছু ? ভাতের কি ময়দার সঙ্গে খাওয়া যায় মাছের কি চিকেনের কোন প্রিপারেশন ? মহারানীতে "খাবার-দাবার" বিভাগটা দেখে উৎপল। মেয়েদের নাম দিয়ে ও নাকি নিজেই লেখে। উৎপলের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

তার ঘুম আসছে এবার। শরীর আলগা হচ্ছে, চোখের পাতা ভারী হচ্ছে। উপরের ফ্ল্যাটে ঘড়ির কুক্কুটা দু'বার ডেকে উঠল। রোহিণী ঘুমিয়ে পড়ার আগে আগামীকালের জন্য করণীয় কাজগুলো পর পর মনে করতে চাইল। বাজার যাওয়া, অফিসে গঙ্গাদার কাছ থেকে জেনে নেওয়া, উনি পুলিশের কাছ থেকে যা জেনেছেন। রাজেনকে আর অপেক্ষা করানো নয়। এবং সব শেষে নিজেকে বলল, রোহিণী, ভয় পাচ্ছ কেন? এমন কিছু অসাধারণ নও যে, জীবন নিয়ে তোমাকে গোলমালে পড়তে হবে! লক্ষ লক্ষের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দাও, তাহলে কেউ আর তোমায় খুঁজে পাবে না।

॥ পাঁচ ॥

কলিং বেল বাজছে।

রোহিণী চোখ খুলল। হাত বাড়িয়ে টেবল থেকে হাতঘড়িটা তুলে চোখের কাছে আনল। ছ'টা দশ! প্রায় লাফ দিয়ে খাট থেকে সে নামল। এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় থাকা জীবনে পাঁচ-ছ'বারের বেশি ঘটেনি। নিজের দিকে ঘাড় হেঁট করে তাকিয়ে সে গায়ের ম্যাক্সিটা নাড়িয়ে নিল। ভিতরে কিছু পরা নেই।

আবার বেল।

দরজার দিকে যেতে যেতে অপাঙ্গে আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে রোহিণী চুল ঠিক করতে করতে আই-হোলে চোখ রাখল। কি আশ্চর্য, অফিসের বেয়ারা কমল, অর্থাৎ কমলদা! এত সকালে? ছ্যাঁত করে উঠল তার বুকের মধ্যে! কারুর কিছু হয়নি তো? ম্যাক্সির গলার কাছটা টেনেটুনে যতটা সম্ভব খোলা জায়গাটা ঢেকে সে লক ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

"আরে কমলদা, আপনি?"

রোহিণী আর কিছু বলার আগেই কমল মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "দিদি, কাল একটা ভুল হয়ে গেছে। ঠিক ভুল নয়, গলদই বলতে পারেন। আপনাকে দেবার জন্য প্রশান্তবাবু একটা চিঠি দিয়েছিলেন, খুব জরুরী চিঠি। রাত্রেই আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি আসতে পারিনি।" খামটা সে রোহিণীর হাতে দিল।

"ভেতরে আসুন।"

রোহিণীর পিছনে কমল ভিতরে এল। দু'জনে ডাইনিং টেবলে বসল। চিঠিটা পড়তে পড়তে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কমল সেটা লক্ষ করে বলল, "লেখাটা যে কি করে হারাল, কেউ বলতে পারল না। অথচ পরশু আমার হাতেই দুপুরে দিয়ে গেল, আমিও সেটা উৎপলবাবুর টেবিলে রাখলাম। কাল প্রেসে পাঠাতে গিয়ে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সারা অফিস তন্ন তন্ন করে সন্ধে পর্যন্ত খোঁজা হল। আজ সকাল এগারোটার মধ্যে প্রেসে পৌঁছে দিতেই হবে। প্রশান্তবাবু চিঠি লিখে আমাকে বললেন, তুমি তো মানিকতলার দিকে চালতাবাগানে থাক, তোমার অসুবিধে হবে না যেতে। সোজা আগে সল্ট লেকে গিয়ে এখুনি এটা রোহিণী দিদিকে দিয়ে তারপর বাড়ি যেও। উনি যেন রাতেই লিখে রেখে দেন। তুমি সকালে ওর কাছ থেকে লেখাটা নিয়ে বেলেঘাটায় প্রেসে দিয়ে আসবে। কিন্তু আমি কাল আর আসতে পারিনি।"

করুণ মুখে কমল তাকিয়ে রইল। রোহিণী আবার চিঠিটা পড়ল। বিব্রত কণ্ঠে এবং চাপা বিরক্তি নিয়ে সে বলল, "কিন্তু আমি গ্রহ নক্ষত্র রাশিফলের কি জানি? আমাকে এ সব লিখতে বলা কেন? আমার তো সকালে কাজ রয়েছে। রাতে একজনকে খেতে

বলেছি, এখন আমি বাজার যাব।"

"প্রশান্তবাবুকে উৎপলবাবুই বললেন, রোহিণী রাশিফল রেগুলার পড়ে না, মাথাও ঘামায় না, ওকেই লিখে দিতে বলুন। মহারানীর পুরনো তিন-চারটে সংখ্যা আর ইংরিজি বাংলা ম্যাগাজিনের থেকে এটা ওটা নিয়ে আধ ঘণ্টাতেই নামিয়ে দিতে পারবে।"

"উৎপলবাবু নিজেই তো অফিসে বসে করে দিতে পারতেন, 'খাবার-দাবার' তো উনি এইভাবেই লেখেন।" রোহিণী একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল। সে শুনেছে, উৎপল প্রায়ই ক্ষোভ জানায় এই বলে যে, রোহিণীকে দিয়ে কোন কাজই করানো হয় না, শুধু গ্ল্যামারাস কভারেজ ছাড়া। 'গঙ্গাবাবুর স্নেহের ধারাটা শুধু এক দিকেই প্রবাহিত হয়।' কথাটা প্রথম শুনে রোহিণীর মাথা গরম হয়ে গেছিল। গঙ্গাদাকে সে কিছু বলেনি, তবে নিজের থেকেই সে সম্পাদক প্রশান্ত হালদারের কাছে কাজ চেয়ে নেয়। 'বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে', এই ধারণাটা অফিসে চাউর হয়ে গেছে। বোধ হয় উৎপলেরই কাজ।

"দিদি, কাল আমার মেজ ছেলে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময় বাসের ধাক্কা লাগে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। ওকে দেখতে গিয়েছিলাম, বড্ড রাত হয়ে গেল তাই আর আসতে পারিনি।"

"সে কি! কখন হল? ছেলের বয়স কত?" রোহিণী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। হাত পা শক্ত হয়ে গেছে।

"এই তো চব্বিশে পড়ল গত পৌষে। ইংরিজিতে এম এ পড়ছে। অফিস থেকে বেরোচ্ছি, তখন হন্তদন্ত হয়ে মেয়ে এসে খবরটা দিল। দুপুরেই হয়েছে। খুব সিরিয়াস নয়, তিনটে পাঁজর ভেঙেছে। অপারেশন হয়েছে, ভালই আছে। আপনি লিখে ফেলুন, ততক্ষণে আমি আপনার বাজার করে আনি।"

"না না, সে কি কথা। আমি লিখে ফেলছি। আপনি বসুন, চা করি।"

কমল নাছোড়বান্দা। বার বার বলতে লাগল, "ছেলে ভাল আছে, তার জন্য কোন দুশ্চিন্তা এখন আর নেই। থলেটা দিন আর কি কি আনতে হবে বলুন, বাসে করে মানিকতলা গিয়ে বাজার করে এনে দিচ্ছি। বড়জোর এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।"

মায়া হল রোহিণীর। রোগা, দুব্‌লা, কাঁচাপাকা দাড়ি ভরা মুখ। আধ ময়লা ধুতি আর ফিকে নীল হাফ শার্ট। অফিসের জরুরী কাজটা করতে না পারার জন্য যেন মরমে মরে আছে। তার জন্যই রোহিণীদির বাজার করা হবে না, এটা যেন আরো বেশি ওকে অপরাধী করে তুলেছে। এখন যেন হাল্কা হবে দিদির জন্য কিছু একটা উপকার করে দিতে পারলে।

"আচ্ছা, থলি দিচ্ছি।"

রোহিণী ডিক্সনারির মধ্য থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল। চর্ব্য-চোষ্য রাঁধার সময় নেই, সময় থাকলেও উপায় নেই, উপায় থাকলেও চীনে বা মোগলাই তিন-চারটের বেশি সে জানে না। ছিমছাম হলেই হবে। রাজেন তো ভোজ খেতে চায়নি, শুধু তার হাতের রান্না খেতে চেয়েছে।

"কমলদা, মাছ আনবেন। ভাজা খাওয়া যায় এমন, ভেটকি, বাগদা কি পার্শে কি তপসে। ফাইন সরু চাল এক কিলো, কড়াপাকের সন্দেশ দশ টাকার, দই আড়াই শো। একজনকে খেতে বলেছি, খুব হাল্কা রান্না করব। বুঝতেই পারছেন এক হাতে বেশি তো করে উঠতে পারব না।"

কমল থলি নিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "পৌনে আটটার মধ্যেই আসছি।"

রোহিণী চিঠিটা চোখের সামনে ধরে দ্রুত ভেবে নিল। উৎপল তাকে মুশকিলে ফেলার জন্য রাশিফল তৈরি করার ঝামেলাটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, দেখিয়ে দেব ঝঞ্ঝাটে কাজ পারি কিনা। মহারানীর পুরনো সংখ্যা দেখে লাভ নেই। ধরা নাও পড়তে পারে, কিন্তু উৎপল যে বেনামা চিঠি সম্পাদককে লিখে তাকে অপদার্থ প্রমাণ করবে না তারও গ্যারান্টি নেই। ভাল করে টুকতেও জানে না, ভাষাটাসা বদলে, এটা ওখানে সেটা এখানে করে লেখা দাঁড় করাতেও শেখেনি—এই সব কথা যেন না শুনতে হয়।

সব থেকে ভাল হয় ইংরিজি ম্যাগাজিন থেকে টুকলে। মহারানী যারা পড়ে, তারা ইংরিজি অতশত বোঝে না, পড়ে না। কিন্তু তার কাছে যে সব ম্যাগাজিন আছে, তাতে তো রাশিফল থাকে না। তাহলে? আগে বাথরুম আর দাঁত মাজাটা তো সেরে নিই। ব্যায়াম করার জন্য আজ আর সময় দেওয়া যাবে না। দু হাত তুলে শরীরটা টেনে, দুপাশে বাঁকিয়ে আর হাঁটুতে নাক ঠেকিয়ে নমো নমো করে কাজটা সে সেরে নিল।

চায়ের জল বার্নারে চড়িয়ে রোহিণী দাঁত মাজতে মাজতে দরজা খুলে বারান্দায় এল। শুকিয়ে গেছে সায়া, ব্রা। এবার এ দুটো পরা দরকার। মুখ ধুয়ে চা বানিয়ে খেতে খেতে সে মনে করার চেষ্টা করল এই বাড়িতে, চটুল ধরনের কিন্তু গাম্ভীর্যের মুখোসপরানো ইংরিজি ম্যাগাজিন কারা রাখতে পারে? সাতটি ফ্ল্যাটের থেকে ছাঁটাই করতে করতে অবশেষে দোতলার প্রৌঢ়া বিধবার ফ্ল্যাটটিকে সে অনুমানে প্রথম স্থান দিল।

বিধবার জন্য নয়, তাঁর যুবক বোনপো আর তার বৌয়ের হাবভাবের, পোশাক-আশাকের কথা ভেবেই। টেপ ডেক আছে, প্রায় রাতেই পপ্ গান বাজায়। ঘরের মধ্যে হয়তো নাচে টাচেও। একটা সাদা মারুতি আছে। ভোরে দুজনে জগ করতে বেরোয়। বোধহয় কোন মাল্টি ন্যাশনালে রাজেনের মতই ম্যানেজমেন্টের জুনিয়র স্তরের একজিকিউটিভ। রাজেন ঠাট্টা করে এদের সম্পর্কেই বলে, 'আওয়ার হোম-গ্রৌন ইউপ্পিস, ইয়াং আরবান প্রফেশ্যনালস অর্থাৎ এককথায় আপস্টার্ট, সোজা বাংলায় উঠাই-গিরাই।' আপাতত, রাশিফল আছে এমন ইংরিজি ম্যাগাজিন যদি রাখে, তাহলে ওরা ইউপ্পি, উড়িপি, যা খুশি হোক, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

ম্যাক্সি থেকে শাড়ি, চুলে ঝমাঝম চিরুনি, তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই রোহিণী দোতলায় পিতলের পাতে 'দস্তরায়' লেখা দরজার কলিং বেলের বোতামে আঙুল রাখল।

দরজা খুলল বৌটিই। বয়স বাইশ-তেইশ, শীর্ণ দেহটি সোয়েট স্যুটে মোড়া। বোধহয় জগিং সেরে কিছুক্ষণ হল ফিরেছে। কোমর পর্যন্ত খোলা চুল, লম্বাটে মুখ, গালে ব্রণর দাগ, সিঁথেয় অস্পষ্ট সিঁদুর, লম্বা নখে রঙ এবং চোখে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে বিগলিত হাসি ফুটল। মেয়েটির মুখ তাতে মিষ্টি দেখাল।

রোহিণীর দ্বিতীয় একটা গলার স্বর আছে। খসখসে, চাপা, অনেকটা সর্দিধরা স্বরের মত। শুনলে গা সিরসির করে। এই স্বরটা সে লোক বুঝে, খুব আধুনিক, উচ্চ মহলে বিতরণ করে, সফিস্টিকেটেড, ইংরাজিতে কথা বলে গদগদ্ হয় এমন মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় ব্যবহার করে। রাজেনের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় ব্যবহার করেছিল, পরে আর করেনি। ঠাট্টা করে রাজেন অনেক দিন বলেছে, 'তোমার সেকেন্ড ভয়েসটা একটু বার কর তো, দারুণ সেক্সি লাগে।'

রাজেন যত ঠাট্টাই করুক, রোহিণী দেখেছে, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এই গলাটা ক্লাজ দিয়েছে। যেমন এখন সে দ্বিতীয় গলায় বলল, "ভাই খুব মুশকিলে পড়ে গেছি,

তোমাদের কাছে এমন কোন ইংলিশ ম্যাগ আছে, যাতে স্টারস অ্যান্ড প্ল্যানেটসের পোজিশ্যনকে বেস করে ফোরকাস্ট, মানে··· ইয়ে কি বলব··· ।"

"রাশিফল ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে ?"

"আমি তো অত লক্ষ করি না, আপনি ভিতরে আসুন, আমি দেখছি।"

রোহিণী ভিতরে ঢুকল। এই বাড়ির সব ফ্ল্যাটের নক্সাই একরকম। ঘরের মাঝে নিচু টেবলটার নিচে তাক থেকে বৌটি কতকগুলো ম্যাগাজিন বার করে রোহিণীর সামনে রাখল। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ওগুলোর উপর। সূচিপত্র দেখল, পাতা ওল্টাল, কিন্তু বাঞ্ছিত জিনিসটি পেল না।

"আচ্ছা, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখি, বাথরুমে রয়েছে। ওর এসবে কিওরোসিটি আছে।"

অতঃপর একটা ম্যাগাজিনের পাতা ধীরে ধীরে ওল্টাতে ওল্টাতে রোহিণী কান খাড়া করে রইল। বাথরুমের দরজা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে জানে ওটা কোথায়।

খট খট শব্দ এবং "এই শুনছ।"

বাথরুমের ভিতর থেকে হুসস্ ধরনের একটা শব্দ উঠল। তারপর চাপা স্বরে, "ওপরের সেই ভদ্রমহিলা এসেছেন।" এবার সংক্ষিপ্ত একটা খ্যাক ধরনের শব্দ বেরিয়ে এল। "আরে সেই তিনতলার, যার হিপ সোফিয়া লোরেনের মত সুইং করে বলেছিলে, সেই। ···না না বেরোতে হবে না। উনি এসেছেন একটা জিনিসের খোঁজে, তুমি কি বলতে পার···

রোহিণীর কান ততক্ষণে বন্ধ হয়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। হাতের ম্যাগাজিনটার খোলা পাতায় তার দৃষ্টি আটকে।

একটা প্রবন্ধ, যার শিরোনাম অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ; 'লালসার আগুনে ভস্মীভূত শিল্পীরা।' লেখক, সিধারথ্ সিন্‌হা। কয়েকটা ছবি, তার মধ্যে একটা শোভনেশের আঁকা নগ্ন নারীর। ভারতের চারজন নামী নাট্যকার-পরিচালক, ফিল্ম অভিনেতা, ক্ল্যাসিকাল গায়ক আর শোভনেশকে নিয়ে লেখাটা। বোধহয় উদাহরণ দেওয়ার জন্য এদের রাখা হয়েছে। তিনজনের ছবি রয়েছে শুধু শোভনেশেরই নেই। নিশ্চয় পায়নি, তাই নেই। বদলে ওরই আঁকা একটা ছবি ছেপেছে।

কি লিখেছে শোভনেশ সম্পর্কে, সেটা দেখার জন্য যখন রোহিণীর দৃষ্টি প্রবন্ধের উপর দিয়ে ওঠানামা করছে, তখন বৌটি ঘরে ঢুকল। এক কোণে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ইংরাজি খবরের কাগজ। তার থেকে ঘেঁটে একটা খুদে আকারের আট পাতার ট্যাবলয়েড বার করে আনল।

"এই যে আপনি যা চাইছিলেন।" বৌটির মুখ সাফল্যের গর্বে উদ্ভাসিত। "দারুণ মেমারি ওর, ঠিক বলে দিল।"

"আচ্ছা, আমি যদি এটা একটু পড়ার জন্য নিয়ে যাই, তোমাদের কি অসুবিধে হবে ?" রোহিণী ম্যাগাজিনটা দেখিয়ে গড়গড়িয়ে এবং তার নিজস্ব গলায় বলল। তার মানসিক স্থৈর্য আর পরিপাটি নেই।

"না না, আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের তো দেখা হয়ে গেছে।"

রোহিণী দুটি পত্রিকাই হাতে নিয়ে বেরোবার সময় নিজেকে গুছিয়ে ফেলে আবার তার মন্থর দ্বিতীয় গলার স্বরে ফিরে এল। "তুমি অনেক ছোট, তাই আর আপনি-টাপনি

বললাম না। কত দিন বিয়ে হয়েছে ?”

“সাত মাস।”

“তাহলে তো এখন অনেকদিন ছুটিতে থাকবে।” রোহিণীর অর্থপূর্ণ হাসির ইঙ্গিতের প্রতিবিম্ব অন্যদিকেও ফুটল।

“নাম কি তোমার ?”

“কুন্তী।”

“আহ্‌হ্‌ হোয়াট আ বিউটিফুল নেইম ! পঞ্চপাণ্ডব পাব তো ? আচ্ছা চলি ভাই।”

ভাই বললে ওর দিদি না বলে উপায় নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রোহিণী আন্দাজে টের পেল, কুন্তী দরজা বন্ধ না করে তাকিয়ে রয়েছে। নিশ্চয় সোফিয়া লোরেনকে দেখছে !

নিজের ফ্ল্যাটে এসে, ম্যাগাজিনটা পড়ার প্রচণ্ড ইচ্ছাটা দমন করে রোহিণী কাগজ-কলম নিয়ে ডাইনিং টেবলে বসল। লেখালেখির কাজ সে এখানে বসেই করে। ভস্মীভূত শিল্পীরা অপেক্ষা করতে পারবে কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রদের এক্ষুনি প্রেসে পাঠাতে হবে। কমলের ফিরে আসার সময় হয়ে এল।

এয়ারঈজ, টর‍্যাস, জেমিনি, ক্যানসার, লিও···রোহিণী পর পর বারোটি রাশির বাংলা নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ইত্যাদি লিখে সে কাগজটার তারিখ দেখল। মাস দেড়েক আগের এক রবিবার। অদলবদল না করে হুবহু বাংলা করে দিলেও কেউ ধরতে পারবে না। মহারানীতে রাশি পিছু গড়ে পাঁচ ছ'লাইন করে বেরোয়। ইংরাজি কাগজটাতেও তাই রয়েছে।

শোভনেশের আগ্রহ ছিল জ্যোতিষে। বিয়ের আগে একবার সে রোহিণীর কররেখা দেখেছিল। মিনিট পাঁচেক নীরবে গভীর মনোযোগে দেখার পর বলেছিল, 'খুব জটিল নও। আবেগটা কম, অল্পে সন্তুষ্ট হও, বুদ্ধিচর্চার দিকেই ঝোঁক···' তাকে থামিয়ে রোহিণী বলেছিল, 'এসব বলার জন্য জ্যোতিষ জানার দরকার হয় না। আমিও বলে দিতে পারি হাত না দেখেই।' শোভনেশ বলেছিল, 'তাহলে কি জানতে চাও ?' রোহিণী হাল্কা স্বরে বলে, 'মেয়েরা যা জানতে চায়। বিয়ে থা', ছেলেপুলে, স্বামীর ভালবাসা, গাড়ি, বাড়ি, গয়না।' শোভনেশের মুঠোয় ধরা ছিল আঙুলগুলো। রোহিণীর করতল খুলে সে আবার তাকায়। 'বিয়ে খুব শিগ্গিরই হবে। আর সেটা হবে আর্টের সঙ্গে যুক্ত কোন লোকের সঙ্গে, সুখীও হবে।'

রোহিণী তখন হেসেছিল। বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার কোন কোষ্ঠীঠিকুজি আছে কি ?' মা জানিয়েছিল, নেই। বাবা এসবে বিশ্বাস করতেন না, তাই করানো হয়নি। শোভনেশের কোষ্ঠী ছিল। ওর ছিল বৃষ রাশি।

ট্যাবলয়েডে চোখ রাখল রোহিণী। দেড় মাস আছে শোভনেশের রাশি কি বলেছিল ? 'খরচ বাড়বে। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসবে এবং তা গ্রহণ করলে লাভই হবে। বন্ধুদের সাহায্যে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সফল হবেন, তবে সতর্ক থাকা দরকার। সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্নবান হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।'

জেলে বসে শোভনেশের এই রাশিফল দেখার সুযোগ ছিল কি ? সুযোগ থাকলে হো হো করে হেসে উঠে নিশ্চয় বলত, 'যশবৃদ্ধি ? প্রণয় ? সন্তান ? উরি ব্বাবা, তার ওপর বিদেশ ভ্রমণ, কর্মক্ষেত্রও ! এত সব এখন সামলাব কি করে ?' কয়েদিদের কি খবরের

কাগজ পড়তে দেওয়া হয় ? কিন্তু রোহিণীর এখন এই নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই। খসখস করে সে লিখে চলল। মাঝে একবার সে লেখা থামিয়ে অন্যমনস্ক চোখে টেবলে রাখা ম্যাগাজিনটার দিকে তাকিয়েছিল। কি লিখেছে শোভনেশ সম্পর্কে ? হাত বাড়িয়ে ম্যাগাজিনটার মলাটে প্রকাশের তারিখ দেখল। ১ ডিসেম্বর। মাত্র দু মাস আগের।

আটটা পঞ্চাশে কমল এল। তাব সঙ্গেই পাউরুটি আর মাদার ডেয়ারির দুধের পাউচ হাতে গৌরীর মা'ও ঢুকল।

"দিদি আপনার কথা রাখতে পারিনি। ইচ্ছে করেই রাখিনি। বাগদা, গলদা, পার্শে, তোপসে সবই ছিল কিন্তু কিনিনি।"

রোহিণীর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে কমল তাকিয়ে অসাধ্য এক কাজ করে ফেলার মত দাবি নিয়ে থলিটা তুলে বলল, "ইলিশ।"

"অ্যাঁ, এই অফ সিজনে ?"

"সেইজন্যই তো আপনার কথা অগ্রাহ্য করলুম। বাংলাদেশের চালানি মানে চোরা চালানি, আজ হঠাৎ এসে গেছে। একজনই নিয়ে বসেছিল, পঁয়ত্রিশ টাকা কিলো, সস্তাই বলতে হবে। সব থেকে ছোটটা বারোশো গ্রাম, ওটাই আনলুম।"

"খুব ভাল করেছেন, দেখি মাছটা !"

খুশিতে ঝকমক করে উঠল রোহিণীর চোখ। কমল কিন্তু কিন্তু করে বলল, "আমি যে কাটিয়ে আনলুম। আপনি কাটতে পারবেন কি না—।"

"কি বলছেন কমলদা, বাঙালি মেয়ে আর ইলিশ কাটতে পারব না ! ইসস্ আস্ত গোটা ইলিশ দেখতে যে কী টেরিফিক ! কত্তদিন যে দেখিনি !" থলিটা হাতে নিয়ে রোহিণী ফাঁক করে দেখল। মুখ নিচু করে ঘ্রাণ নিল। রাজেনকে শুধুই ভাত আর ইলিশ খাওয়াবে। তেল আর ভাজা আর ঝালসর্ষে দিয়ে ভাতে। ও ভীষণ ঝালের ভক্ত। কমলদাকে রীতিমত খাদ্যরসিকই বলতে হবে।

"আচ্ছা, আর একদিন আপনার জন্য আস্ত একটা আনব।... দিদি, লেখাটা ?"

"হয়ে গেছে। আর দু' মিনিট, কুম্ভ আর মীনটা বাকি। আপনাকে তো দশটার মধ্যে দিয়ে আসতে হবে। বরং ততক্ষণে দুটো ভাজা খেয়ে যান।"

রান্নাঘরের কলে গৌরীর মা বাসন মাজছিল। রোহিণী মাছ ভাজতে ভাজতে আবদারের গলায় বলল, "একটু সর্ষে, কাঁচালঙ্কা বেটে দেবে ?" তারপরই অনুযোগ করল, "তোমার ওই মেয়েটা বাপু না বলে-কয়ে কাল চলে গেছে। কেমন লোক দিলে তুমি ?"

"সে কি ! চলে গেছে ! আজকাল দিদি এই রকমই হয়েছে। কাজের লোক পাওয়া যে...তুমি বার করে রাখ, আমি নিচের ঘরের কাজ সেরে এসে বেটে দোব। তবে মেয়েটা ভাল, হাত-টান-ফান নেই। আমার সঙ্গে কাল আর দেখা হয়নি, আজই গিয়ে ওর মাকে জিজ্ঞেস করব, কেন কাজ ছাড়ল ? চঞ্চলার মাই-ই তো আমাকে বলেছিল কাজ দেখে দেবার জন্য। ছ'টা ছেলেমেয়ে, মরুক গে। হ্যাঁ, দিদি, লোকটা কি তোমার আপিসের ?"

"হ্যাঁ।" রোহিণী কড়া নামিয়ে বার্নার নিবিয়ে বলল, 'গৌরীর মা, মাছগুলো তো সন্ধে পর্যন্ত তুলে রাখা যাবে না। কি করি বল তো।"

"ওই জন্য বলেছিলুম একটা ফ্রিজ কেনো। এ বাড়ির সবার ঘরে আছে, শুধু তোমার ঘরেই ফ্রিজ, টিভি নেই।" এমন ঘরে কাজ করাটা যে অগৌরবজনক, গৌরীর মার স্বর সেটাই জানিয়ে দিল।

"কারুর ঘরে একবেলার জন্য যদি রাখা যায় ! তুমি একটু দেখবে ? সামনের মাদ্রাজীরা তো নিরামিষ, নন্দাদের ঘরেও রাখতে চাই না, ওদের সামনের ঘরের সঙ্গে আলাপ নেই। তুমি তো ওদের কাজ করো, একটু বলে দেখবে ? আমি তো বলতে গেলে ওদের চোখেও দেখিনি আজ পর্যন্ত।"

"কত্তা গিন্নি দুজনেই খুব ভাল লোক। তুমি নিজে গিয়েই বরং বলো, সেটাই ভাল দেখাবে।"

দু টুকরো মাছ ভাজা নিয়ে রোহিণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, কমল ম্যাগাজিনটা খুলে ঝুঁকে রয়েছে শোভনেশের আঁকা ছবিটার উপর। হঠাৎই ঝনঝন করে উঠল তার মাথার মধ্যে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে রোহিণী টেবলের অপর প্রান্ত থেকে হাত বাড়িয়ে ম্যাগাজিনটা ছিনিয়ে নিল হতভম্ব কমলের হাত থেকে।

"এসব আপনাকে দেখতে হবে না।" কর্কশ স্বরে সে বলল এবং ম্যাগাজিনটা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে রেখে রোহিণী চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

বিশ্রী রকমের অভব্যতা হল। কিন্তু মাথাটা কিরকম যে করে উঠল ! কি মনে করছে কমলদা ! ওই রকম ছবিওলা ম্যাগাজিন, ছোঁ মেরে সরিয়ে নিল। নিশ্চয় নোংরা অশ্লীল কিছু আছে, যেটা লোককে দেখতে দিতে চায় না। বাজে মেয়ে, চরিত্র ভাল নয়, এই রকম ধারণা হওয়াটাই স্বাভাবিক। রোহিণী লজ্জায় মুষড়ে পড়ল।

কমল অন্যমনস্কের মত মাছের কাঁটা বেছে খাচ্ছিল। ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে রোহিণীকে আসতে দেখে মুখ তুলে হাসল।

"লেখাটা শেষ করে ফেলি।"

কাগজ কলম নিয়ে রোহিণী কুম্ভ রাশিটা শুরু করল। মনে মনে সে কুঁকড়ে আছে।

"দিদি, মনটা খুব উতলা হয়ে রয়েছে ছেলের জন্য...আমি ইংরিজি পড়তেও পারি না। ছবিটা ভাল লাগছিল দেখতে, তাই—"।

রোহিণী অবাক হয়ে কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাল লাগছিল ?" তারপরই সম্বিত ফিরিয়ে এনে বলল, "কমলদা, আমি সেজন্য কিছু মনে করিনি। আমারও মনটা একটা ব্যাপারে উতলা হয়ে রয়েছে। এই ম্যাগাজিনটায় একটা লেখা বেরিয়েছে আমার স্বামীর সম্বন্ধে। এখনো পড়া হয়ে ওঠেনি। আপনি কি জানেন, আমার স্বামী একজন আর্টিস্ট ছিল, সে এখন জেলে ?"

কমল তার দুশ্চিন্তা-জর্জরিত স্তিমিত চাহনি রোহিণীর সন্ত্রস্ত এবং ব্যগ্র চোখে রেখে বলল, "লেখাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিন।"

মাথা নামিয়ে রোহিণী লেখায় মন দিল। গৌরীর মা'র ঝাঁট দেবার শব্দ ছাড়া ফ্ল্যাট নিঝুম। দালানের এক ধারে বেসিনের কলে হাত ধুয়ে এসে কমল কাগজগুলো নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, "মাছটায় স্বাদ আছে।"

গৌরীর মা ঝাঁট দেওয়া শেষ করেছে। রান্নাঘর থেকে বলল, "দিদি তোমার টোস করে রাখছি, পরে এসে ঘর মুছে দোবখন।"

"কমলদা, আপনার ছেলের জন্য আমিও দুশ্চিন্তায় থাকব। নিশ্চয় হসপিটালে একবার যাবেন। দুপুরে অফিসে অবশ্যই বলবেন, কেমন আছে।"

"বলব।" তারপর ইতস্তত করে কমল বলল, "অফিসে আপনার সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু আমি তাতে কান দিই না। স্বামী যদি অন্য কোন মেয়েকে খুন করে, সেটা তো স্ত্রীর দোষ নয়। কিন্তু অনেকের ধারণা, স্ত্রীরই দোষ।"

"কি দোষ ?" রোহিণী বিভ্রান্ত, উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল। " আমি তো খুন করতে বলিনি, প্ররোচিতও করিনি !"

কমল হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। "আমি ওদের বুঝি না। এরা এই রকমই, পরচর্চা, পরনিন্দা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যার স্বামী যাবজ্জীবনের জন্য জেলে, সে যদি কোন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাতে দোষটা কোথায় ? কিন্তু অনেকের কাছে সেটাই দোষের ! যাবজ্জীবন মানে তো তার বৌ বিধবাই। বিধবার কি বিয়ে হয় না আমাদের দেশে ? আমিই তো করেছি।"

কমলের শীর্ণ চোপসানো মুখ, কাঁচাপাকা দাড়িসমেত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "গরিব বামুনের মেয়ে, এক সময় পবিচয় ছিল। আমার নিচু জাত, তাই ওরা বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। তাড়াতাড়ি এক জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের এক বছর পরই বিধবা হয়, এসব ছাব্বিশ বছর আগের কথা।"

কমল চলে যাবার পর রোহিণী কিছুক্ষণ বসে প্রৌঢ় লোকটির কথা ভাবল। শান্ত প্রকৃতির, নিরীহ, স্বল্পবাক। পঁচিশ বছর ইস্টার্ন ম্যাগাজিনসে রয়েছে। ধুতি শার্ট আর চটি ছাড়া অন্য পোশাকে কেউ ওকে দেখেনি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভদ্র ডিসিপ্লিনড জীবন। ছেলে ইংরাজিতে এম এ পড়ছে। রোহিণীর মনে হল, এই সব লোকের সঙ্গে আলাপ কবলে জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণাগুলো নিবিয়ে ফেলতে সাহায্য পাওয়া যায়। এখন সে শান্ত বোধ করছে।

টোস্ট আর দুধ খাবার টেবলে রেখে দিয়ে, গৌরীব মা আর এক ঘরেব কাজ সারতে চলে গেছে। যাবার আগে ভাত চড়িয়ে দিয়ে গেছে। ম্যাগাজিনটা নাড়াচাড়া কবতে করতে রোহিণী ভাবল, মাছেব টুকরোগুলো অপরিচিত জনেব কাছে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজে রাখার অনুরোধ জানানোটা কতটা সঙ্গত হবে ? তার আগে বাথরুম যাওয়া, স্নান করা, তারও আগে ভাতটা নামানো। এই সব ভাবতে ভাবতে সে পাতা খুলে 'লালসাব আগুনে ভস্মীভূত' প্রবন্ধে খুঁজতে শুরু করল।

শেষের দিকে শোভনেশের কথা। প্যাবাগ্রাফেব প্রথম বাক্যটি পড়েই সে চমকে উঠল :

"শোভনেশ সেনগুপ্তর বংশে অদ্ভুত একটা ধারা আছে। উন্মাদ হওয়ার। তাব পিতামহের পিতামহ শ্যামাচরণ, ঊনবিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি বিধবা মায়ের সঙ্গে হুগলির এক গ্রাম থেকে উত্তর কলকাতায় মামার বাড়িতে আসেন ছয় বছর বয়সে। প্রাথমিক শিক্ষা হেয়ার স্কুলে। খুব অল্প বয়সে মামাদের কাগজের ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসি শুরু করে পরে পাটের দালালিতে নামে। প্রচুর বিত্ত তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। মধ্য কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে এক বিঘা এলাকা নিয়ে তৈরি বিশাল জরাজীর্ণ বাড়িটি এখনো তাঁর সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করছে। শ্যামাচরণ সন্দেহ ও ঈর্ষার বশে গলা টিপে হত্যা করেন তাঁর রক্ষিতাকে। কিন্তু বিচারের সময় দেখা যায়, তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন।

"শ্যামাচরণের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ দ্বারিকনাথ বাবার ব্যবসা ছাড়াও স্টিমার কিনে পরিবহন ব্যবসায়ে নেমে পৈতৃক সম্পদ আরো বাড়ান। মেজো ছেলে ইংল্যান্ড যান এবং এক ইংরাজ রমণীকে বিবাহ করেন। শ্যামাচরণ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। ছোট ছেলে অল্প বয়সে ধনুষ্টংকারে মারা যান। দ্বারিকনাথ একবার ক্রোধের বশে তাঁর এক কর্মচারীকে এমন প্রহার করেন যে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এর দু বছর পর তিনি

স্ত্রীকে হাত-পা বেঁধে ছাদের এক কুঠুরিতে সাতদিন বন্ধ করে রাখেন। জলটুকুও খেতে দেননি। অবশেষে বাড়ির এক ঝি পুলিশে খবর দেয়। তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। দ্বারিকনাথ তখন খুলনায় গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেখানে গ্রেফতার করতে গেলে তিনি স্টিমার থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে ডুবে মারা যান।

"দ্বারিকনাথের তিন কন্যা ও এক পুত্র। বিবাহের তিন বছর পর বড় মেয়ে তরলাবালা উন্মাদ হয়ে যান। বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি বাপের বাড়িতে একটি বন্ধ ঘরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। কিন্তু পুত্র রামচন্দ্র বা অন্য দুই মেয়ে স্বাভাবিক জীবনই যাপন করে পরিণত বয়সে মারা যান। বস্তুত এই সময় থেকেই সেনগুপ্তদের পাগলের বংশ, এমন একটা ধারণা কলকাতায় চাউর হয়ে যায়। বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ার প্রস্তাব পরপর প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় বহু অর্থব্যয়ে দ্বারিকনাথ তাঁর বাকি দুই মেয়ের বিয়ে দেন বরিশাল ও রানাঘাটে, ছেলের জন্য কন্যা সংগ্রহ করেন হাওড়ার এক গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে।

"পৈতৃক ব্যবসায়ে রামচন্দ্র একেবারেই মনোযোগী হননি। তাঁর ঝোঁক ছিল শিল্পের দিকে। তিনি দক্ষ অভিনেতা ছিলেন। থিয়েটারে অর্থ বিনিয়োগ করে নাট্য কোম্পানি তৈরি করেন। রামচন্দ্রের আমলেই সেনগুপ্তদের বিত্ত ও বৈভবের দ্রুত পতন ঘটে। একের পর এক বিপর্যয় ঘটে। যাত্রীসহ একটি স্টিমার ডুবে যাওয়ায় বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। পাটের ব্যবসায় তদারকির অভাবে ও কর্মচারীদের চুরি ও শোষণে ছিবড়েতে পরিণত হয়। থিয়েটার ব্যবসাও দু বছরের মধ্যে বন্ধ করতে হয় প্রভূত গুনাগার দিয়ে। বস্তুত যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি রামচন্দ্রই বিক্রি করে ফেলেন, শুধু বাড়িটি ছাড়া।

"রামচন্দ্রর দুই ছেলে দুই মেয়ে। দ্বিতীয় ছেলে রমেশচন্দ্রই শোভনেশের বাবা। বড় ছেলে উমেশচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন তাই শোভনেশের ছোট ভাই পরমেশকে তিনি দত্তক নেন। উমেশ-রমেশের ছোট বোন সুষমার বারো বছর বয়সেই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। যে-ঘরে তরলাবালা উন্মাদ জীবন কাটান, সুষমাকে সেই ঘরেই রাখা হয়।

"বংশে প্রতি পুরুষেই একজন করে পাগল হয়েছে, এটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল উমেশচন্দ্রকে। প্রথমে তিনি বিয়ে করতে রাজি হননি ছোট বোনকে ধীরে ধীরে উন্মাদ হয়ে যেতে দেখে। কিন্তু ভীরু ও অলস প্রকৃতির উমেশচন্দ্র বাবার হুমকি, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার শাসানি ও মায়ের অলঙ্কারাদি পাওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি। তবে বিয়ের আগে গোপনে তিনি নিজেকে নপুংশক করিয়ে নেন এক চিকিৎসক বন্ধু দ্বারা।"

কলিংবেল বাজল। পড়া থামিয়ে রোহিণী উঠে গিয়ে দরজা খুলল। গৌরীর মা বাকি কাজ সারতে এসেছে। রান্নাঘরে ঢুকেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "এ কি, ভাত নামাওনি! পোড়া গন্ধও কি পাচ্ছ না?"

রোহিণী "তাই তো" বলে ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল। আবার চাল সেদ্ধ করতে বসিয়ে সে দুধ আর ঠাণ্ডা টোস্ট দাঁতে ছিঁড়ে চিবোতে চিবোতে রান্নাঘর থেকে বাটনা বাটার শব্দের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভাবল, শোভনেশদের পারিবারিক এত কথা সিধারথ্ সিন্‌হা নামের লোকটি জানল কি করে! প্রায় একশো পঁচিশ বছরের, পাঁচ পুরুষের ইতিহাস তো অবাঙালি কারুর পক্ষে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়!

পুরো লেখাটার আকার অনুযায়ী শোভনেশের সম্পর্কেই বেশি জায়গা খরচ হয়েছে, তুলনায় বাকি তিন ভস্মীভূত শিল্পীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে কমই। নানা কাগজে ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সংবাদ থেকে তথ্য নিয়ে যতটুকু লেখা সম্ভব, উপর উপর শুধু ছুঁয়ে

যাওয়া, তাইই। কিন্তু শোভনেশের ব্যাপারটা, খেটেখুটে খবর জোগাড় করে লেখা। ম্যাগাজিনটা বোম্বাই থেকে বেরোয়। সেখানে বসে এটা লেখা নয়, সেখান থেকে এসে এত পুরনো সব কথা জোগাড় করা সোজা কাজ নয়।

তার মনে হচ্ছে, সম্ভবত লেখকের নাম সিদ্ধার্থ সিংহ। দেশের পাঠকদের বড় অংশের কাছে গ্রহণীয় হবার জন্য বাঙালিয়ানা খসিয়ে সিধারথ্ সিন্‌হা হয়েছেন। যেমন হিন্দি ফিল্মে পদবী উড়িয়ে দিয়ে মিস্টার রাজেশ, মিস মিতা বলা হয়। ভারতের কোন্ জায়গার লোক বোঝে কার সাধ্য ! আরও মনে হচ্ছে, এই সিদ্ধার্থ শুধু বাঙালিই নন, কলকাতারই বাঙালি। এঁকে খুঁজে বার করতে পারলে নিশ্চয় শোভনেশের পারিবারিক অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে। অন্তত উনি কোথা থেকে এসব কথা জেনেছেন, ওঁর সোর্সটা কী, তা জানতে পারলেও হবে। বোম্বাইয়ে ম্যাগাজিনটার সম্পাদকীয় অফিসে চিঠি দিয়ে সিদ্ধার্থ সিংহর ঠিকানাটা আনতে পারলে লোকটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

লেখাটায় যা সব বলা হয়েছে, তার বিন্দুবিসর্গ আজ সকাল পর্যন্তও সে জানত না। শোভনেশ তাব পারিবারিক অতীত সম্পর্কে কোনদিন একটি কথাও বলেনি। শুধু বলেছিল, 'আমি একা। বাবা-মা নেই। একটা ভাই, সে আলাদা থাকে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। অল্প বয়সে বাবার চাপে পড়ে বিয়ে করেছিলাম, বউ মারা গেছে।'

'বিয়ে হয়েছিল ! কত বছর বয়সে ?'

'কুড়ি-একুশে।'

'কি করে মারা গেল ?'

'ম্যালিগন্যান্ট টাইফয়েডে।'

'দেখতে কেমন ছিল ? ছবিটবি আছে ?'

'ছবি বাখা আমি পছন্দ করি না। আর এত বছর আগের চেহাবা, মুখ এখন চেষ্টা করলেও মনে করতে পারব না।'

গৌরীর মা দালান মুছছে। চেয়ারে সে বাবু হয়ে বসে। চঞ্চলা কাল বিস্কুট কিনে এনেছিল, রোহিণী ঠোঙাটা রাতে বাটি চাপা দিয়ে রাখে। এখন বাটি তুলে সেটা দেখে সে একটা বিস্কুট মুখে পুরল। খবরেব কাগজটার পাতা আর একবার উল্টে দেখে নিল। একটা লাইনও বহরমপুরেব খবর নেই।

তাকে অন্যমনস্ক দেখে গৌরীব মা বলল, "মাছ নিয়ে আমার সঙ্গে ওপরে চলো, আলাপ করিয়ে দোব। মাসিমা একদিন দুখ্যু করে বলল, বুড়োবুড়ি বলে কেউ গপ্পোটপ্পো করতেও আসে না। বসে বসে শুধু টি ভি দেখা ছাড়া কিছু করার নেই। ছেলে, ছেলের বউ কোচিন না মোচিন কোথায় যেন থাকে, মেয়ে জামাই বিলেতে। নাও ওঠো, চুলটা একটু আঁচড়ে নাও, বুড়ি একটু সেকেলে, সিঁদুব আছে ? আচ্ছা থাক আজকাল অফিসেব মেয়েরা অত সিঁদুরমিদুর দেয় না। বরং একটা লাল টিপ পরে নাও, আছে তো ?"

"খুঁজতে হবে।"

গৌরীর মা নিজের কপাল থেকে টিপটা খুলে রোহিণীর কপালে সেঁটে দিয়ে বলল, "সাজগোজের দিকে তোমার একদম নজর নেই। স্বামী নিরুদ্দেশ হলেও, সধবা তো ! হ্যাঁ দিদি, খোঁজটোজ চালাচ্ছ তো ?"

"কোথায় আর খোঁজ চালাব, বলো। আশি-পঁচাশি কোটি লোকের দেশ, সহজ তো নয় !"

"তারকেশ্বরে হত্যে দাও একবার।"

"হ্যাঁ তাই দোব ভাবছি। চলো এবার।"

দুজনে পলিথিন ব্যাগে মোড়া মাছ নিয়ে উপর তলায় উঠে বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছে। রোহিণী পিছনে মুখ ফিরিয়ে তুষার দত্তর ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। দেয়ালে কাচের পাল্লা দেওয়া আলমারিতে ডিনার সেট, সাজিয়ে রাখা। বিয়েতে পাওয়া। আঠারো বছরে একবারও ব্যবহারের সুযোগ আসেনি। স্টিলের থালা বাটি গ্লাসও সাজানো রয়েছে। আর একটা তাকে কয়েকটা রাজস্থানী মেয়ে পুতুলের সঙ্গে প্লাস্টিকের পুতুলও। আর এক তাকে তুষার দত্তর পেশী ফোলানোর ফসল কয়েকটা কাপ মেডেল। দেয়ালেও জাঙ্গিয়া পরা তুষার দত্তর চার রকম ভঙ্গির ছবি, বহিরাগতদের যেন অস্বস্তির উপাদান জোগাতেই টাঙানো। হঠাৎ প্রেসার কুকারের বাষ্প নিঃসরণের তীক্ষ্ণ আওয়াজ হল। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে নন্দা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই থমকে গেল আড়ষ্ট হয়ে। রোহিণী হাতছানিতে তাকে ডাকল।

"আমার পরিচিত একজন জয়পুর যাচ্ছে, তাকে বলব তোমার জন্য··একটা আনতে। ওখানে দারুণ দারুণ প্রিন্টের পাওয়া যায়, কাচ বসানো।"

'একটা' কি জিনিস যে আনতে বলবে, সেটা আর বলার দরকার হল না। নন্দার মুখ উজ্জ্বল হয়েই ফ্যাকাসে হল।

"বাবা ওসব পরা পছন্দ করে না। আমি দুপুরে আপনার ঘরে গিয়ে পরেছিলাম। চঞ্চলা তখন ছিল, ওকে বারণ করেছিলুম আপনাকে যেন না বলে।"

"ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করছি না।"

ইতস্তত করে নন্দা কি একটা বলতে যাচ্ছে, সেই সময় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। এক ছোটখাটো চেহারার, স্নিগ্ধ মুখ, গৌরবর্ণা মহিলা ওদের দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে। বয়স ষাট পঁয়ষট্টির মধ্যে।

"মাসিমা, এই যে দিদি এসেছে।"

"ওহ্, এসো ভেতরে এসো। মাছ রাখবে তো ? তোমার নাম তো রোহিণী।"

"হ্যাঁ। আগে আমি কখনো এমন ঝামেলায় তো পড়িনি।" রোহিণী কুণ্ঠিত স্বরে বলল। মাছ আনলাম, রেঁধে খেয়েও ফেললাম। ভুলেটুলে রাখার মধ্যে আমি নেই। রাতে খাই নিরিমিষ। কিন্তু আজই—"

"শুনেছি, গৌরীর মা ই বলেছে। বসো। 'তুমি' বলছি বলে—"

"না না, নিশ্চয় বলবেন, মায়ের বয়সী আপনি।" রোহিণী বসার জন্য ব্যস্ত হল না।

"তাছাড়া দিদি আপনাদেরই স্বজাত বদ্যি। ছোয়াঁছুঁয়ির আর কথাই উঠবে না।"

"বদ্যি নাকি ! তবে আমি অত জাতটাতের বাছবিচার করি না। তুমি নিজেই রেখে দাও।"

দালানের প্রান্তে রাখা ফ্রিজের কাছে গিয়ে পাল্লা খুলে মহিলা ডিপ ফ্রিজের ডালাটা টেনে বললেন, "এর মধ্যেই রাখ।"

রাখার সময় রোহিণী দেখল, প্লাস্টিকের সাত-আটটা কুলপি ভেতরে রয়েছে। নিচের তাকে কয়েকটা ঢাকা বাটিতে রান্না করা খাদ্য, জলের আর সিরাপের বোতল, মাখনের কৌটো। রোহিণীর চোখের দিকে নজর রেখেছিলেন মহিলা। বললেন, "একটা মালাই চেখে দেখবে নাকি ?"

"না না, আমি এই সকালে ঠাণ্ডা খাব না।"

"কাল গুরুভাই এসেছিলেন। আমরা তো বারাসতের বিনোদানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য।

একটাই মালাই তখন পড়ে ছিল, তাই দিলাম। খেয়ে খুব ভাল লেগেছে বলায় বললাম, আজ আসুন, বেশি করে খাওয়াব।"

"আমাকে অন্য আর একদিন করে খাওয়াবেন মাসিমা। আমারও খুব ভাল লাগে।" রোহিণী ক্ষীণভাবে স্বরটা আবদেরে করল। খুশিতে টসটস করে উঠল ওঁর মুখ। প্রীত কণ্ঠে বললেন, "খেলে বুঝতে পারবে, দোকানের থেকে আমার মালাইয়ের পার্থক্যটা কত।"

"হ্যাঁ দিদি, মাসিমার হাতের রান্না খুব ভাল, সেদিন জিরে-গোলমরিচ দিয়ে যা কচুর মুখি রেঁধেছিলেন না!"

গৌরীর মার তারিফটা উপভোগ করে উনি বললেন, "তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?"

রোহিণী ধরেই রেখেছে, গৌরীর মা তার সম্পর্ক যতটুকু জানে, সবিস্তারে নিশ্চয় এঁর কাছে তা বলেছে। তবে এটা জানে না, তার শ্বশুরবাড়ি কোথায়। কাউকে সে জানাতে চায়ও না। যদি হঠাৎ চেনাশোনা বেরিয়ে যায় তাহলে আবার এক ধরনের ফিসফিসে কৌতূহলেব পাত্রী হয়ে পড়তে হবে।

"মাসিমা, আমি এখন আসি, দিদি চললুম, এখনো কাজ পড়ে আছে।" ব্যস্ত গৌরীর মা আর এক ফ্ল্যাটের কাজ শেষ করতে গেল।

"সেন্ট্রাল ক্যালকাটায়, বৌবাজারেব দিকে।"

"ওমা! আমরাও তো একসময় বৌবাজারেই থাকতাম। পঁচিশ নম্বর দিগম্বর বর্ধন লেনে।"

শোনা মাত্রই রোহিণী মাথা ঘুরে প্রায় পড়ে যাবার মত আঘাত পেল তার স্নায়ু-কেন্দ্রে। ওটা তার শ্বশুববাড়িরই ঠিকানা। ডাইনিং টেবলেব একটা চেয়াব টেনে ধীবে ধীরে সে বসে পড়ল।

"কবে ছিলেন?" দমবন্ধ অবস্থায় রোহিণী জানতে চাইল।

"আমার বিয়ের ঠিক পরেই। বছব চল্লিশ আগে তো বটেই। ওঁর অফিস ছিল মৌলালিতে, হেঁটেই যেতেন। তখন যুদ্ধের শেষের দিক। আমরা ও বাড়িতে যাওয়ার কয়েক মাস পর ব্ল্যাক আউট উঠে গেল। আমার বড় ছেলে তখনই হয়।"

"সে বাড়িতে কে কে ছিল?"

"আমরা ছাড়াও, একতলায় আরো দু' ঘর ভাড়াটে ছিল। বাড়িওয়ালারা থাকত দোতলায়, পেল্লায় বাড়ি দু' ভাইয়ের, ওবাও বদ্যি, পার্টিশান করে পাঁচিল তুলে দু' ভাই আলাদা। এক সময় বিরাট ধনী ছিল, কিন্তু বসে বসে খেলে যা হয়। শেষে এমন অবস্থায় পড়ল যে, ভাড়াটে বসাতে হল। অনেকটা জমি ছিল বাড়ির সঙ্গে, গাছপালাও। আমরা দেখেছি কয়লার ডিপো আর রিক্সার খাটাল হল সেই জমিতে, এক ডেকরেটার বাঁশ রাখত।"

"বাড়িওয়ালার পরিবারে কে কে ছিল?"

"ওরা তো দুই ভাই। বড় ভাইয়ের ছেলেপুলে হয়নি, তাই ছোট ভাইয়ের দুই ছেলের মধ্যে ছোটটিকে পুষ্যি নেয়। এবা বাঁ দিকের পোর্সানে থাকত, আর আমাদের বাড়িওয়ালা রমেশবাবুরা ডানদিকে। বড় ছেলে শোভনেশ, আর্ট কলেজে পড়ত, তখনই বাপ ওর বিয়ে দিয়ে দেয়।"

"তখন ছাত্র তো, অত কম বয়সেই ছেলের বিয়ে দিয়ে দিল?"

"ছেলে তো করতেই চায়নি, একদিন সে কি ঝগড়া বাপ আর ছেলেতে। আমি তখন

ছাদ থেকে নামছি শুকনো কাপড় তুলে। শুনলাম—" মহিলা কথা থামিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। "সে-সব কথা মুখে আনা যায় না, তোমার মত অল্পবয়সীদেরও বলা যায় না। আমরা ও-বাড়িতে যাওয়ার পর পাড়ার লোকের কাছে শুনি, সেনগুপ্তদের নাকি পাগলের বংশ। প্রতি পুরুষে হয় কোন ছেলে নয় কোন মেয়ে, একজন না একজন পাগল হয়েছেই। পাগল রাখার জন্য ওদের একটা ঘরই আছে। বুঝলে রোহিণী, ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাসের অনেক অসুবিধে যেমন, তেমনি সুবিধেও অনেক আছে। এই রকম ফ্ল্যাটে দরজা বন্ধ করলেই একা, জানলা দিয়েও পাশের বা সামনের বাড়ি পাওয়া যায় না। ছাদ থেকেও গল্পসল্পর উপায় নেই। কিন্তু গলিতে বাড়ি হলে, সদর তো সব সময়ই খোলা, জানলায় কি বারান্দায় দাঁড়াও, সব সময় কথা বলার লোক পাবেই। ভাড়াটে ভর্তি বাড়ি হলে তো কথাই নেই, ঝগড়াঝাটি করেও সময় কেটে যায়। ও পাড়ায় প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর প্রত্যেকে রাখত। আমাদের বাড়িওয়ালার সম্পর্কেও অনেক কথা শুনেছি। শুনে খুব ভয় ধরে গেছিল।"

"কেন ?" রোহিণীর মস্তিষ্কের কোষগুলো সজাগতার তুঙ্গে পৌঁছল। এতক্ষণে আসল জায়গায় কৌতূহল তার জানার বিষয়টায় পা রেখেছে। "ভয় পাওয়ার মত কি শুনেছেন ?"

"ভয় পাব না ? কেউ না কেউ পাগল হয়ে আসছে পাঁচ পুরুষ ধরে, এই পুরুষে কেউ এখনো হয়নি, কিন্তু *হবেই*—কে হবে ? পাড়ার লোকেরা তো এই নিয়ে রীতিমত জল্পনাকল্পনা করত। পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সেও পাগল হয়েছে, আবার দশ বারো বছর বয়সেও হয়েছে। কখন যে কে হবে, তার ঠিক নেই ! বাপ-জ্যাঠার বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু তারাও তখন পাগল হতে পারে আবার শোভনেশ আর তার ভাই পরমেশও পাগল হয়ে যেতে পারে। সে যে কি এক যন্ত্রণাকর অবস্থা, ভাবলে তো সুস্থ মানুষও পাগল হয়ে যাবে।"

"দারুণ ইন্টারেস্টিং তো মাসিমা, অদ্ভুত ব্যাপার ! ওরাও কি এই নিয়ে ভাবত না ?"

"ভাবত না আবার ! সিঁটিয়ে থাকত সব সময়। যাগযজ্ঞি শান্তি স্বস্ত্যয়ন তো লেগেই ছিল। তাবিজ তাগা, মাদুলি, আংটি, জ্যোতিষী, গণৎকার থেকে শুরু করে স্পেশালিস্ট ডাক্তার দেখানোও হয়েছে। কেউ একজন পাগল হলে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, কিন্তু কেউই হচ্ছে না। এ যে কি সমস্যা, কি যন্ত্রণা ভাবলে এখন হাসি পায় বটে, কিন্তু যদি তুমি তখন ওই বাড়িতে থাকতে— তাহলে বুঝতে।"

মহিলা হাসলেন না। রোহিণীর হাতের আঙুলগুলো একবার কেঁপে উঠল। ওই বাড়িতে সে কয়েক মাস থেকেছে। কিন্তু কিছুই কি তখন তাকে অবাক করেনি ? অমাবস্যা আর পূর্ণিমায় শোভনেশ বাড়ি থেকে বেরোত না। সারাদিন ছবি আঁকার ঘরে নিজেকে যেন বন্দী করে রাখত। একবার রোহিণী জুতো কিনতে যাবার জন্য তাকে সন্ধ্যায় বেরোতে বলেছিল। শোভনেশ রাজি হয়নি। 'আজ অমাবস্যা, দিনটা ভাল নয়।' অবাক হয়ে সে বলেছিল, 'তুমি এসব মানো নাকি ? এই ধরণের কুসংস্কার—' তার কথা শেষ হবার আগেই অস্বাভাবিক চাহনিতে তীব্র স্বরে শোভনেশ বলে, 'যা জানো না, তাই নিয়ে কথা বলো না। আমাদের বংশে এসব মানা হয়। দরকার থাকলে তুমি বেরোতে পার, তোমার শরীরে সেনগুপ্তদের রক্ত নেই।'

রোহিণী তখন কথাগুলোর অর্থ ধরতে পারেনি। তাই নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও তখন ছিল না। কিন্তু এ ছাড়াও তাকে অবাক করার মত আরো কিছুও তো

ঘটেছিল।

"শোভনেশ মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে আসত। এসেই বলত 'বৌদি কিছু বুঝতে পারছেন ?' বুঝতে পারা মানে, পাগল হবার লক্ষণটক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা সেটাই। আমি বরাবরের মতই বলতাম, 'তোমার দাদার মধ্যে যতটুকু দেখি, তোমার মধ্যেও ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছি।' শুনে খুশি হত। বিয়ের পর ওর ছটফটানি যেন বাড়ল। আমার স্বামীকে একদিন বলেছিল, 'আমার সন্তান হওয়া কি উচিত ? দাদা আপনি কি বলেন ? বংশের এই ব্যাধিটা থামিয়ে দেওয়া দরকার। পরমেশকে বলেছি বিয়ে করিসনি, এমনকি তোর ঔরসেও যেন কারুর গর্ভে সন্তান না হয়, সেটা দেখিস। কিন্তু ও রাজি নয়। বৌকে বলেছি, আমাদের কোন ছেলেপুলে হবে না। সেও রাজি নয়। ঠিক করেছি, আমি অপারেশন করিয়ে নেব। করলে কি অন্যায় হবে ?' উনি আর কি বলবেন, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর, বলে এড়িয়ে গেলেন।"

"বউ মারা গেল কিভাবে ?"

মহিলা এবার অবাক হয়ে রোহিণীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। "তুমি জানলে কি করে ?"

হিম হয়ে গেল রোহিণীর বুক। হঠাৎই তার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে এসেছে। শোভনেশের বউয়ের মৃত্যু নিয়ে উনি তো এখনো একটা কথাও বলেননি। ব্যাপারটা সামলাবার জন্য সে হাল্কা স্বরে বলল, "এসব লোকের বউয়েরা সাধারণত বাঁচে না। আমার এ রকম ঘটনা জানা আছে, স্বামীর বাতিকে উত্যক্ত হয়ে একজনের বউ গলায় দড়ি দেয়, আর একজনের বউ অবশ্য পালিয়ে বেঁচেছিল। দুজনেই ধনী, বনেদিবাড়ির বউ ছিল। তাই মনে হল—।"

"শোভনেশের বউ যখন মারা যায়, আমরা তখন একটা বিয়ের নেমন্তন্নে টালিগঞ্জ গেছিলাম। দোতলার বড় ঘরটার জানলাগুলোয় গরাদ নেই। সেখান থেকে লাফিয়ে নাকি নিচে পড়ে, পেটে চার মাসের বাচ্চা ছিল। আমাদের কিন্তু অন্য রকম মনে হয়েছিল।"

"কি মনে হয়েছিল, খুন ? রোহিণীর স্বর অস্ফুট হয়ে গেল, শ্বাসনালিতে উত্তেজনার চাপ পড়ায়।

"হ্যাঁ। শুধু আমরা কেন, পাড়ার লোকেও তাই মনে করে। কমলার মত ঠাণ্ডা শান্ত মেয়ে, আঠারো উনিশ বছর বয়সে কেন আত্মহত্যা করতে যাবে বল, তার ওপর পেটে বাচ্চা ?"

"কিন্তু ওর স্বামী তো অপারেশন করে নেবে বলেছিল, তাহলে আবার বউয়ের পেটে বাচ্চা এল কি করে ?"

"করেছিল কি করেনি তা বাপু আমরা জানি না, আমাদের আর কিছু বলেওনি শোভনেশ। পরে আর তো আমাদের সঙ্গে কথাই বলত না।"

"টর্চার করত ?"

"তেমন কিছু তো দেখিনি।"

"তখন কি ছবি আঁকত ?"

"ঘরে বসে বসে আঁকত। আমি তো আঁকার ঘরে ঢুকিনি কখনো।"

"এখন সেই শোভনেশ কোথায়, ওই বাড়িতেই আছে ? আবার বিয়েটিয়ে করেছে ?"

"তা বলতে পারব না। কমলা মারা যাবার পর, ছাদের দরজায় তালা দিয়ে দিল।

আর উপরে যেতে পারি না, তাই নিয়ে ঝগড়াও হল। ইতিমধ্যে উনি বদলি হলেন জলন্ধরে, সেন্ট্রাল গরমেন্টের চাকরি তো, তারপর থেকেই বাংলার বাইরে বাইরে ঘোরা। কলকাতার কোন খবর পর্যন্ত রাখিনি। রিটায়ার করে এই চার বছর হল আমরা এসেছি। মাঝে মাঝে ভাবি একবার ঘুরে আসি দিগম্বর বর্ধন লেনে, তখনকার মানুষরা কে কেমন আছে দেখতে ইচ্ছে করে। বাড়িটার এখন কি দশা কে জানে।"

কলিং বেল বাজল। উনি গিয়ে দরজা খুললেন।

"নিচের আন্টি আছেন ?" নন্দার গলা পেয়ে রোহিণী উঠল।

"আন্টি, আপনার ফোন।"

একবার শুধু ভ্রূ কুঁচকেই রোহিণী বিরক্তি চেপে মুখে হাসি টেনে বলল, "আসি মাসিমা। খুব ভাল গল্প বলেন, আবার একদিন এসে শুনব। রাতে এসে মাছ নিয়ে যাব।"

দ্রুত পায়ে এসে টুলের উপর রাখা ফোনের রিসিভারটা তুলে সে চাপা স্বরে বলল : হ্যালো।"

"রান্না জানার প্রমাণ আজ দিচ্ছ তো ?"

"তোমাকে বলেছি না, খুব দরকার না পড়লে এখানে ফোন করবে না।"

"খুব দরকারেই তো করছি। তোমার কি মনে হয়, প্রথম বলেই আউট হওয়াটা খুব মর্যাদাকর ব্যাপার হবে ?"

"আমার শরীর, মন আজ খুব ক্লান্ত, নানারকম চাপ···তুমি দুপুরে ফোন কোরো অফিসে।"

"কিসের চাপ, ফোনে কি তা বলা যায় ?"

"দেখা হলে বলব। তোমাকে হয়তো আমার এবার দরকার হবে।"

"খুব দরকার হলে আমি দেখা করব না, আর খুব খুব—"

"রাজেন !" রোহিণী গম্ভীর ধমক দিল। "তুমি যে প্রথম বলেই বোল্ড হবে, সেটা এখনি বুঝতে পারছি। সিরিয়াস হও। ইলিশ মাছ আনিয়েছি, আর একটি কথাও নয়।"

রিসিভার রেখে রোহিণী হাসল নন্দার দিকে তাকিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নন্দা "আন্টি" বলে ডেকে, দ্রুত নেমে তার পাশে এল।

"চঞ্চলা আর আসেনি ?"

"না তো, কেন ?"

"আন্টি, আমি কিন্তু ওকে ভয় দেখাইনি। ও বললেও তা বিশ্বাস করবেন না।" নন্দার কাতর আবেদনভরা মুখটির দিকে তাকিয়ে রোহিণী অবাক হল।

"ও হয়তো তাই বলবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, লোকটাকে দেখে আমিও ভয় পেয়ে গেছিলাম।"

"কে লোকটা ? কি রকম দেখতে ?"

"খুব লম্বা, রোগা, আর ইয়া ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুলদাড়ি, ভুরুটাও পাকা, ইয়া লম্বা জুলপি, সরু সরু চোখ দুটো দেখলে ভয় করে, যেন জ্বলছে !"

"কোথায় লোকটা ?" রোহিণী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। এ তো শোভনেশ !

"জানি না। আমি ম্যাক্সিটা পরে নিচে সংঘমিত্রাকে দেখাতে গেছিলাম। তখন ওদের জানলা দিয়ে দেখি, ওই লোকটা গেট দিয়ে ঢুকছে। ঢুকে এধার ওধার কেমন যেন তাকাচ্ছে। কাঁধে একটা নানান কাপড়ের তাপ্পিমারা ঝোলা। তারপর উপরে গিয়ে

আপনার কলিংবেল বাজালাম, কিন্তু দরজা আর খুলছে না। শেষে ধাক্কা দিয়ে 'চঞ্চলা চঞ্চলা' বলে নাম ধরে ডাকতে ও দরজা খুলল। দেখি, ভয়ে মুখ একদম ফ্যাকাসে।"

নন্দা যদি একটু ভাল করে নজর করত, তাহলে হয়তো বলত, আন্টি, ঠিক আপনার এখনকার মুখের মত। কিন্তু বর্ণনাটা গুছিয়ে, শ্রোতার মনে দাগ কাটানোর চেষ্টায় তখন সে ব্যস্ত।

নন্দা ঢোঁক গিলে আবার শুরু করল, "প্রথমেই বলল, ছেলেধরা এসেছিল। আমি তো শুনে অবাক! জিজ্ঞাসা করলাম, কখন এসেছিল? বলল এইমাত্র। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুললুম, দেখি, একটা ছেলেধরা কাঁধে ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে। লোকটা কটমট করে তাকিয়ে বলল, তুমি কে? এই বলে ভেতরে তাকিয়ে এধার ওধার দেখতে লাগল। তারপর ঝুলি থেকে একটা কাগজ বার করে বিড়বিড় করে পড়ে বলল, 'এটা কত নম্বর ফ্ল্যাট? চঞ্চলার তখন অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা। কথা বলতে পারছিল না। লোকটা তখন বলল, এখানে কে আছেন, তাঁকে ডাকো। চঞ্চলা বলল, 'কেউ নেই এখন, মাসিমা বেরিয়ে গেছে। আমি একা আছি।' এই বলেই ও দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আমি ওপর থেকে নিচ খুঁজলাম, কিন্তু লোকটা যেন হাওয়া হয়ে গেছে, কোত্থাও দেখতে পেলাম না। চঞ্চলা বলল 'আমি আর এখানে থাকব না।' আমি কত ওকে বোঝালাম, ছেলেধরাটরা সব বাজে কথা, ওরা দুপুরে এভাবে এসে ধরে না, আর ধরলেও তোকে ধরবে না। কিন্তু কে শোনে আর সে কথা, গোঁ ধরে রইল—আন্টি, আপনার কি পায়ের যন্ত্রণাটা আবার হচ্ছে?"

"না না আমি ঠিক আছি। তুমি আইসব্যাগটা বরং নিয়ে যাও।"

রোহিণীর মনে হচ্ছে, তার দুই হাঁটুতে বাত হয়েছে। সে বৃদ্ধা হয়ে গেছে। হাঁটাচলার ক্ষমতা রহিত। নন্দা ব্যাগটা নিয়ে চলে যেতেই সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কোন সন্দেহ নেই লোকটা কে হতে পারে। কিন্তু কিভাবে জোগাড় করল তার এখনকার ঠিকানা?

যতই সে ভাবতে লাগল, তার ভয়টা ক্রমশ নিজের প্রতি রাগে রূপান্তরিত হতে শুরু করল। কেন সে এই লোকটিকে বিয়ে করতে গেল? বোম্বাইয়ে দিদিকে টেলিফোনে যখন সে বিয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানায় তখন দিদি বারণ করে বলেছিল, 'রুনি, আর্টিস্টরা সাংঘাতিক লোক, এদের বিশ্বাস করিসনি। এরা অন্য প্রকৃতির হয়, এরা আলাদা জগতের লোক। সত্যিমিথ্যে দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে মনগড়া জিনিসকে আসল বলে চালায়, তাইতে বোকারা কনফিউজড হয়। তোরও সেই দশা হয়েছে। তুই ভুল করিসনি। তোর জন্য অনেক অনেক ভাল পাত্র পাওয়া যাবে, আমিই জোগাড় করে দেব এখানে।'

দিদির কথা শুনলে আজ এই অবস্থা তার হত না। মা তখন বেঁচে। শুধু বলেছিলেন, 'তোমার মন যা চায় তাই কর, তুমি এখন সাবালিকা।' বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়ে যাবার তিন দিন পরই দিদি বোম্বাই থেকে সকালের ফ্লাইটে এসে মাকে নিয়ে রাতের ফ্লাইটেই ফিরে যায়। বিশেষ কোন কথাবার্তা হয়নি। যাবার সময় শুধু বলে যায়, 'চাকরিটা ছেড়ো না, ভবিষ্যতে এটাই তো সম্বল করে বাঁচতে হবে।" শোভনেশের মামলার রায় বেরোতেই দিদি টেলিফোন করে বলেছিল, 'যা বলেছিলাম সেটা এখন মিলিয়ে নে। রঞ্জন বলেছে, আর তোকে কলকাতায় থাকতে হবে না। প্লেনের টিকিট পাঠাচ্ছি, দু' হপ্তার মধ্যে এখানে পৌঁছচ্ছিস এটাই আমি দেখতে চাই।' চাকরি আর ভাড়া বাড়ি ছেড়ে, গঙ্গাদার আপত্তি

সত্ত্বেও, সে দিদির কাছে চলে গেছিল।

এক ঘণ্টা পর, আরামদায়ক রৌদ্রের মধ্যে তিন নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে মিনিবাসের জন্য যখন সে দাঁড়াল, তখন তার কাঁধ ঝুলে পড়েছে, মাথা সামান্য ঝোঁকানো, ঝোলাটার একটা কোণ শক্ত মুঠিতে ধরা আর চোখে শূন্য চাহনি।

"তাহলে কাল সকালেই, দশটায়।" টেলিফোন রেখে প্রশান্ত হালদার তাকালেন রোহিণীর মুখের দিকে। "অসুবিধে হবে না তো ?"

"না।" ইতস্তত করে তারপর সে বলল, "কার সঙ্গে আপনি কথা বললেন ?"

"মীনার সেক্রেটারি কাম গার্জিয়ান সুভাষ গায়েন, যার সঙ্গে কাল তুমি কথা বলে এসেছ।"

আমার সম্পর্কে কিছু বলল ?"

"না তো ? কেন, বলার মত কিছু হয়েছে নাকি ?"

'না, লোকটাকে খুব রাফ্ মনে হচ্ছিল। আমিও একটু মাথা গরম করে ফেলেছিলাম, অবশ্য অন্য একটা ব্যাপারে।" প্রশান্ত হালদার জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন দেখে রোহিণী যোগ করল, "ঘরে একটা ছবি টাঙানো ছিল, সেটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম বলে লোকটা বিশ্রিভাবে জবাব দিয়েছিল।"

"কি ছবি ?"

"একটা পেইন্টিং, ন্যুড মেয়ের।"

"মীনার ?"

"না না অন্য কারুর।"

"আহ্‌হ্।" প্রশান্ত হালদারের সিধে হয়ে যাওয়া শিরদাঁড়াটা আবার চেয়ারে, পিঠে নেতিয়ে পড়ল। "মীনার হলে ছবি তুলিয়ে এনে ছাপতুম।"

"গঙ্গাদা কখন আসবেন বলেছেন কিছু ?"

"সময় তো হয়ে গেছে। খুবই ব্যস্ত এখন। আর একটা অফসেট ছাপার মেসিন কেনা হচ্ছে, বেলেঘাটার বাড়ি কমপ্লিট হলেই আসবে। তখন আমাদের সবাইকেই ওখানে চলে যেতে হবে। তাছাড়া ম্যাগাজিনগুলোকে ট্রেন্ডি, ক্যাচি, আপবিট করারও তোড়জোড় হচ্ছে। নতুন ডিজাইনে মহারানী, চিত্ররেখা বেরোবে। অনেক ফিচার উঠে যাবে, নতুন নতুন ফিচার আসবে। গঙ্গাবাবু এজন্য বোম্বাইয়ের এক ডিজাইনিং কনসালট্যান্টের ওপর ভার দেবেন ঠিক করেছেন, কেন তুমি এসব শোননি ?"

"না তো ! কবে ঠিক হল ?"

"গত হপ্তায় আমাকে বলেছেন।"

টেবিলের ওধারে একজোড়া বিস্মিত চোখ। রোহিণী অপ্রতিভ বোধ করল। সবাই জানে, সে গঙ্গাপ্রসাদের কাছের লোক, ভিতরের খবরাখবর জানে। কিন্তু গঙ্গাদা এইসব পরিকল্পনার কিছুই তাকে বলেননি। এটা গোপন রাখার মত একটা ব্যাপার কি ? হঠাৎ তার মনে হল; শোভনেশ সম্পর্কেও অনেক কথা উনি লুকিয়েছেন, যা বিয়ের আগেই জানালে আজ এই দশা তার হত না।

ফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে দিয়েই প্রশান্ত হালদার সেটা রোহিণীর দিকে বাড়িয়ে বললেন, "তোমার।"

"হ্যালো।"

"কখন বেরোবে ?"

"পাঁচটায়।"

"মাছটা ততক্ষণে যদি বেড়াল-টেড়ালে খেয়ে ফেলে ?"

"খাবে না। ঠিক পাঁচটায়।"

"যদি পৌনে ছ'টায় যাই ?"

"ঠিক পাঁচটায়।" রোহিণী রিসিভার এগিয়ে দিল চিঠি পড়ায় মগ্ন প্রশান্ত হালদারের দিকে। তিনি হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "বিপ্লব আসেনি, বোম্বে থেকে যে কপি, এসেছে সেগুলো দেখ আর ছবির ক্যাপসন করে দাও।"

আধঘন্টা পর গঙ্গাপ্রসাদ এলেন এবং প্রশান্ত হালদারকে ডেকে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পর তিনি ফিরে এসে রোহিণীকে জানালেন, "তোমাকে ডেকেছেন।"

দুই তালুতে গাল চেপে একদৃষ্টে টেবলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন গঙ্গাপ্রসাদ। রোহিণী চেয়ারে বসল উৎকণ্ঠা নিয়ে। রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে যে খবর নিয়ে এসেছেন, সেটাই বলার জন্য ডেকেছেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভাল খবর নয়। আশঙ্কায় তার বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল।

"বহরমপুরে আমার এক চেনা ব্যবসায়ী বন্ধু আছে। আজ সকালে বাসুদেবপুর থেকে ফিরেই তাকে ট্রাঙ্ককল করেছিলাম। ওখানে ভীষণ টেনশান এখন। কম্যুনাল ব্যাপার। কুড়ি-পঁচিশজন মারা গেছে, ই এফ আর, স্টেট আর্ম পুলিশ নেমেছে। লালগোলা, ভগবানগোলা, কাশিমবাজার, নসিপুর স্টেশনেও দাঙ্গা হয়েছে। পুলিশ এখন ভীষণ ব্যস্ত, কোনদিকে তাদের নজর রাখার ফুরসতই নেই। ব্যাপারটা যে কোন লেভেলে গেছে, কাগজ পড়ে তা বোঝা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে যদি কেউ জেল থেকে পালায়— খুবই সম্ভব পালানো। বলেছে, খোঁজ নিয়ে আমাকে বিকেলেই জানাবে। আমি ফোনের জন্য অপেক্ষা করছি।"

গঙ্গাপ্রসাদ ঘড়ি দেখলেন, ভ্রূ কোঁচকালেন। তারপর আবার বললেন, "রাইটার্সেও ব্যস্ত সবাই। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এক আন্ডারট্রায়াল আসামি পালিয়েছে। দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে তো আটজন নকশাল পালিয়েছিল, তারপর এই সব ঘটনা। আবার এদিকে আলিপুর জেলের সুপারকে ঘেরাও করেছে কর্মচারীরা, তাই নিয়ে হৈ হৈ। জেল গেটে ডিউটি দেয় এক খুনের আসামি, সে নাকি বাইরে থেকে খবরাখবর চালান করে ভেতরে, তাকে সরাবার দাবি নিয়েই ঘেরাও। লালবাজার থেকে অ্যাডিশনাল ফোর্স গেছে। জেল মন্ত্রী, আই জি প্রিজন্স, হোম সেক্রেটারি আলোচনায় বসেছে, এর মধ্যে কে আর বহমপুর জেল থেকে পালানোর খবর দেবে ?"

গঙ্গাপ্রসাদ ও রোহিণী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কারুরই আর কিছু যেন বলার নেই। অবশেষে দু'জনে চোখ সরিয়ে নিল।

ফোন বেজে উঠল। গঙ্গাপ্রসাদ ব্যস্ত হাতে রিসিভার তুললেন, রোহিণীর মুখটা চট করে দেখে নিয়ে।

"হ্যালো, কে নির্মল ?" গঙ্গাপ্রসাদ ঘাড় নাড়লেন কাঠ হয়ে যাওয়া রোহিণীর দিকে তাকিয়ে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ শোভনেশ সেনগুপ্ত···অ, অ, হ্যাঁ··· হসপিটাল থেকে ? সে কি নাম বলতে পারছে না ? তাই কখনো হয় ··· দু'জন একসঙ্গে ? পুলিশ পাহারা কি ছিল না ?···কখন পালায় ?··· সন্ধেবেলা···কত তারিখে ? য়্যাঁ সে তো পাঁচদিন আগে। তুমি কি আর একটু

ডিটেইল খোঁজ নেবে ? চেহারা, বয়স, নাম, কি অসুখ, কতদিন জেলে রয়েছে···কেউ মুখ খুলছে না ? খুলবে খুলবে, সিলভার টনিক খাওয়াও··· হ্যাঁ, খুব দরকার আমার, খুবই··· হ্যাঁ বাড়িতে থাকব। ··· আচ্ছা, আচ্ছা, ও ও ও কে এ এ।"

রিসিভার রেখে দিয়ে তিনি শুধু তাকিয়ে রইলেন রোহিণীর দিকে। ভাবখানা, সবই তো শুনলে।

"হসপিটাল আর দু'জন, তার মানে ?"

"দুজন কয়েদিকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল। দুজনেই লাইফার, দুজনেই এক সঙ্গে পালিয়েছে। খবরটা চেপে যেতে চাইছে বলে নাম জানাচ্ছে না, অস্বীকার করছে।"

"পাঁচ দিন আগে পালিয়েছে ?"

গঙ্গাপ্রসাদ সচকিত হলেন। সর্দিতে গলা বসে যাওয়া বা তীব্র চিৎকারের শেষ প্রান্তে এসে দম ফুরিয়ে যাওয়ার মত ভেঙে পড়া কণ্ঠস্বর। মুখের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এই দু-তিন মিনিটের মধ্যেই বসে গেছে। তাঁকে তৃষ্ণার্ত, অভুক্ত এবং পরিশ্রান্ত লোকের মত দেখাচ্ছে।

"ও এখন কলকাতায়। কাল দুপুরে আমাকে খুঁজতে গেছিল।"

"কে এখন কলকাতায় ?" গঙ্গাপ্রসাদের কৌতূহলী এবং চমকিত অভিব্যক্তি একই সঙ্গে প্রকাশ হল। "কে খুঁজতে গেছিল, শোভু ?"

রোহিণী শুধু মাথাটা ঝোঁকাল।

"সেকি !" ভারী শরীরটা টেনে তুলে টেবলে ঝুঁকে পড়লেন। "তোমার ফ্ল্যাটে ? তুমি ঠিক বলছ ?"

রোহিণী চুপ করে রইল। ভাবহীন দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদের মুখে। নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে কী যেন আলোচনা সেরে নেওয়ায় মগ্ন।

"তুমি তো তখন ছিলে না ফ্ল্যাটে !"

"নতুন একটা কাজের মেয়ে রেখেছিলাম। সে ছিল।"

"রেখেছিলাম মানে ? এখন কি আর সে নেই ?"

রোহিণী মাথা নাড়ল।

"বরখাস্ত করেছ ? কেন ?"

রোহিণী চুপ। সে ঠিকই করে ফেলেছে, বেশি কথা আর বলবে না। নিজের সম্পর্কে কোন খবর আর কাউকে জানাবে না। অন্যদের খবর এবার থেকে সে নেবে। সেজন্য মিথ্যা কথা বলতে হলেও বলবে।

"সে কি বলল তোমায় ? শোভু তাকে কি বলেছে ?"

গঙ্গাপ্রসাদ টেবলে একটা চড় বসালেন, তাঁর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত, প্রায়-চিৎকারের মত একটা আওয়াজ গলা থেকে বার করে। তাঁর চোখে রাগের ছায়া, নাক ফুলে উঠেছে।

"শোভনেশ বলেছে আবার আসবে।"

"কেন ? তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক আর ? তোমার কাছে এসে কি লাভ ?"

"তা আমি জানি না, তবে আসবে। হয়তো কোন দরকার আছে।"

"কি দরকার, তোমার সঙ্গে তার কি দরকার ? টাকাপয়সা চাইবে ? কিন্তু ওর তো কোন টাকা নেই, সম্পত্তিও নেই। বাড়িটা একজনের কাছে মর্টগেজ ছিল, তোমাদের বিয়েরও আগে থেকে। খেতে পেত না, ছবিটবি কি আর এমন বিক্রি হত ? তোমরা ভাব,

আর্টিস্টরা লক্ষ লক্ষ টাকা ছবির বিক্রি থেকে পায়। আরে, সে তো এই ছ'-সাত বছর হল পাচ্ছে। তাও ভারতে মাত্র কয়েকজনই টাকা করেছে। শোভুর ছবি সবেমাত্র বাজার পাচ্ছে আর তখনই ও কাণ্ডটা করল। তার আগে ইলেকট্রিক বিল, বাড়ির ট্যাক্স বহুবার আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে দিয়েছে। পুরনো আমলের সব ভাড়াটে, ভাড়াও ছিল সামান্য, আট-দশ মাস করে ভাড়া ফেলে রাখত, ঠিকমত দিত না, তাই দিয়ে শুধু ভাতে ভাত খেয়ে চলত। ঝি চাকর পর্যন্ত ছিল না। তিন পুরুষ ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে কুঁজোর জল খেলে কিছু কি আর থাকে ? একটা ফোঁটাও আর ছিল না।...আমাকে বলেছিল, 'তোর ম্যাগাজিনের জন্য কিছু কাজ আমাকে দিয়ে করা। টাকার খুব দরকার।' করিয়েছিলাম...অচল অচল, ম্যাগাজিনের পক্ষে অচল।"

"ব্যাঙ্কে ওর টাকা ছিল।"

"ছিল, হাজার সতেরো। কোর্টে দরখাস্ত করে আমি ম্যান্ডেট হোল্ডার হই ওরই অনুরোধে। ও তখন জুডিসিয়াল কাস্টডিতে। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে করাতে. তাইতে ও প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিল। কি বলেছিল জান ?"

"না।"

"রোহিণীকে ভাল চিনি না, বুঝি না। ও বাইরের লোক, অল্পদিনের আলাপ। তুই আমার বহুকালের বন্ধু, বহুকালের চেনা। আমি তোর ওপরই নির্ভর করি। এই হচ্ছে শোভনেশ, তোমার স্বামী ! ব্যাঙ্কের টাকা মামলার জন্য উকিলকে দিয়েছি, আমি নিজেও অনেক টাকা খরচ করেছি। পাইপয়সা হিসেব রেখে দিয়েছি। যখন ওর ট্রায়াল চলছে, তুমি তখন দিগম্বর বর্ধন লেনের বাড়িতেই। কি করে তোমার থাকা-খাওয়া চলত, তার খোঁজ কি কখনো নিয়েছে ?"

"আমার ধারণা ছিল, শোভনেশের ব্যাঙ্কের টাকা আর ছবি বিক্রির টাকা—।" রোহিণী ইচ্ছে করেই বাক্য অসম্পূর্ণ রাখল। তার বদলে সে নজরটা তীক্ষ্ণ করে গঙ্গাপ্রসাদের হাবভাব লক্ষ করার কাজ শুরু করল।

"ছবি ! ছবিগুলো ?" ঝুঁকে গঙ্গাপ্রসাদ টেবলে বুক ঠেকালেন। যেন হামাগুড়ি দিয়ে ওধারে যাবেন। "ছবি কোথায় দেখলে ?"

"অনেক ছবি তো স্তূপ হয়ে ওর স্টুডিওতে পড়েছিল দেখেছি। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটার মত, নানান সাইজের। একদিন তো আপনি খানচারেক নিয়েও গেলেন, বললেন মামলার খরচ তোলার জন্য বিক্রির চেষ্টা করবেন।" অত্যন্ত নিরীহ, অনুগত কণ্ঠে, যাতে গঙ্গাপ্রসাদ আহত না হন, এমন ভঙ্গিতে রোহিণী বলল।

কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের মুখের ভাব নিমেষে বদলে থমথমে হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড রোহিণীর মুখের দিকে সরু চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুমি কি শোভনেশের বিষয়আশয় নিয়ে দাবি জানাচ্ছ ?"

"না না গঙ্গাদা, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার কোন লোভ নেই, আমি ওর একটা জিনিসও পেতে চাই না, ছুঁতেও চাই না।"

"তাহলে আজ এসব কথা উঠছে কেন ? ব্যাঙ্কের টাকা, ছবি বিক্রির টাকা, এসব কি তুমি এখন বলোনি ?'

"কথার পিঠে কথায় বলে ফেলেছি।"

"যে ছবিগুলো স্তূপ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলে, সেগুলির কি হাল হয়েছিল জান ?

পোকায় কেটে, ভাঙা জানলা দিয়ে বৃষ্টির জল এসে, তার একটারও আর টাঙাবার মত অবস্থা ছিল না। পাঁচটা পয়সা দিয়েও কেউ তা কিনত না।"

ঘরে কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা বিরাজ করল। রোহিণী মাথা নামিয়ে, গঙ্গাপ্রসাদ সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে।

"শোভু আবার আসবে, হয়তো আশ্রয় কিংবা টাকা চাইবে। কি করবে তখন ?"

"গঙ্গাদা, এসব কিছুই হত না যদি বিয়ে না হত। আপনি যদি তখন আমাকে একবারও বলতেন—।"

"কি বলতাম ?"

"ওদের পাগলের বংশ।"

"তোমায় কে বলল ?"

"গত চার পুরুষ ধরে কেউ না কেউ পাগল হয়েছে ওদের বংশে।"

"কে বলল তোমায় ?" গঙ্গাপ্রসাদ টেবলে চড় মেরে ধমকে উঠলেন। "এসব তো আমার কাছে নতুন কথা।"

রোহিণী বলতে যাচ্ছিল, সেদিন আপনার মুখ থেকেই কথাটা বেরিয়ে এসেছিল : 'পাগলের বংশ তো, দেখো, হয়ত গোয়াবাগান থেকে মোমিনপুর পর্যন্ত বোশেখ মাসে হেঁটে আসতে কেমন লাগে বোঝার জন্য হয়তো —নাও অপেক্ষা করে লাভ নেই, আমরা খেতে বসে যাই।' কিন্তু সে ঠিক করে ফেলেছে, বেশি কথা আর বলবে না। অন্যদের খবরই এবার থেকে নেবে নিজেকে আড়াল করে।

"কথা বলছ না যে ?"

"আমার উপরের ফ্ল্যাটে একজন মহিলা থাকেন, যিনি একসময় দিগম্বর বর্ধন লেনের ওই বাড়ির একতলায় ভাড়া ছিলেন। তিনিই আজ আমায় বলেছেন।"

গঙ্গাপ্রসাদ চোখের চাহনি ত্যারচা করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিলেন।

"বুঝেছি। ওদের একতলায় হাজব্যান্ড ওয়াইফের একটা ফ্যামিলি ছিল। বউটি সুন্দরী, শোভুরই বয়সী। আশ্চর্য, তিনিই এখন কিনা তোমার উপরের ফ্ল্যাটে ! কি অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু ওরা বাড়ি ছেড়ে উঠে গেল কেন ?"

"ওঁর স্বামী বদলি হলেন, তাই বাসা ছেড়ে দেন।"

বিন্দু বিন্দু হাসি গঙ্গাপ্রসাদের ঠোঁটের কসে জমে উঠল। তারপর ঠোঁটটা চওড়া করে সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাতের আঙুলের মধ্যে আঙুল জড়িয়ে নিলেন।

"তাই বলেছে বুঝি ?"

রোহিণী একটু অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ, তাই তো বললেন।"

"মিথ্যেবাদী।" গঙ্গাপ্রসাদ একটা খুদে আগ্নেয়গিরির মত হয়ে, জ্বালামুখ থেকে লাভাস্রোত বার করলেন। "সী ইজ এ লায়ার। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পরও কিনা মিথ্যা কথা বলছে ! শোভনেশের আজকের এই অবস্থার জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তাহলে ও-ই সেই লোক, যার থেকে এই মার্ডারের প্রথম সূত্রপাত।"

রোহিণীকে এখন যদি কেউ বলে, কাল থেকে কলকাতার ফুটপাথে একটিও হকার বসবে না, রাস্তাগুলোয় একটিও খানাখন্দ, ঢিপি থাকবে না, হাওড়া ও শেয়ালদা থেকে লোকাল ট্রেন কাঁটায় কাঁটায় সঠিক সময়ে ছাড়বে এবং পৌঁছবে, সে বিশ্বাস করতে রাজি। এমনকি যদি তাকে বলা হয়, গাওস্করের সব ব্যাটিং রেকর্ড রাজেন ভেঙে দেবে, তাও সে

বিশ্বাস করবে। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ যা বললেন, তার তো কোনও মাথামুণ্ডু সে হদিশ করতে পারছে না।

"কি বলছেন গঙ্গাদা! কি শান্ত নিরীহ্ ভদ্রমহিলা, এই বয়সেও কি সুন্দরী, মার্জিত, পরিপাটি ব্যবহার, আর আপনি বলছেন মার্ডারের পিছনে এঁর হাত রয়েছে? কিভাবে সম্ভব?"

"মেয়েদের শরীরের প্রতি শোভনেশের যে ঝোঁক, যে আগ্রহ, যে দুর্বলতা, যেটা ওকে ন্যুড স্টাডির দিকে টেনে নেয়, যেটা ওকে মেয়েদের দেহ সম্পর্কে বাতিকগ্রস্ত করে তোলে, আর তারই ফলে মডেলের সঙ্গে নানারকম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, ইনভলভমেন্ট, সবশেষে যা কালমিনেট করে মার্ডারে, এর গোড়াপত্তন ওই তোমার উপরের মহিলাটি থেকেই। কি নাম ওঁর?"

"জানি না। তবে ওরাও বদ্যি।"

"ওঁর নাম সুজাতা গুপ্ত, ওঁর স্বামীর নাম হৃদয়রঞ্জন গুপ্ত। লোকটি স্ত্রীর মতোই ছোটখাটো, বেঁটে, কিন্তু গায়ের রঙ স্ত্রীর বিপরীত, ঘোর কালো আর ডান পা-টা ছোট একটু, খুঁড়িয়ে হাঁটেন।"

রোহিণীর শিরদাঁড়া বেয়ে সিরসিরানিটা চেয়ারে পৌঁছল। অবিশ্বাস্য বলে কোন শব্দ যে এই গ্রহের কোনও অভিধানে আছে, আর সে তা মানতে পারছে না! এখন সে বিশ্বাস করতে রাজি, তুলে দেওয়া হকাররা আবার ফুটপাতে ফিরে আসবে না বা বিনা টিকিটে কেউ লোকাল ট্রেনে উঠবে না। গঙ্গাদা যা বললেন, ঠিক ওই রকমই মিশকালো, সামান্য খোঁড়া, নিরীহদর্শন এক বেঁটে লোককে সে কয়েকবার তাদের বাড়ির সিঁড়িতে দেখেছে।

"এই পরিবারের সঙ্গে শোভুর খুবই হৃদ্যতা হয়, বিশেষ করে সুজাতার সঙ্গে। ভিজে কাপড় মেলা বা তোলার ছল করে উনি দিনে দু-তিনবার উপরে যেতেন। শোভুর আঁকার ঘরে, পরে যেটাকে ও স্টুডিও বলত, সেখানে উনি গিয়ে গল্পটল্প করতেন। শোভুও ওদের ঘরে যেত। উনি প্রায়ই আবদার ধরতেন, ওঁর একটা ছবি এঁকে দেবার জন্য। ওঁর কয়েকটা পোর্ট্রেট স্কেচও করেছিল। সেগুলো অবশ্য ওঁকে দিয়ে দেয়। কিন্তু উনি চান ফুল ফিগারের ছবি, ক্যানভাসে। শোভু করছি করব বলে এড়িয়ে যাচ্ছিল। একদিন নিচে ওদের ঘরে গিয়ে সে সুজাতাকে—"

টেলিফোন বেজে উঠেছে।

"হ্যাঁ বলছি, আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমি ব্যস্ত, পরে কথা বলব।"

রিসিভার রেখে গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "অত বছর আগের কথা, শোভু আমায় যা বলেছিল, তাই বলছি। ও তো ভাল করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, খাপছাড়াভাবে বলেছিল। আমারও এখন সব মনে নেই।"

গঙ্গাপ্রসাদ কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে থেকে বললেন, "শোভুর তখন সবে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু ছবিই তখন ধ্যানজ্ঞান। নামকরা মাস্টারদের ছবির অ্যালবাম এখান-ওখান থেকে চেয়ে এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টাডি করত, কপি করত। একটা কালেকশন এনেছিল, যাতে শুধুই মেয়েদের চান করার ছবি। নাম ছিল 'বেদারস'। পৃথিবীর বিখ্যাত দশজনের আঁকা আঠারোটা ছবি। সবই ন্যুড, সেমি ন্যুড।

"আর একটা অ্যালবাম ওর কাছে ছিল, নাম 'রিক্লাইনিং উওম্যান'। বিছানায়, সোফায়, ডিভানে নানা ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে শোয়া ন্যুড মেয়েদের ছবি। অয়েলে পেন্সিলে প্যাস্টেলে আঁকা। এতে ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট বালথাসের আঁকা একটা ছবি, নাম 'দ্য রুম'

শোভুকে খুব আকর্ষণ করে। আমি ছবিটা দেখেছি। একটা ন্যুড মেয়ে ডিভানে চিত হয়ে হেলান দিয়ে, ডান-পা মেঝেয় লম্বা করে ছড়ানো, হাঁটু মুড়ে বাঁ পা-টা ডিভানে উঁচু করে তোলা, ডান হাতটা আলগাভাবে ঝুলে রয়েছে, তার মাথাটা বোধহয়···যতদূর মনে পড়ছে, পিছনদিকে করা, মুখটা সিলিংয়ের দিকে তোলা, কিংবা মুখটা সম্ভবত ডানদিকে ফেরানো··ঠিক মনে করতে পারছি না। ঘরের বিরাট উঁচু জানালার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বেঁটে বামনাকৃতির মেয়ে, মুখটা তেকোনা। প্রখর আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েছে ন্যুড ফিগারটার উপর। ঘরের অন্ধকার কোণে টুলের উপর বসে আছে একটা কালো বেড়াল। ছবিটা অয়েলে আঁকা। ভীষণভাবে শোভুকে তখন ছেঁকে ধরেছিল চিন্তাটা, এই রকম একটা ছবি তাকে আঁকতেই হবে। আমায় বলেছিল, দিনরাত ছবিটা হন্ট করছে, রাতে ঘুমোতে পারি না। জিজ্ঞাসা করত. মেয়েটা ডেড না অ্যালাইভ, তোর কি মনে হয় ? আমার কিন্তু মনে হয়েছিল···থাক তোমাকে তা আর বলা যায় না।"

"না না বলুন।" রোহিণী আগ্রহভরে বলল। তার উপরের ফ্ল্যাটের মহিলা সম্পর্কে জানার জন্য যে কৌতূহলটা চারাগাছের মতো গজিয়ে ছিল, সেটা এখন ডালপালা ছড়ানো একটা তদন্তের বিষয় হয়ে উঠেছে। গঙ্গাদা যা বলছেন, তাতে তো দু'জনের কথার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে ! দুজনেই ষাটের উপব. এই বয়সে ইচ্ছে করে তথ্য বিকৃতি কেউ করে না। কিন্তু একজন অবশ্যই করছে। কিন্তু কেন ?

"না থাক, ওটা খুব জরুবি কিছু বলাব কথা নয়।"

"সেক্সুয়াল কিছু কি ?"

"ওই রকমই। মুখটা আবছা অন্ধকাব মাখানো, শবীবের ভঙ্গিতে মনে হয়েছিল রিল্যাক্সড অবস্থায় কিছু একটা যেন এনজয় কবছে। যাকগে···আমাদের যা কথা হচ্ছিল, কি যেন বলছিলাম ?"

"শোভনেশ ছবির অ্যালবাম চেয়ে এনে স্টাডি করত, কপি করত।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ···একদিন বেদারস নামের অ্যালবামটা খুঁজে পেল না। চেয়ে আনা পরের জিনিস, দুষ্প্রাপ্যও। খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে নিচে এল। সুজাতা স্টুডিওতে আসে, হয়তো সেই নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, এই ভেবেই শোভু গিয়েছিল। ওদের ঘরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়ায়। বালথাসের ছবিটার মতোই ঘরটা আধো অন্ধকাব, শুধু জানলাটা দিয়ে আলো এসে পড়েছে খাটে, আর সুজাতা ঠিক সেই ন্যুড মেয়েটার মতো বালিশে পিঠ দিয়ে আধবসা অবস্থায়, মাথা পিছনে হেলিয়ে ঘরের সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে। বাঁ হাতটা ঝুলছে খাট থেকে। ডান হাঁটুটা মুড়ে উঁচু করা। তবে সুজাতাব শরীর একটা চাদবে ঢাকা ছিল।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অন্তত মিনিট পাঁচেক ধরে সে তাকিয়েছিল। তখন মনের মধ্যে কিছু একটা ঘটে যায়।"

"কি ঘটে ?"

"সেটা আর ব্যাখ্যা করে আমায় বলেনি। শুধু বলেছিল, 'এই ঘরটাকেই যেন বালথাসের রুম মনে হল।" অ্যালবামটার কথা জিজ্ঞাসা করতে সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ সে নিয়ে এসেছে। বালিশের নিচে রয়েছে, শোভু বার করে নিক। তার নিজের উঠে বার করে দেবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা না থাকার কারণ, স্বামী এমন বেধড়ক পিটিয়েছে যে, নড়ে বসার জোরটুকুও আর নেই।"

রোহিণীর মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল আঁতকে ওঠার মতো। "বলেন কি।

লোকটাকে যতটা দেখেছি, তাতে তো খুব শান্ত, ভীরু ভীরু মনে হয়েছে।"

"এই ধরনের লোকেরা শান্তশিষ্ট মার্কাই হয়। জেলাসি থেকেই এই হিংস্রতা। পছন্দ করত না সুন্দরী বৌ একটা সুদর্শন ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করুক বা কথা বলুক। অন্তত হৃদয়রঞ্জনের থেকে শোভু অনেক আকর্ষণীয় ছিল। অনেকবারই এই নিয়ে ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে, লোকটা চড়চাপড়ও মেরেছে, কিন্তু বৌ জেদ ধরেই স্বামীকে অগ্রাহ্য করে ওপরে গেছে। এরপর ঘরে অ্যালবামটা দেখেই লোকটা ক্ষেপে যায়। ওই রকম সব ছবি যে-মেয়েছেলে দেখে, তার তো চরিত্র বলে কিছুই নেই, সে তো সন্ধেবেলায় মুখে রঙ মেখে বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটও খেতে পারে! শুরু হয় তর্কাতর্কি, তারপর লাঠি দিয়ে পেটানো।

"সুজাতা গলা থেকে চাদর নামিয়ে শোভুকে দেখায়, তখন ওর উর্ধ্বাঙ্গে কোনও বস্ত্র ছিল না, মারের দাগড়া দাগড়া দাগ থেকে বোঝা যাচ্ছিল, কি ভয়ঙ্কর বীভৎস রাগে লোকটা জ্বলছিল। দেখতে দেখতে শোভুর ব্রেইনে শর্ট সার্কিট হয়ে সে হঠাৎ সব অন্ধকার দেখতে থাকে।

"আমাকে ও বলেছিল, 'ইলেকট্রিক বাল্‌ব ফিউজ হবার সময় যে রকম একটা শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম যেন একটা শব্দ মাথার মধ্যে হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, অবশেষে আমিই তাহলে পাগল হলাম।' সেই অবস্থাতেই ও সুজাতাকে বলে, 'ঠিক এইভাবে হেলান দিয়ে শোয়া তোমার ছবি আঁকব, পাগল হয়ে যাবার আগে।'

"দিন সাতেক পর থেকে সুজাতা দোতলার স্টুডিওতে সিটিং দিতে শুরু করে।" গঙ্গাপ্রসাদ কথা থামিয়ে রোহিণীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে যোগ করলেন, "ন্যুড হয়ে।"

দপ করে রোহিণীর চোখের উপর ভেসে উঠল ষাট বছরের এক মিষ্টি শান্ত মহিলার মুখ! আশ্চর্য! কে বলবে উনি চল্লিশ বছর আগে এমন দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন!

"স্বামীকে উপেক্ষা জানাবার জন্যই বোধহয়।"

"তার থেকেও বেশি, ঘৃণা প্রকাশের জন্য। শোভুর মনে একটা বিশ্বাস তারপর বদ্ধমূল হয়ে যায়। সে যে পাগল হল না তার কারণ, ন্যুড মেয়ের ছবি আঁকার জন্য। ওর মনে হল এটা একটা তুক্। নিজেকে রক্ষা করার জন্য এটা তাকে করে যেতেই হবে।

"ওরা পাগলের বংশ এ কথাটা ঠিক নয়। সুজাতাই বোধহয় তোমাকে বলেছে। কিন্তু ওকে এই ধারণাটা সম্ভবত শোভুই দিয়েছিল এই বলে যে, সে পাগল হয়ে যাচ্ছিল শরীরে ওই রকম অত্যাচারের নমুনা দেখে। আমাকেও তাই বলেছে। একটা ইন্সট্যান্ট রিয়্যাকশন থেকেই ও বলে ফেলে আর সেটাকেই কল্পনায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সুজাতা গুপ্তর মনে হয়েছে পাগলের বংশ! ক্র্যাপ, ব্লাডি ট্র্যাশ, মিথ্যাবাদী।"

"ওঁর কটা ছবি শোভনেশ এঁকেছিল?"

"ওই একটাই, কেননা স্বামী জানতে পেরে যায়। একদিন সকালে লোকটি উপরে স্টুডিওয় এসে বৌয়ের ওই রকম ছবি দেখে ক্যানভাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফ্রেম ভেঙে ফেলে ছবিটাকে দুপায়ে মাড়িয়ে শেষকালে শোভুকে অ্যাটাক করে। আমার বাড়িতে নিত্য নামে একজনকে তুমি বোধহয় দেখেছ, মনে আছে কি?"

"হ্যাঁ, খুব রোগা, টাক মাথা, কথা একটু বেশি বলে।"

"এখন বাসুদেবপুরে থাকে। বাড়ি জমিজমা সব ওর জিম্মেতেই রয়েছে, চোর নয়। বাচ্চা বয়স থেকে শোভুদের বাড়িতে চাকর ছিল। অবস্থা পড়ে যেতে ওরা ছাড়িয়ে দেয়,

আমি নিয়ে আসি। বনেদি বাড়ির পুরনো লোকজন এক রেয়ার অ্যান্টিক, সাজিয়ে রাখার জিনিস। তা সুজাতার স্বামী যখন পেপার ওয়েট দিয়ে শোভুকে মারতে যায় তখন নিত্য ওখানে ছিল, সে-ই হাতটা চেপে ধরে, ঠেলে ঘর থেকে বার করে দেয়। এর দু-মাসের মধ্যেই লোকটা অফিসের ট্রান্সফার নিয়ে কোথায় যেন বৌ নিয়ে চলে যায়।"

"জলন্ধরে, আমায় তাই বলেছেন। আচ্ছা, শোভনেশের তো তখন বিয়ে হয়ে গেছে। ওর বৌয়ের কোনও রিয়্যাকশন হয়নি?"

"হয়তো হয়েছিল। কমলা ভীরু, নিরীহ, কুনো ধরনের ছিল। চির রুগ্ণ। সাত চড়ে রা কাড়ত না। ও বাড়িতে অতবার গেছি, একবারও চোখে দেখতে পাইনি। বাইরের ঘরেও আসত না।"

"কিভাবে মারা গেল?"

"প্রেগনান্ট ছিল। বাথরুমে পিছলে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড হেমারেজ হয়। ক্যাম্বেল হাসপাতালেই মারা যায়।"

রোহিণী আবার ধাক্কা খেল। কমলার মৃত্যুর তিন নম্বর কারণ এটা। শোভনেশ বলেছিল ম্যালিগন্যান্ট টাইফয়েড, সুজাতা গুপ্ত বলেছেন দোতলা থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে এবং তাঁর সন্দেহ এটা নিছকই আত্মহত্যা নয়। আর গঙ্গাদা বলছেন অ্যাকসিডেন্ট! কিন্তু সে তো ঠিক করেই ফেলেছে, কথা না বলে নিজেকে আড়ালে রাখবে। তাই বিস্ময় গোপন করে রইল। একটু আগেও সে বিস্ময় গোপন করেছে, যখন গঙ্গাদা বললেন, শোভনেশদের পাগলের বংশ নয়। অথচ সিধারথ সিনহা তালিকা দিয়ে উল্টোটাই লিখেছে, সুজাতা গুপ্তও বলেছেন, পাগল হবার ভয়ে শোভনেশরা সিঁটিয়ে থাকত।

'ভস্মীভূত শিল্পীদের' বাকি অংশটুকু পড়া বাকি রয়েছে। রোহিণী এখনই পড়ে ফেলার ইচ্ছায় চনমন করে উঠল। আরো কত অজানা খবর লেখাটায় লুকিয়ে রয়েছে কে জানে! ঝুলির মধ্যে ম্যাগাজিনটা, হাত ঢুকিয়ে তবু সে জেনে নিল রয়েছে কিনা। গঙ্গাদা কি এটা পড়েছেন? কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কত রকমের কাঁড়ি কাঁড়ি ম্যাগাজিন যে এখন বেরোচ্ছে, সব কি কেউ পড়ে উঠতে পারে? ইস্টার্ন ম্যাগাজিন বহু রকম পিরিওডিক্যালই কেনে। এইটে,...আহ্ নামটা এখনও জানা হয়নি, মলাটটাই ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে, এইটে কেনা হয় না। হলে তার চোখে পড়তই।

রোহিণী যখন এই সব ভেবে চলেছে, গঙ্গাপ্রসাদ তখন কলম দিয়ে প্যাডে নিজের নাম সই করছেন আর ঘসে ঘসে সেটা কাটছেন অন্যমনস্ক হয়ে।

আবার ফোন বেজে উঠল। গঙ্গাপ্রসাদ রিসিভারটা কানে দিয়েই বাড়িয়ে ধরলেন, "তোমার।"

রোহিণী হাতে নেবার সময়ই বুঝে গেছে ওধারে কে।

"বলছি।...একটু বসো, এখনি আসছি।"

"তাহলে তুমি তো...আমায় তো ভাবনায় রাখলে। পাঁচদিন আগে হসপিটাল থেকে দুজন পালিয়েছে। তাদের একজন যদি শোভু হয়, তাহলে ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু চিনে তোমার ওখানে গেল কি করে? ঠিকানাটা পেল কোথা থেকে?"

গঙ্গাপ্রসাদের মতো রোহিণীও জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল। কারুর কাছেই উত্তর জানা নেই। রোহিণী ঝোলাটা কাঁধে চড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। "আমি এখন আসি।"

"তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে থাকতে পার, কিংবা বাসুদেবপুরে। সাক্ষি দেবার সময়

তুমি যে সব কথা বলেছিলে, আর তাইতে ও যে ভাবে রিঅ্যাক্ট করে, সেটা আমিও লক্ষ করেছি। এখন তোমাকে সেফটির কথা ভাবতে হবে।

"আমার উপরে একজন পালোয়ান থাকে। চিৎকার শুনলেই তিন লাফে হাজির হয়ে যাবে।"

"ভোলা সাউকে কি তোমার সঙ্গে দেব আজ রাতের জন্য ?"

"না না ওসবের দরকার নেই। ওখানে দারোয়ানের একটা লোহার রড আছে দেখেছি, সেটা চেয়ে নেব। দরজা খোলার আগে দেখে নেব লোকটা কে ! যদি ও হয়, তাহলে খুলবই না।"

রোহিণী বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে, গঙ্গাপ্রসাদ ডাকলেন, "একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া ভাল, শোভুর কোনও সম্পত্তি আর নেই। না বাড়ি, না ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, না ছবিটবি।"

"আমি তো বলেই দিয়েছি, ওর একটা কানাকড়িও আমি ছোঁব না। শুধু একটাই বলার ছিল, যদি বিয়ের আগে জানতাম"—রোহিণী বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বন্ধ দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গঙ্গাপ্রসাদের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

আলমারি ঘেরা অফিসের জায়গাটায় একটা চেয়ারে রাজেন বসে। রোহিণীকে দেখে উঠে পড়ল।

"হয়ে গেছে, চলো। গাড়ি এনেছ ?"

"হ্যাঁ।"

ওরা বেরোচ্ছে, তখন কমলের সঙ্গে দেখা।

"এখন কেমন আছে ?"

"ভালই। কাল কি পরশু ছেড়ে দেবে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রোহিণী বলল, "বাসের ধাক্কা খেয়ে কাল ওঁর ছেলের পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙেছে। ছেলেটি ইংরাজিতে এম এ পড়ছে। উনি এখানকার বেয়ারা। ইলিশ মাছ উনিই বাজার থেকে সকালে এনে দিয়েছেন।"

রোহিণীর মন্থর স্বরে শ্রান্তির রেশ। রাজেন আড়চোখে মুখের দিকে তাকাল। কিছু একটা সিরিয়াস ধরনের ব্যাপার যে ঘটেছে, সেটা বুঝতে পারছে। সে কথা বলল না।

একটু দূরে গলির মধ্যে গাড়িটা রাখা। কালো শরীরের, একত্রিশ বছরের পুরনো হিলম্যান। বহু জায়গায় রঙচটা, সামনের একটা মাডগার্ড তোবড়ানো। পিছনের দরজার একটায় দড়ি বাঁধা। এঞ্জিন, চারটে চাকা, ব্রেক ও হর্ন ছাড়া হিলম্যানের বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর মালিকের নিয়ন্ত্রণের কোনও গ্যারান্টি নেই। রাজেন ছাড়া আর কেউ এই গাড়ি চালাতে ভরসা করে না।

গাড়ির পিছনের সিটে পলিথিন মোড়া কয়েকটা পুঁটলি। সামনের দরজা খুলে সিটে বসার সময় রোহিণী ওগুলো দেখে বলল, "কি, কিনলে ?"

"ক'টা ছোটখাট জিনিস, একটা টি-শার্ট, তোয়ালে, ব্রেড।"

রাজেন স্টার্ট দেবার জন্য চাবি ঘোরাল। কয়েকবার কঁকিয়ে উঠে হিলম্যান জানিয়ে দিল সে অসুস্থ। রোহিণী সারা দিনে এই প্রথম হাসতে শুরু করল। প্রথমে নিঃশব্দে তারপর চাপা খুক্‌খুক্ করে।

"নামবো ?"

"কেন ?"

"ঠেলতে হবে তো ?"

"সারা দিনই ওবিডিয়েন্ট ছিল। যেই তুমি উঠলে—" বলতে বলতে বিব্রত রাজেন নামল। "কার্বুরেটরটায়—"। এঞ্জিনের বনেট তুলে সে ঝুঁকে পড়ল। একটু পরই বনেট নামিয়ে হাতে পেট্রলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফিরে এসে চাবি ঘোরাল। বার কয়েক কেশে নিয়ে হিলম্যান চলতে রাজি হল।

"বুড়ো হয়ে গেছে, রিটায়ার করিয়ে দাও।"

"এঞ্জিনটা ওভারহল করিয়ে, বডিটাকে রঙ করিয়ে নিলে দেখবে মারুতি ছোকরারাও আমার বুড়োর সঙ্গে পারবে না।" রাজেনের গলায় চাপা অভিমান এবং ক্ষোভও।

"করাচ্ছ না কেন ?"

"টাকা নেই।"

টিরেট্টা বাজার আর চিৎপুরের মোড়ে ট্র্যাফিকের জন্য গাড়ি দাঁড় করাতে হয়েছে। ওরা পুবদিকে এগিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুতে পড়ে বাঁদিকে ঘুরল। গিরিশ পার্ক পর্যন্ত গিয়ে ডানদিকে বেঁকে তারপর বিবেকানন্দ রোড ধরে সোজা যাবে।

"নেই কেন ? হাজার তিনেক তো অফিস মাসে মাসে দিচ্ছে। কিপ্টেমিটা একটু শেখো, এটা শেখার জিনিস, একটা আর্টও বটে। বাড়িতে দাওটাও কিছু ?"

"মাকে হাজার দিই। বাকি দু'হাজার নিয়ে কিপ্টেমির আর্ট চর্চা করা যায় না। বড়দা তার অ্যাম্বাসাডার বেচে মারুতি কিনেছে। আমাকে বলল, তোমার মতোই বিদ্রূপ করে, এবার এটাকে রেহাই দে। টাকা দিচ্ছি, একটা নতুন কিছু কিনে নে। আমার ক্লার্কেরও যে এর থেকে ভাল গাড়ি রয়েছে। ব্যারিস্টার দাদা, কি আর বলব ! একবার জজের সামনে দাঁড়ালেই আমার মাইনের টাকা মক্কেলের পকেট থেকে তুলে নেন।"

"আমি বিদ্রূপ করিনি মোটেই। মায়া হচ্ছে বলেই বললাম।"

"এখনকার চাকরিটা ছাড়ব ঠিক করেছি। খেলার জন্যই এতদিন ভাল ভাল অফার পেয়েও যাইনি। ওসব জায়গায় নাকে দড়ি দিয়ে খাটায়, খেলার জন্য ছুটিছাটা পাওয়া যাবে না। একটু আগে বুড়োকে রিটায়ার করাতে বললে, তাই মনে পড়ল। এবার নিজের কেরিয়ার দেখতে হবে। এবার খেলা ছাড়ব, এটাই শেষ সিজন। সম্ভব হলে ক্লাব ক্রিকেট ছাড়া আর কিছু নয়। বি সি আই একটা খুব বড় কেব্‌ল তৈরির কোম্পানি।"

ট্র্যাফিক ছেড়ে দিয়েছে। মন্থর গতিতে সামনের গাড়িকে অনুসরণ করে রাজেন হুঁশিয়ারভাবে হিলম্যানকে নিয়ে এগোচ্ছে। এঞ্জিন চালু না থাকলে আবার কি মুশকিলে এই ভিড়ের মধ্যে ফেলে দেবে কে জানে !

"কম্পুটারে, টেলি কমিউনিকেশনে, পাওয়ার স্টেশনে, ডিফেন্সে, স্যাটেলাইট লাঞ্চিংয়ে, রেলওয়েজে, এই রকম বহু কাজে এদের তৈরি ওয়্যারস অ্যান্ড কেবল্‌সের ব্যবহার হয়। এখন এক্সপ্যানশন প্রোগ্রাম নিয়েছে। পেট্রোলিয়াম জেলি ফিল্ড কেব্‌লস আর কয়েল কর্ড তৈরির জন্য, এসব টেলিফোন ইন্সট্রুমেন্ট-এ লাগবে। ওদের প্রোডাকশন ডিভিশনে জয়েন করব সামনের এপ্রিলে। পাঁচ হাজার মাসে, প্লাস গাড়ি, প্লাস ফ্ল্যাট। যাদবপুর থেকে বি টেক্ করে বেরোবার পরই জোকায় যদি তখন এম বি এ করার জন্য অ্যাডমিশান নিতাম আর এই ক্রিকেটের নেশায় না পড়তাম, তাহলে এখন বছরে লাখ টাকা স্যালারি তো হতই।"

"এইসব হা-হুতাশ কবে থেকে শুরু করেছে ? আমাকে তো কখনো বলোনি ?"

"এসব কাউকে বলা যায় না। একদিন তো বিয়ে হবে, ফ্যামিলি হবে। ক্রিকেটে এত রান জমা হয়নি যে, তাই ভাঙিয়ে জীবন চলে যাবে।"

"বিয়ে করছ ? কাকে ?"

"নিশ্চয়ই একটা মেয়েকে।...ভাল কথা, তখন ফোনে বললে নানা রকম চাপ, শরীর-মন ক্লান্ত, ব্যাপার কি ?"

"বলছি, রাস্তাটা পেরিয়ে নাও।"

মহাত্মা গান্ধী রোড পেরিয়ে আসার পর রোহিণী বলল, "কাল খবরের কাগজে একটা পাঁচ-ছ লাইনের খবর পড়ার পর থেকেই অদ্ভুতভাবে সময় কাটছে। অবাস্তব অথচ ভয়ের একটা জগতে আমি যেন ঢুকে পড়েছি। শোভনেশ বহরমপুর জেলে আছে, তোমায় তো বলেছি, ওই খবরে রয়েছে বহরমপুর জেল থেকে এক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া আসামী পালিয়েছে।"

"তাই নাকি ?" রাজেন আদৌ চমকাল না। চোরবাগানের কাছাকাছি এসে গেছে। জায়গাটাকে কলকাতার রাজস্থান বলা যায়। এখানে ট্র্যাফিকের নিয়মকানুন রাজস্থানী মতে চলে। সে রিক্সা, ঠেলা, টেম্পো ইত্যাদির ঔদাসীন্যের প্রতি সম্ভ্রম দেখাতে এখন যত্নবান। রোহিণীর জন্য কান ছাড়া আর কিছু এখন পাতা সম্ভব নয়।

"বেশ তো, পালাবার সুযোগ পেলে ছাড়বে কেন ?"

"কিন্তু সে শোভনেশ।" রোহিণী অধৈর্য হয়ে গলা তীক্ষ্ণ করল।

"তুমি ঠিক জান ?"

রোহিণী অপ্রতিভ হয়ে, কিছু একটা বলার চেষ্টা কবেও আর বলল না।

"নাম দিয়েছে ?"

"না।"

"ডেসক্রিপশন ? কিসের আসামী ছিল ?"

"না, সেসব কিছুই নেই। গঙ্গাদা বহরমপুবে একজনকে ট্রাঙ্ক কলে খোঁজ নিয়েছেন' সে বলল একজন নয়, দুজন যাবজ্জীবনের আসামী পালিয়েছে, তাও হাসপাতাল থেকে।"

রাজেন শিস দিয়ে উঠল। "সাবাস, দুজন তাহলে ! তোমার ধারণা, এদেব মধ্যে একজন অবশ্যই শোভনেশ ?"

"যাবজ্জীবন পাওয়া লোক কি গণ্ডা গণ্ডা পাওয়া যায় ?"

"কাগজ পড় ? খুঁটিয়ে পড় কি ? আইন আদালতের কলামে চোখ ফেললেই বুঝতে পারবে, জজ হাকিম বিচাপতিরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় লিখতে লিখতে হাতে টেনিস-এলবো করে ফেলেছে। গাদা গাদা খুন, ধর্ষণ, বৌ মারা !"

"কিন্তু আমার মন বলছে শোভনেশই পালিয়েছে, আর সে এখন আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে। কাল একটা লোক দুপুরে ফ্ল্যাটে গিয়ে আমার খোঁজ কবেছে। তার যা বর্ণনা শুনলাম, হুবহু শোভনেশ।"

এইবার রাজেন উদ্বিগ্ন হল। কাল ইডেনে সে রোহিণীকে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে দেখেছিল। এখন তার কারণটা বুঝতে পারছে। হঠাৎই অকারণে রেগে উঠেছিল, আবেগভরে দু-চারটে কথা বলেছিল। মানসিক ভারসাম্য হারালে মানুষ যেমন আচরণ করে, তাই করেছিল। অথচ ও যথেষ্ট টাফ মেয়ে, সাহসীও।

গাড়ি গিরিশ পার্ক থেকে ঘুরে সিমলের কাছাকাছি। রাজেন স্টিয়ারিং ছেড়ে দুহাত

মাথায় ঠেকিয়ে কারু উদ্দেশে যেন প্রণাম জানাল। রোহিণী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

"দুজন বাঙালি প্রায় একই সময়ে জন্মেছিলেন, তাঁদের জন্মভিটের ঠিক মাঝামাঝি পয়েন্ট এই জায়গাটা, তাই একটা নমস্কারেই কাজ সারলাম।" আড়চোখে রোহিণীর দিকে তাকিয়ে রাজেন বলল, "এবার রবীন্দ্রনাথের এলাকা ছেড়ে বিবেকানন্দের এলাকায় ঢুকলাম।"

"জানি। ছোটবেলায় বাবা আমাদের দু-বোনকে এনে দেখিয়ে গেছলেন বাড়ি দুটো। এরপর দীনবন্ধু মিত্র, ডি এল রায়, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, এ রকম অনেকের বাড়ির অঞ্চল পড়বে রাজেন, তুমি বাপু কাজ সারতে আর স্টিয়ারিং ছেড়ো না।"

"পুণ্য অর্জনেও বাধা!" রাজেন স্বগতোক্তি করল রোহিণীকে শুনিয়ে। "ভেবেছিলাম মানিকতলা মোড় পেরোবার সময় দূর থেকেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দিকে একটা—।"

বিধান সরণির মোড়। ট্র্যাফিকে হিলম্যান দাঁড়িয়ে গেল। রোহিণী নিচু স্বরে বলল, "রাজেন, অদ্ভুত ব্যাপারটা কি জান? একটা ভয়, ছমছমে একটা অনুভব সত্যিই হচ্ছে। কিন্তু তার থেকেও বেশি আমি বিভ্রান্ত। টোটালি কনফিউজড। উল্টোপাল্টা কথা শুনছি একই ঘটনার।"

এই বলে সে সুভাষ গায়েন, উপরের সুজাতা গুপ্ত, গঙ্গাপ্রসাদ আর 'লালসার আগুনে ভস্মীভূত শিল্পীরা' থেকে যা শুনেছে এবং পড়েছে, সবই একে একে রাজেনকে বলল। এমনকি নন্দার কাছে শোনা 'ছেলেধরার মতো' লোকটার কথাও বলল। আর হিলম্যান ততক্ষণে মাণিকতলা মোড় পেরিয়ে, খালের ব্রিজ, বাগমারি, ছাড়িয়ে কাঁকুড়গাছি মোড় থেকে বাঁ দিকে ঘুরেছে।

"এইবার বলো, এখন আমি কী করব?"

"বলছি। আচ্ছা এই হাসপাতালটার পাশ দিয়ে সল্টলেকে যাবার রাস্তা আছে না?"

"হ্যাঁ আছে।"

রাজেনের হিলম্যান আচার্য সত্যেন বোস সরণি থেকে ডানদিকে বেঁকে ট্রাম লাইন অতিক্রম করে মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালের পাশের রাস্তা ধরল। সন্ধে হয়ে এসেছে, রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। বাঁদিকে দেবদারু গাছের বাগানওয়ালা গোলাপি রঙের বাড়ি, বোস ইন্সটিটিউট।

"একটু দাঁড়াও তো এখানে।"

হিলম্যান থামল।

"ওই বাগানের মধ্যে একজনের একটা কালো বাস্ট রয়েছে মুখটা নিচু করা, হাতে চারাগাছের দুটো পাতা। দারুণ মূর্তি! পুণ্যি করতে আর বাধা দেব না। ফার্স্ট বলে বোল্ড হয়ে এসে তারপর যে বলবে, আমার জন্যই— নাও কাজ সারো।"

"কিন্তু কে?" ভ্রূ তুলে, বড় বড় চোখ করে রাজেন তাকাল।

"তার মানে! ভারতবর্ষে একটা মানুষের হাতেই তো গাছের পাতা থাকতে পারে!"

"আমি বিভ্রান্ত! কনফিউজড!" তারপরই "মাই গড" বলে সে ধড়মড়িয়ে দরজা খুলে নেমে, ছুটে বাগানের রেলিংয়ের কাছে গেল। মিনিটখানেক পর ফিরে এসে স্টিয়ারিং ধরে ফিসফিস করে বলল, "গাছেরও প্রাণ আছে, মানুষের মতোই।"

"মানুষও যদি গাছের মতো হত। মেঘ তৈরি করিয়ে, অক্সিজেন দিয়ে, ছায়া দিয়ে

শীতল করে, ফল দিয়ে শুধু উপকার করা ছাড়া ওরা আর কিছু জানে না, পারে না। আর এই গাছকেই আমরা— ।"

"মানুষের মতো নিষ্ঠুর জানোয়ার আর হয় না। বাঘ, সিংহীও অকারণে কখনো প্রাণীহত্যা করে না, শুধু খিদে পেলেই ওরা মারে। আর মানুষ ?"

"মানুষের সর্বনাশ করেছে তার ইমোশন। তাই থেকেই যত জটিলতা। নয়তো কি দরকার ছিল শোভনেশের এই খুনটা করার ?"

বাঁদিকে বিধান শিশু উদ্যানের পাঁচিল, ডানদিকে বাগমারি করবস্থানের ঝিল। তার মাঝের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গাড়ি পৌঁছল ইস্টার্ন বাইপাসে।

রোহিণী নির্দেশ দিল, "ডানদিকে, তারপর একটু এগিয়েই বাঁদিকে সল্টলেকে ঢোকার পথ, আর সোজা মাইলখানেক চলে গেলে স্টেডিয়াম।"

"ইমোশান আছে বলেই আমরা মানুষ। তোমার আমার আছে, তাহলে শোভনেশেরই বা থাকবে না কেন ? কিন্তু কথাটা হল, কিভাবে, কোনদিকে সেটা চালিত হচ্ছে। তাই তো ? এই ধরো এখন আমার— ।"

"হ্যাঁ, তোমার ? বলে ফেল।"

"থাক।"

"আমি জানি, এখন তোমার কি ইচ্ছে করছে। এই নির্জন রাস্তা, তার উপর আলোগুলোও জ্বলছে না, এই পরিবেশ বিটলেমির ইমোশন ছাড়া তোমার মধ্যে আর কোন ব্যাপার তৈরি করছে না।"

"এক সেকেন্ড শুধু গাড়িটা থামাব।"

"আধ সেকেণ্ডও নয়। খবরদার, প্রথম বলে আউট হবার ভয় দেখাবে না।" ...হাত সরাও, অ্যাকসিডেন্ট করে বসবে।"

"এই ফাঁকা রাস্তায় কিভাবে অ্যাকসিডেন্ট করব ?"

"যা হবার কথা নয়, সেটা হলে তাকে অ্যাকসিডেন্ট বলে।"

"শোভনেশও তো অ্যাকসিডেন্টে মানুষ মারতে পারে।"

রোহিণী মুখ ঘুরিয়ে রাজেনের দিকে তাকাল। "তাই তো ! এটা তো আমার মনে কখনো হয়নি !"

"দিনে অন্তত পাঁচশো লোক এ দেশে গাড়ি চাপা পড়ে, তার একটাও কিন্তু গাড়িওয়ালার ইচ্ছাকৃত নয়। অথচ লোকে প্রথমেই তাদের পেটায় আর গাড়িতে আগুন ধরায়। আমরা ধরেই নিয়েছি, শোভনেশ খুন করেছে।"

"পুলিশ ইনভেস্টিগেট করেছে, জজ সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখেছেন, সব থেকে বড় কথা, আসামী নিজেই স্বীকার করেছে। এরপরও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি ?"

"পারে। হয়তো পুলিশ ঠিকমত তদন্ত করেনি আর শোভনেশ মানুষজনের কাছ থেকে, সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যই, নিশ্চয় প্রচণ্ড মেন্টাল প্রেশারে ছিল, হয়তো বাঁচার ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেছিল, তাই কনফেস করে।"

"ও আমারও গলা টিপে ধরেছিল ন্যুড হয়ে সিটিং দিতে রাজি না হওয়ায়। বাড়িতে আমি পালিয়ে পালিয়ে থাকতাম। আমার ভয় করত, কখন আবার—"

গাড়ি থামাল রাজেন। তারা পৌঁছে গেছে। গেটের দু-ধারে আলো জ্বলছে। বাড়ির ভিতরে ড্রাইভওয়েতে তিনটে মোটর দাঁড়িয়ে, গাড়ি রাখার আর জায়গা নেই। গেটের কাছেই গাড়ি রেখে, পিছনের সিটে রাখা পলিথিন প্যাকেটের থেকে দুটো তুলে নিয়ে

রাজেন বলল, "দুপুরে ভাত খাওয়ার পর এখনো পর্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি।"

"পথেই গাড়ি থামিয়ে কিছু খেয়ে নিলে পারতে।"

"তাই তো চেয়েছিলাম, তুমিই তো খেতে দিলে না, উল্টে অ্যাকসিডেন্টের ভয় দেখালে।"

"হয়েছে। তোমার এই খাই খাই রোগটা সারাবার চিকিৎসা দরকার। ওপরে চলো।"

"চিকিৎসার জন্য ?"

রোহিণী কর্ণপাত না করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। তিনতলায় পৌঁছে সে বলল, "এই নাও চাবি, ঢুকতে হয় ঢোক, আর নয়তো এখানে দাঁড়াও। আমি উপর থেকে মাছটা নিয়ে আসি।"

এই বলে সে চারতলার সিঁড়ি ধরল। ঘোরার মুখে আড়চোখে দেখল, রাজেন দেয়ালে ঠেশ দিয়ে সিঁড়িতে বসে পা ছড়িয়ে দিল।

দরজা খুললেন যিনি, তাঁকে রোহিণী চিনে নিল। গঙ্গাপ্রসাদের বর্ণনামত ইনিই নিশ্চয় হৃদয়রঞ্জন। ভিতর থেকে দেখতে পেয়ে সুজাতা ডাকলেন, "এসো ভেতরে এসো, মাছটা নেবে তো ?"

"হ্যাঁ।" বলেই ভিতরে ঢুকে রোহিণী কাঠ হয়ে গেল। খাওয়ার টেবিলে, পিছন ফিরে একজন বসে। দীর্ঘকায় রোগা, ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল। টেবিলে একটা ছিটকাপড়ের তাপ্পি দেওয়া ঝোলা।

হৃদয়রঞ্জন দরজাটা বন্ধ করেছেন। রোহিণী সেটা আঁকড়ে ধরে কি একটা বলতে গেল। মুখ দিয়ে স্বর বেরোল না।

'এসো, ভেতরে এসো।" সুজাতা আবার ডাকলেন।

চেয়ারে বসা লোকটি মুখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। হাতের চামচে মালাইয়ের টুকরো।

"উনি আমাদের গুরুভাই। তোমায় বলেছিলাম না, কাল উনি এসেছিলেন।"

লোকটি দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকাল আর তাই করতে গিয়ে চামচ থেকে মালাইয়ের টুকরোটা টেবিলের উপর পড়ল। রোহিণী তখনো ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রতি-নমস্কার জানাবার বদলে সে ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে আছে। কোথায় শোভনেশ !

এই লোকটিকেই তা হলে চঞ্চলা আর নন্দা কাল দেখেছিল। কি নিশ্চিন্তি ! আবার একটা ভয় থেকে সে বেরিয়ে এল। রোহিণী দুহাত অনেক চেষ্টায় তুলল নমস্কার জানাতে। তার মনে হচ্ছে, সারা শরীরটাই একটা ঝরনা ধারার মত তিরতির করে নেমে যাচ্ছে। হাত পা মুখ গলে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে তাকে অদৃশ্য মানুষ বানিয়ে দিচ্ছে। সে দুটো অদৃশ্য হাত তুলে নমস্কার করল। এখন তো সে লোকটির পায়ের উপরও হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে রাজি, আপনি বাঁচালেন শোভনেশ না হয়ে।

"কাল আপনি বোধহয় নিচের তলায় একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে ফ্ল্যাটের নম্বর জানতে চেয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।" গুরুভাই বিব্রত ভাবে বললেন। "চশমাটা পরশু ট্রেনে ভিড়ের ধাক্কায় পড়ে গিয়ে দুটো কাচই ভেঙে গেছে। বনগাঁ লাইনের গাড়ি তো, লোকে বলে রাবণের গুষ্টির লাইন ! তা ওটা দোকানে দিয়েছিলাম। কাল নিতে গেলাম, বলল হয়নি। চশমা বিনা

ভাল দেখতে পাই না। ভুল করে তিনতলায় বেল বাজিয়ে ফেলি। লম্বা সেমিজ পরা একটি মেয়ে দরজা খুলল। তার পিছনে ছিল একটি ছেলে।"

"অ্যাঁ!" সঙ্গে সঙ্গে রোহিণী নিজেকে সংযত করে নিল। "হ্যাঁ হ্যাঁ, মোটাসোটা, মুখটা গোল, গায়ের রঙ আমার মতই কালো। পরনে ছিল গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত হলুদে খয়েরিতে ছোপ দেওয়া ম্যাক্সি।" সে নন্দার বর্ণনাই দিল এবং তার ম্যাক্সির।

"হ্যাঁ, ওই রকমই। মেয়েটি প্রথমে বোধহয় আমাকে চোর ডাকাত কিছু ভেবেছিল, খুব ভয় পেয়ে গেছিল। দরজাটা খুলেই বন্ধ করে দেয়, তারপর ছেলেটি দরজা খুলে আমার নাম ধাম জিজ্ঞেস করে বলে দেয়, ভুল করেছেন, ওপরের ফ্ল্যাটে যান।"

নন্দাকে তো বোঝা গেল, কিন্তু ছেলেটা কে? রোহিণী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ডুপ্লিকেট চাবিটা আজই সে চেয়ে নেবে। দুপুরে ফাঁকা ফ্ল্যাট খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে তার মালিককে।

"আমার দিদির ছেলেমেয়ে এসেছিল।" সুজাতা ও হৃদয়রঞ্জন তাকিয়ে আছে দেখে রোহিণীকে কথাগুলো বলতে হল। একটা কনফিউশন, আবার একটা মিথ্যার জাল বোনার ঘটনা। তবে ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। নন্দাকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে।

"মাসিমা ওটা দিন।"

সুজাতা ডীপ ফ্রিজের পাল্লা খুলতেই সাজানো কুলপিগুলো রোহিণী দেখতে পেল।

"এখনো দেখছি অনেকগুলো রয়েছে।"

"বোসো, একটা খেয়ে যাও।"

তার বলাটা বৃথা গেল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হওয়াটা ভাল দেখায় না। রোহিণী একটু বেশি রকম আটপৌরে গলায় বলল, "না মাসিমা, যাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, সে নিচে অপেক্ষা করছে।" তারপরই যোগ করল, "আচ্ছা আমি যদি নিয়ে যাই?"

"নিতে পার।" মাছের প্যাকেটের সঙ্গে জমানো মালাই ভরা প্লাস্টিকের দুটো কুলপি রোহিণীর হাতে দিয়ে বললেন, "একটা তোমার আর একটা তোমার অতিথির। খেয়ে বোলো কেমন লাগল।"

"নিশ্চয় বলব।" হাল্কা ফুরফুরে খুশি এখন রোহিণীর সর্বাঙ্গ জুড়ে। লোকটা শোভনেশ নয়। বহরমপুর হাসপাতাল থেকে যে দুটো লোক পালিয়েছে, তাদের একজন যে শোভনেশই, এমন প্রমাণ সত্যিই তো মেলেনি। মিছেই সে ভয়ে মরছিল।

বহু বছর পর, অন্তত কুড়ি বছর তো হবেই, রোহিণী চার ধাপ বাকি থাকতেই জোড় পায়ে লাফ দিয়ে সিঁড়ির বাঁকের ল্যান্ডিংয়ে নামল। টালটা সামান্য একটু ঝুঁকেই সে কৈশোর দিনের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তিনতলার ল্যান্ডিংয়ের দিকে তাকাল। ভয়ের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে এখন সে আনন্দে আর এক ধরনের দিশাহারা।

রাজেন এখনো দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে পা ছড়িয়ে। তার ঝুলিটা কোলে, হাতে ফ্ল্যাটের দরজার চাবি। চোখ বন্ধ। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। রোহিণী এবার আগের মতই জোড় পায়ে ছটা সিঁড়ির উপর থেকে লাফ দিল এবং ধপ করে মেঝেয় পড়ে উবু হয়ে বসেই রইল, রাজেনের মুখোমুখি হয়ে।

রাজেন একটা চোখ খুলেই বন্ধ করল।

"লাফটা ভালই দিয়েছ।" ঘুমের ঘোরে বলার মত জড়িয়ে জড়িয়ে সে বলল, "কিন্তু এই বেরেদ্ধ বয়সে হাঁটুর জোর দেখানোটা কি উচিত হচ্ছে? ভেঙে-টেঙে তো যেতে পারে। তখন কে ঘরে বয়ে নিয়ে যাবে?"

"তুমি।"

"ওই বিশাল ওজন?"

"মাত্র আটান্ন কেজি। কোন যুবকের কাছে যদি এই সামান্য ওজনই বেশি হয়...দুহাতে বৌকে তোলার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহলে...।"

"বৌয়ের উচিত ওজনটাই কমিয়ে ফেলা।" চোখ বন্ধ রেখেই রাজেন বলল।

"তাহলে বিয়ে করার আগে তার বারবেল ভাঁজা উচিত।"

"আমার তাহলে বিয়ে করা আর হল না। আমি বারবেল ভাঁজতে পারব না।"

"তাহলে আমারও আর বিয়ে হল না।"

"হবে। কথা দিচ্ছি আমি ভাঁজব।"

"তাহলে প্রোপোজ করো।"

"অনেকবার তো করেছি।" রাজেন এখনো চোখ খোলেনি।

"ভদ্রলোকের মত করো, ইংলিশ নাইটরা যেভাবে—" উঠে দাঁড়াল রোহিণী।

তার কথা শেষ হবার আগেই রাজেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর দুটি হাঁটু মুড়ে বসে, দুহাত পাশে ছড়িয়ে, মাথাটা হেঁট করে নামিয়ে বলল, "মাই লেডি, উড য়্যু ম্যারি মী? প্রিয়ে তুমি কি আমায় স্বামিত্বে বরণ করবে?...রুনি এবার শকুন্তলার মত ব্লাশ করো, ব্লাশ করো, মুখটা একটু আনত করো, আর চোখটা সামান্য পিটপিট, শ্বাস বন্ধ, নাকটা একটু স্ফীত—করছ?"

"করছি। একটু কষ্ট হচ্ছে। তুমি এবার মাথা তোল।"

"অ্যাকসেপ্ট করলে?"

জবাব না দিয়ে, ঝুঁকে রাজেনের চুলে রোহিণী মুখটা চেপে ধরল। আর রাজেনের মুখ চেপে বসল রোহিণীর বুকের মাঝে।

"ইয়া হুউউ"। রাজেনের চিৎকারটা সিঁড়ি দিয়ে প্রতিধ্বনিত হতে হতে একতলায় নেমে গেল। চারতলাতেও পৌঁছল। তড়বড় করে সে সিঁড়ি দিয়ে দশটা ধাপ উঠে ঠিক রোহিণীর মতই লাফ দিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। দুহাতে উরু দুটো জড়িয়ে ধরে সে রোহিণীকে তুলে ধরল।

"এই হচ্ছে কি? হাত ব্যথা কোর না, দুদিন পরই তো খেলা! ব্যাট তুলতে না পেরে বোল্ড হয়ে শেষে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে।"

রোহিণীকে পাক দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে রাজেন বলল, "আই উইল গেট আ সেঞ্চুরি ফর য়্যু, আই উইল স্কোর এ সেঞ্চুরি ফর য়্যু...আই অ্যাম আ ডন ব্র্যাডম্যান...।"

আর রোহিণী তখন উপরের ল্যান্ডিংয়ে নন্দার ছানাবড়া হওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, হায় আন্টি, আর তুমি কোন্ নৈতিক অধিকারে ওই কিশোরীকে জ্ঞান দেবে? হতচ্ছাড়া প্রেমই তোমাকে ডোবাল।

"রাজেন, একজন দেখছে, নামাও।" রোহিণী ফিসফিস করে বলল রাজেনের কানের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে।

"কই?" রাজেন ঘুরল। নন্দা ছুটে উপরে উঠে গেল।

"তাই তো! এটা যদি এখন শোভনেশ দেখে ফেলত?" রাজেন মজা করেই বলল রোহিণীকে নামিয়ে দিয়ে।

"আমার হাত জোড়া, দরজা খোল।"

রাজেন দরজা খুলল। দুজনে ভিতরে ঢুকল। খাবার টেবিলে বসল।

"প্লিজ, ওই নামটা আর আমার কাছে কখনো উচ্চারণ কোর না।" স্বাভাবিক অনুত্তেজিত রোহিণীর কণ্ঠ। "ওপরের মাসিমা দুটো মালাই দিয়েছেন, দুটোই তোমার।"

অপ্রতিভ রাজেন কুলপির ঢাকনা খুলে দেখল। গন্ধ শুঁকল। দুই তালুর মধ্যে কুলপি ঘসতে ঘসতে বলল, "দুটো প্লেট দাও, বার করে দিচ্ছি।"

এই ফ্ল্যাটে রাজেনের প্রথম আসা। কৌতূহলী চোখে সব কিছু সে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর চামচ দিয়ে মালাই খেতে খেতে সে বলল, "নামটা আমি না হয় উচ্চারণ করলাম না, কিন্তু অন্যেরা তো করবে। এখনো তো সে তোমার স্বামীই। এখনো সে বেঁচে, এখনো তাকে নিয়ে অনেক কিছু ঘটতে পারে। হয়তো ওই দুই ফেরারিদের একজন···।"

সে নাম উচ্চারণ না করে থেমে গেল। রোহিণী অনুনয় ভরা চোখে তাকিয়ে বলল, "আর আমাকে ভয়ের দিকে ঠেলে দিও না। অন্তত আজকের দিনটায় নয়।"

"তাহলে ওই মালাইটা ফেলে না রেখে খেয়ে নাও। দারুণ হয়েছে, বলে দিও।"

"আর আমি ওপরে যাব না। কেন জানি অস্বস্তি লাগছে ওপর সম্পর্কে।"

"গঙ্গাদার কথা শুনে? কিন্তু কে সত্যি কে মিথ্যে সেটা তো এখনো সাব্যস্ত হয়নি।"

রোহিণী উত্তর দিল না। রাজেন পলিথিন প্যাকেট থেকে খাবারের বাক্স বার করল।

"আবার কি?"

"ধোক্‌লা।" বাক্স খুলে রাজেন এগিয়ে ধরল।" খেয়ে দেখো। ডালের জিনিস, নোনতা নোনতা, টক্ টক্, সঙ্গে লঙ্কাও রয়েছে তবে ঝাল নেই।"

পুডিংয়ের মত জমানো। ধনেপাতা ছড়ানো। রোহিণী একটা টুকরো মুখে দিয়ে, চাহনি মারফত তার পছন্দটা জানিয়ে দিল। উঠে গিয়ে সে সন্দেশের বাক্স আনল।

"এটা বাঙালি খাবার।"

"হুম্‌ম্।" রাজেনের মুখে তখন আস্ত একটা কড়াপাক। সে দ্বিতীয় পলিথিন প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়াল।

"কি আছে ওতে?"

"চকোলেট কেক।"

"থাক ওটা। মালাই, ধোক্‌লা তারপর সন্দেশ! এই সবই যদি খাবে, তাহলে ভাত খাবে কে? খাওয়ানোর কথা তো আমারই। আর তুমি—দাও সরিয়ে রাখি, চোখের সামনে থাকলে—।"

রোহিণী প্যাকেটটা নিয়ে উঠে যেতেই রাজেন পাখা খুলে রেগুলেটর এক পয়েন্টে রাখল।

"বেশ গরম আজ, ঘেমে গেছি।"

"আমি তো রোজ মাথা না ভিজিয়ে রাতে চান করি।" রোহিণী প্লেট তুলে রান্নাঘরে যাবার সময় বলল।

"আমিও আজ চান করব।"

"অভ্যেস নেই, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। খেলা রয়েছে না?"

"মাথায় জল দেব না।" রাজেন কলঘরের দরজায় গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

"ভাতটা চড়িয়ে, মাছগুলোয় সর্ষে লঙ্কা বাটা মাখিয়ে, আমি আগে সেরে নিই।"

"ততক্ষণে আমার গায়ে জল ঢালা হয়ে যাবে।" রাজেন সোয়েটার খুলতে খুলতে বলল।

"ভাত ফুটতে দু' মিনিট লাগবে।" রোহিণী হাত বাড়িয়ে সোয়েটারটা নিল।

"টস করব, কয়েন দাও।"

"কয়েন ? বেশ।" ঝুলির মধ্যে রেজগির ছোট্ট ব্যাগটা। রোহিণী প্রথমে কার্ডিগানটা বার করল, তারপর ম্যাগাজিনটা, তারপর ব্যাগটা। একটা আধুলি সে রাজেনকে দিল।

"বলো।" আধুলিটা রাজেনের ডান তালুতে পড়তে বাঁ তালু দিয়ে চেপে ধরে সে বলল।

"টেইল।" রোহিণী চোখ বুজে আছে। হঠাৎই তার মনে হয়েছে, এই টস দিয়েই তার ভাগ্যেরও পরীক্ষা হবে। জিতলে তার জীবন সুখের হবে।

"ইওর চয়েস, ব্যাটিং না ফিল্ডিং ?"

"মানে ?"

"জিতেছ। রান্নাঘরে না কলঘরে, কোথায় যেতে চাও ?"

আর একবার একটা আনন্দের প্লাবন রোহিণীকে ভাসাল। আবার সে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে। সুখী হবে সে! অতীতটা অতীতেই থাক। এখন থেকে সে ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে। রাজেন ছাড়া ভবিষ্যৎকে আর ভাবা যায় না।

"বাঙালি মেয়ে আগে কোনটা চয়েস করবে, সেটাও কি বলে দিতে হবে ?"

"তাহলে ফিল্ড করো। ভাতটা চাপাও, সর্ষে বাটা মাখাও। বেরিয়ে এসে আমি ফিল্ড করব। কিন্তু ফ্যানট্যান গালতে পারব না, আগেই বলে দিচ্ছি। শুধু ফার্স্ট স্লিপে দাঁড়াব।"

"তাব আগেই আমার হয়ে যাবে।"

কলঘরে জলের ঝারির নিচে রাজেন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। বন্ধ দরজা ভেদ করে গানের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে রান্নাঘর থেকে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলল, "রুনি, ধারে কাছে ধোপাবাড়ি আছে কি ?"

"বোধহয় নেই।" চেঁচিয়েই জবাব দিয়ে রোহিণী কলঘরের দরজার কাছে এসে বলল, "আমার গলা কি এতই খারাপ ?"

"তোমার নয়, তোমার নয়।" বলেই রাজেন বেসুরে গানটা ধরল, "ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।"

"আস্তে রাজেন, আস্তে, ওপরে তুষারবাবুর মাস্‌ল খুব বদমেজাজী, উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে।"

শুনে রাজেন গলাটা আরো চড়াল। খুব তাড়াতাড়িই তার স্নান হয়ে গেল। বেরিয়ে এসে বলল, "দারুণ ফ্রেশ লাগছে।"

"এবার একটু একা অপেক্ষা করো, আমি সেরে নিই, চিরুনি ঘরে রয়েছে, চুল আঁচড়ে নাও। আর রান্নাঘরে ঢুকে কোন কিছুতে হাত দেবে না।" রোহিণী স্নানে যাবার আগে সদর দরজাটা বন্ধ আছে কিনা দেখে নিল।

কলঘর থেকে বেরিয়ে রোহিণী দেখল, একমনে রাজেন টেবিলে রাখা ম্যাগাজিনটা পড়ছে।

"ওতেই লেখাটা রয়েছে। পড়ে ফেল। আমার এখনও শেষ দিকটা পড়া হয়নি।"

"ওটাই পড়ছি।"

রান্না শেষ হবার আগেই রাজেনের পড়া শেষ হয়ে গেল।

"কি বুঝলে ?" টেবিলে মাছভাজার প্লেট আর তেলের বাটি রেখে রোহিণী জানতে

উৎসুক হল।

"এই সিধারথ সিনহাকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। যাদবপুরে আমাদের সময় কম্পারেটিভ লিটারেচার পড়ত এক সিদ্ধার্থ সিংগী।

"কিসের জন্য মনে হচ্ছে যে, এই লেখকই ?"

"অনেকটা এই ধরনের লেখা বছর দুয়েক আগে স্পোর্টস উইকলিতে লিখেছিল পৃথিবীর নামী কয়েকজন প্লেয়ারদের নিয়ে। লেখার আগে আমার কাছে এসে বিদেশী ক'জন ক্রিকেটারদের সম্পর্কে বই নিয়ে গেছিল। লেখাটা পড়েছিলাম, ইংরেজিটা ভালই লেখে। অনেকটা এই ধাঁচেরই লেখা, বিষয়টা ছিল কতরকম ভাবে বড় বড় খেলোয়াড়দের পতন ঘটেছে। মনে হয় সিরিজ করছে, পরে বই করে বার করবে। তবে আগের লেখাটায় সিদ্ধার্থই ছিল, সিধারথ্ নয়।"

"এর সঙ্গে আমি দেখা করব। ঠিকানা জান ?"

"নর্থে গ্রে স্ট্রিটে মানে অরবিন্দ সরণিতে কোথায় যেন বাড়ি, পড়াতো আশুতোষে। খোঁজ নিয়ে তোমায় বলতে পারি।"

"দেরি হয়ে যাবে। কাল সকালে যাব মীনা চ্যাটার্জির কাছে, ওখান থেকেই চলে যাব আশুতোষে।"

"লেখাটার শেষ দিকটা খুব ইন্টারেস্টিং। তুমি বোধহয় এখনও পড়োনি ?...সিধারথ সিনহা বহরমপুরের জেলে দেখা করেছিল শোভনেশ সেনগুপ্তর সঙ্গে।"

"সে কি !" রোহিণী হাতায় করে ডেকচি থেকে প্লেটে গরম ভাত রাখছিল। থামিয়ে রেখে রাজেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"জিগ্যেস করেছিল, মেয়েদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ? শোভনেশ সেনগুপ্ত জবাব দেয়, 'আমার কাছে মেয়েরা শুধু দু রকমের, হয় মা ভগবতী, নয়তো পাপোশ। ভগবতীদের পা মোছার পাপোশে পরিণত করাতেই তো আনন্দ।' অদ্ভুত কথা !"

"আমাকেও এ কথাটা বার দুই বলেছিল। পরে জানতে পারি, কথাটা পিকাসোর। ওর খুব সখ পিকাসো হবার বা বলতে পার, ওর বিশ্বাস পিকাসোর মতই প্রতিভাবান। তাই নকলও করে। দেখছি, এত কিছুর পরও শোভনেশ আগের মতই রয়েছে। পাগলামি সারেনি।"

"আর একটা প্রশ্ন ছিল, মানুষের জীবনের মূল্য আপনার কাছে কতটুকু ? শোভনেশ সেনগুপ্ত এর জবাবে যা বলে, তাতে কিন্তু লোকটি সম্পর্কে অন্য রকম ধারণা হয়। ভগবতীকে পাপোশ কোনও ভদ্রলোকে করে না, কিন্তু মানুষের জীবন সম্পর্কেও দরদ, ভালবাসা রয়েছে। কি বলেছে জান ?...আরে ভাত দাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।"

রোহিণীর হাতা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর একটা প্লেটে নিজের জন্য ভাত নিয়ে সে রাজেনের মুখোমুখি বসল। একটা টিফিন বক্সে সর্ষে মাখানো মাছ গরম ভাতের ডেকচির মধ্যে বসানো। সেটা লক্ষ করে রাজেন বলল, "আমাদের বাড়িতে মাছের উপর-নিচে কলাপাতা রেখে তার ওপরে গরম ভাত ঢেলে দেওয়া হয়।"

"বেশি ভাত হলে ওভাবে করা চলে, এখানে দুজনের জন্য ওইটুকু ভাতের...তারপর কি বলল শোভনেশ ?"

"বিদেশের একটা ঘটনার কথা বলেছে। বছর আঠারো আগে এক বিখ্যাত আমেরিকান সিগারেট কোম্পানির রিসার্চ সায়েন্টিস্ট ডক্টর মোল্ড এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে তৈরি করা সিগারেট স্মোকিংয়ে কোন ক্ষতি হবে না অর্থাৎ ক্যানসার হবে না।

এমন একটা আবিষ্কার পৃথিবীতে কেউ করতে পারেনি। কিন্তু সেই কোম্পানি এই সিগারেট তৈরি করে বাজারে ছাড়েনি। কারণ, তাদের উকিল জানায়, ক্যানসার হবে না বললে কোম্পানির তরফে এটাই মেনে নেওয়া হবে যে, তাদের আগের প্রোডাক্ট অনিরাপদ ছিল। সুতরাং ফুসফুসের ক্যানসারে মৃত্যুর জন্য তাদের দায়ী করা যাবে। আর তাহলে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলাও করা যাবে। ক্ষতিপূরণের টাকা দেবার ভয়ে কোম্পানি সেই আবিষ্কারটা চেপে গিয়ে আগের মতই সিগারেট তৈরি করে বিক্রি করে যেতে লাগল। এই পিশাচের মত কাজের ফলে গত আঠারো বছর কত লোক ফুসফুসের ক্যানসারে মারা গেছে জানি না, কিন্তু টাকার জন্য সমাজকে র্দুদশায় ফেলে, মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চেপে যাওয়া স্রেফ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। ভাবলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। এর তুলনায় একজনকে খুন করাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা চলে না। অথচ খবরের কাগজে সেটা নিয়েই ফলাও করা হয়। বেশি লোকের জীবন, তাদের বাঁচার অধিকারই শোভনেশ সেনগুপ্তর কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। লোকটার মধ্যে কনট্রাডিকসন রয়েছে···জটিল মন।"

"কথা না বলে এবার খেয়ে নাও। মাছটার টেস্ট কেমন ?"

"মার কাছে একটা ছড়া শুনেছি—থোড় ডুমুর ইচলা মাছে/খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে। এই ইচলায় অরুচি ঘুচল, এতে তোমার ঠোঁটের স্বাদ রয়েছে।"

একঝলক রক্ত রোহিণীর মুখে সুখের আলতা ছড়িয়েই অন্তর্হিত হল। চোখ নামিয়ে নিল। তার জীবনে আজ একটা এমনই দিন, যার সঙ্গে আর কোনও দিনেরই তুলনা চলে না। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে সে ডুবে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল।

"তোমার মার কাছে কবে আমায় নিয়ে যাবে ?"

রাজেনের প্লেটের ভাত শেষ হয়ে গেছে দেখে, রোহিণী ডেক্‌চি থেকে টিফিন বক্সটা তুলে রাজেনের মুখের দিকে তাকাল। মুখটা গম্ভীর।

"গিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাদের ফ্যামিলি খুব কনজারভেটিভ, একথা তোমায় আগেও বলেছি। আমার দাদার বিয়ে হয়েছে ঘটকালি করে। খুঁজে খুঁজে, মধ্যবিত্ত ঘরের স্কুল ফাইনাল পাস মেয়ে কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী। ঘটকের আনা সম্বন্ধে বোনেদের বিয়ে হয়েছে। বড় জামাই শ্বশুরের টাকায় এম আর সি পি করে আসে। মেজো এখন দাদার জুনিয়ার।"

"তা হলে ?" রোহিণী অবুঝ দৃষ্টি মেলে রইল।

"তা হলে আর কি ! শরীর-মনে আমি সাবালক, অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, এটা মানতে রাজি নই।"

"তুমি কি আমার সব কথা বলেছ ?"

"শোভনেশ সেনগুপ্ত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে।"

"বয়স ?"

"হ্যাঁ, এটাতেই—যাকগে এ সব কথা। জয়পুর থেকে ফিরেই ডিভোর্সের কাজটা সেরে ফেলতে হবে। তারপর দেখা যাবে কতদূর কি হয়। মোটকথা শোভনেশ সেনগুপ্ত কোনও দিন এসে 'আমার বৌ' বলে যাতে হাত না বাড়ায়, আগে সেই ব্যবস্থাটা তো করে ফেলি। তারপর তোমাকে একদিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনব।"

দুজনে নীরবে খাওয়া শেষ করল। রোহিণীর মনে কাঁটার মত খচখচ করছে একটা কথা, কিছু গোপন করা উচিত নয়, একদিন তো ওরা জানতে পারবেই।

রাজেন অনুমান করেছে, রোহিণীর চিন্তাধারা এখন কোন খাতে চলেছে। হাল্কা সুরে সে বলল, "রণে আর প্রেমে অন্যায় বলে কিছু নেই। বিয়ের কথাটা চেপে গেলেই হবে। পরে যদি জানতে পারে তো পারবে।"

লোকটা জীবন থেকে সরে গিয়েও সরছে না। রোহিণী কেমন যেন অসহায় বোধ করল। শোভনেশের ছায়া কি তার জীবনপথে সবসময়ই এই ভাবে পড়বে?

"কাল ভোরে দিল্লির ফ্লাইট।"

"আর দেরি কোর না, তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"আজ রাতে ঘুম আসবে না, জেগেই থাকব।"

"জয়পুর থেকে একটা ম্যাক্সি বা কাচ-বসানো ঘাঘরা, যদি মনে থাকে, তাহলে এনো, উপরের মেয়েটিকে দেব।"

"কোন্ মেয়েটি, যে তখন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখছিল?"

"সারাবাড়ি এখন চাউর হবে।"

"ম্যাক্সিটা কি ঘুষ?"

"তুমি যেখানে সেখানে যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে এমন লজ্জায় ফেলে দাও!"

"কাণ্ড! আমার তো তখন লঙ্কাকাণ্ড বাধাতে ইচ্ছে করছিল।"

"ওটা জয়পুরের মাঠের জন্য এখন তোলা থাক। আর সেঞ্চুরি কবব-টবব কখনো এসব বলো না। যদি না পার?"

"পারব। বাজি?"

"বাজি-টাজি নয়, তবে এটা হবে আমার জন্য লটারি। যদি সেঞ্চুরি করো তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাব হাসপাতাল থেকে শোভনেশ পালায়নি, ওটা অন্য কেউ।"

দশ মিনিট পর, রাজেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। পায়ের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল। রোহিণী দরজার খোলা পাল্লায় হেলান দিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে। সাত পাঁচ ভাবনা তার মাথায় বুদ্‌বুদের মত ফাটছে আর তৈরি হচ্ছে। তবে সব কিছুর গভীরে সুখবোধের একটা বেদি তৈরি হয়েছে। যার উপরে এইবার সে ভবিষ্যৎ-জীবনকে স্থাপন করবে।

"আন্টি আপনার ফোন।"

চমকে উঠল সে। সিঁড়িতে নন্দা। এই সময় কে! কেন? রোহিণী সিঁড়ি দিয়ে উঠল। টিভি-তে হিন্দি সিরিয়াল চলছে। সপরিবার তুষার দত্ত দেখায় মগ্ন। রোহিণীকে দেখে সবাই মুখ ফেরাল।

"হ্যালো।"

"আমি গঙ্গাদা। বহরমপুর থেকে নির্মল এক্ষুনি ফোন করেছিল।"

"কেন?" রোহিণী যেন লটারির ফলের ঘোষণা শোনার জন্য তৈরি।

"বলল, যে দুজন পালিয়েছে তাদের একজন শোভুই। জেল-সুপারের কাছ থেকে জেনে এসেছে।"

রোহিণীর চোয়ালটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, রিসিভার ধরা মুঠিটাও। চোখের সামনে ভেসে উঠল তার নিজেরই জীবনের একটা মুহূর্ত—সিঁড়ির ছ'টা ধাপ উপর থেকে জোড় পায়ে সে লাফ দিয়ে পড়ছে ছেলেবেলার মত। এই মুহূর্তটা সত্যি, তার কাছে ভীষণ গভীরভাবে সত্যি। এটাকে সে নষ্ট হতে দেবে না।

"গঙ্গাদা, কাল শোভনেশ এসেছিল বলেছিলাম। কিন্তু একটু আগে জানলাম, সে

শোভনেশ নয়, অন্য লোক। ও যদি আমার কাছে আসে তো আসুক, আমার ভয় পাবার কিছু নেই। এটা ঠিকই যে, আমি ভয়ের মধ্যে পড়েছিলাম কিন্তু এখন বেরিয়ে এসেছি। আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না।"

ওধার থেকে আবার গঙ্গাপ্রসাদ কি যেন বলে গেলেন কিন্তু কিছুই তার কানে ঢুকল না। সে আর কিছু শুনতে চায় না। রিসিভার নামিয়ে রোহিণী ঘরের সবার দিকে একবার হাসিমুখে তাকিয়ে বেরিয়ে এল। সুজাতা গুপ্তর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে একটু ইতস্তত করল। আজ থাক, পরেই কথা বলব, আগে সিদ্ধার্থ সিংহর লেখাটা পড়ে নিই, এই স্থির করে রোহিণী নিজের ঘরে ফিরে এল।

রাতে বিছানায় কাত হয়ে সে 'ভস্মীভূত শিল্পীরা' পড়ছিল। পড়তে পড়তে একসময় সে সোজা হয়ে বসে অস্ফুটে বলে উঠল, "আশ্চর্য, আমি এসব লক্ষই করিনি!"

॥ ছয় ॥

রোহিণী ঠিক দশটায় মীনা চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতামে আঙুল রাখল।

দরজা খুলল সেই কিশোরী, যে সেদিন পাখা খুলে দিয়ে চা বা কোল্ড ড্রিঙ্কস দেবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল।

"মীনা চ্যাটার্জির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।"

"আসুন।"

ভিতরে পা দিয়েই রোহিণী দেখল, তিনটি পুরুষ একদিকের সোফায় বসে আর তাদের মুখোমুখি ঝালর দেওয়া বেনারসিতে ঢাকা মোটা গদির ছোট চৌকিতে মীনা। কোলে তাকিয়া নিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে।

"আসুন, আসুন।" তাকিয়াটা পাশে রেখে মীনা সোজা হয়ে বসল। ম্যাগাজিনের লোকের জন্য তার এইটুকু খাতিরই বরাদ্দ করা আছে। তবে রোহিণী যতটুকু মাথা নামাল নমস্কারের জন্য তার দ্বিগুণ মাথা নামিয়ে মীনা নমস্কারটা গ্রহণ করল। বিনয়ের প্রতিযোগিতায় সে টলিউড মেয়েদের মধ্যে গোল্ড মেডালিস্ট।

মীনার এক পলক চাহনি থেকেই রোহিণী বুঝে গেল, এইবার তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করবে তার থেকে অফিসিয়ালি প্রায় আট বছরের ছোট এই মেয়েটি। মীনার চোখে সে কৌতূহল এবং একটু অস্বস্তি দেখতে পেল।

"আপনি তো দারুণ পাংচুয়াল, দশটা মানে ঠিক দশটাই!"

"কলকাতার ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করতে হলে সময়ের হিসেবটা খুব ভাল করে কষতে হয়। এখানে আসতে যে সময় লাগবে, সেটা হিসেব করে তার সঙ্গে আধ ঘণ্টা জুড়ে সেইমত বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।"

"কীসে এলেন?"

"ট্যাক্সিতে।" রোহিণীকে মিথ্যা কথাটা বলতেই হল। মিনিবাসে চড়ে এসেছি বললে তার গুরুত্বের পয়েন্ট কাটা যাবে।

মহারানীর দপ্তর থেকে রোহিণী জেনে নিয়েছে, মীনাদের সংসারে এমন একটা সময় গেছে, যখন দুবেলা হাঁড়ি চড়াই দায় হয়ে পড়েছিল। এখন সে সচ্ছল হয়েছে, টাকাওয়ালা লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করছে। অতীত কোনভাবেই তার এই জীবনে উঁকি দিক,

এটা সে এখন চাইবে না। প্লেন, কার, বড়জোর ট্যাক্সি পর্যন্ত সে নামতে পারে, কিন্তু ট্রাম বা বাস তার এই সাজিয়ে তোলা মানসিকতাতে যাতে না ঢুকে পড়ে এই ভয়ে সে তটস্থ থাকে। রোহিণী এই ধরনের রোগগ্রস্ত কিছু কিছু মন দেখেছে, যারা দারিদ্র্য থেকে মই বেয়ে উঠে এসেই মইটা ফেলে দেবার জন্য লাথি ছোঁড়ে। মীনা সম্ভবত কিছু লাথি ছুঁড়বে।

"চা, কফি?"

"না, এই সময় কিছুই খাই না বিশুদ্ধ জল ছাড়া।"

"ওহ্‌হ্‌ মাই গড, কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় বিশুদ্ধ জল!"

রোহিণীর কানে খট করে লাগল মীনার উচ্চারণের ভঙ্গিটা। ইম্প্রেস করাবার জন্য তার মত মীনারও একটা দ্বিতীয় গলার স্বর আছে, কিন্তু তার মনে হল, কিসের যেন একটা ঘাটতি ওর বলার ভঙ্গিতে রয়েছে। সেটা বোধহয় জন্মগত আভিজাত্যের, ব্যক্তিত্বের, মুক্ত চেতনার অভাবের জন্যই। রোহিণী তার এই ধারণাগুলো মনে মনে নোট করে নিল। লেখার জন্য দরকার হবে।

"আপনি কি ফিল্টারড জল খান? আপনার হেলথ দেখে মনে হচ্ছে কখনো পেটের ট্রাবলে পড়েননি।" রোহিণী সুতো ছাড়ল মীনাকে খেলাবার জন্য। প্রশংসার টোপ গিলে এইসব লোকেরা নিজেদের মন খুলে দেখিয়ে দেয়।

"নেভার, নেভার, একদিনও নয়।" মীনা খুকিদের মত মাথা নাড়তে লাগল, "জানেন, আমি রোজ রাতে শোবার আগে এক গ্লাস চিরতার জল খাই। ইন্ডিয়ান হার্বাল মেডিসিন সম্পর্কে আমার অসীম শ্রদ্ধা, অগাধ আস্থা। লেখার মধ্যে এটা কিন্তু অবশ্যই রাখবেন...অসীম শ্রদ্ধা। আমাদের বাড়িতে কখনো অ্যালোপাথি ওষুধ ঢোকেনি।"

"কবিরাজি করাতেন না হোমিওপ্যাথি?"

"কবিরাজি। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান মানে কবিরাজ ছিলেন উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—"

"কি নাম বললেন?" রোহিণীর ব্যগ্রতা প্রকাশ পেল হঠাৎ তার সিধে হয়ে বসায়।

"উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।"

"কোথায় বাড়ি এনার? ...এভাবে কৌতূহল দেখাচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না।"

"না না, মনে করব কেন। আপনি ডিটেইলে সব জেনে তো নেবেনই। ওনার বাড়িতেই কবিরাজখানা ছিল বৌবাজারে। মহামহোপাধ্যায় জ্যোতিষচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎ ছাত্র, ওনার নাড়িজ্ঞান ছিল অদ্ভুত!"

রোহিণী আশ্চর্য হচ্ছে এই কারণে, সিধারথ সিনহার লেখাটায় সে কাল রাতেই জেনেছে, শোভনেশের জ্যাঠা নিঃসন্তান উমেশচন্দ্র কবিরাজ ছিলেন। পার্টিশান হওয়া বাড়ির অংশেই ছিল তাঁর কবিরাজখানা। পার্টিশনের পর উমেশচন্দ্রর সদর হয় বাড়ির পাশের দিকে তারক দত্ত লেনের উপর। সেদিক থেকেই ওরা রাস্তায় বেরোত। রোহিণী জানতই না যে উনি কবিরাজ ছিলেন। শোভনেশও তাকে বলেনি।

"আপনি দেখেছেন ওনাকে?"

"নিশ্চয়, উনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমি, দিদি, বাবা বহুবার গেছি ওঁর কবিরাজখানায়। গেলেই চামচে করে ভাস্কর লবণ হাতে দিতেন। ওই ভাস্কর লবণের লোভে আমি আর দিদি প্রায়ই যেতাম। উনি সাত-আট বছর আগে মারা গেছেন।"

"এখন কে কবিরাজি করেন, ওঁর ছেলে ?"

"উনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কবিরাজখানাটা উঠে গেছে।"

রোহিণী তার নোটবই বার করল। মীনা তাই দেখে চুপচাপ বসে থাকা ঘরের অন্য তিনজন লোকেদের উদ্দেশে বলল, "তা হলে আপনাদের ডিসিশন পরশুর মধ্যেই জানিয়ে দেবেন।"

তিনজন উঠে দাঁড়াল।

"কালই জানিয়ে দিতে পারব বোধহয়।" কথাটা বলে মাঝবয়সী হাওয়াই শার্ট পরা লোকটি চোখের ইশারায় মীনাকে দরজার কাছে যেতে বলল। মীনা উঠে গেল কাঠের পার্টিশনের ওধারে।

রোহিণী দু একটা সংলাপ শুনতে পেল।

"না না ওর কমে..."

"লাইনে নতুন এসেছে. একটু বিবেচনা করো।"

"করেছি। স্ক্রিপ্ট অতি বাজে, এ ছবিতে, আমার বদনামই হবে বাচ্চুদা..."

ফিসফিস আরো কিছু কথা হবার পর মীনা ফিরে এল। ঘরের একধারে দেয়াল ঘেঁসে একটা টেবল। তার ড্রয়ার থেকে জেরক্স করা তিন পাতা কাগজ বার করে এনে সে রোহিণীকে দিল।

"এত লোক জিজ্ঞেস করে যে, জবাব দিতে দিতে মুখে ব্যথা-হয়ে গেছে। তাই টাইপ করে জেরক্স করিয়ে রেখেছি। বোম্বাইয়ের জেট সেট আর স্টারডাস্টকে এরই কপি দিয়েছি। আমার সম্পর্কে যা যা জানার কৌতূহল হতে পারে, বোধহয় তার সবেরই উত্তর এতে আছে। তবু পড়ে নিন, এর বাইরে যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তো প্রশ্ন করুন। .. একসকিউজ মী, আমি একটু ভিতর থেকে আসছি।"

রোহিণীর মনে হল, ভিতর থেকে কেউ ইশারা করে ওকে ডেকে নিল। সুভাষ গায়েন কোথায় ? ভিতরে রয়েছে কি ? ওকেই তো তার দরকার। আসলে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যই তো তার আসা।

জোড়াবাগান থেকে উঠে এসে মীনারা যে শোভনেশদের পাশের পাড়াতেই একসময় ছিল, এটা সে সিধাবথ সিনহার লেখাতেই পেয়েছে। বীণার সঙ্গে শোভনেশের পরিচয় কবিরাজের কাছে যাতায়াতের সময়ই যে হয়েছিল, এই খবরও লেখায় আছে। তখন বীণার বয়স কতই বা ছিল, সতেরো, আঠারো ! এই বয়সের মেয়েরা চট করে মুগ্ধ হয় গাইয়ে, গল্প লিখিয়ে, ছবি আঁকিয়েদের মত লোকেদের সংস্পর্শে এলে। কিন্তু মৃত্যুর সময় বীণা অবিবাহিতা ছিল না, অন্তত সিধারথ সিনহার লেখাটায় তাই লেখা আছে। নিছকই অনুমানের ভিত্তিতে বলা। কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সেটা বলতে পারেনি। কোর্টে বিচারের সময়ও প্রসঙ্গটা উঠেছিল। কিন্তু বীণার স্বামী যে কে ছিল, তার কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করা যায়নি। রোহিণীর অনুমান, সুভাষ গায়েনই সেই স্বামী।

লোকটা যদিও পরশু তাকে বলল, শোভনেশ যে বীণাকে নষ্ট করে পচিয়ে দিয়েছে, তা সে জানত না, জানলে শোভনেশকে খুন করে সে-ই নাকি জেলে যেত। কিন্তু এখন "ভস্মীভূত শিল্পীরা" পড়ার পর অনেকের অনেক কথাই তার মিথ্যা মনে হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে বীণা ও শোভনেশের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সুভাষ গায়েন তা জানত। খুব ভাল করেই জানত।

এইসব ভাবতে ভাবতে রোহিণী জেরক্স করা কাগজগুলোয় চোখ বোলাচ্ছিল।

একজায়গায় দেখল, মীনার প্রিয় খাদ্য : মোয়া, পরিজ, পাবদা মাছ, লস্যি। প্রিয় লেখক : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গোর্কি, শালর্ক হোমস। (অবশ্য নামটা কেটে কে যেন লাল কালিতে কোনান ডয়েল লিখেছে)। সংস্কার : প্রথমে বাঁ পায়ে জুতো পরা। ভয় : ভূত এবং ইন্টারভিউ দেওয়া। বাতিক : ভোরের সূর্য দেখা। ব্যায়াম : বুল ওয়ার্কার নিয়ে। প্রিয় খেলোয়াড় ম্যাকেনরো ও ভিভ রিচার্ডস্। প্রিয় খেলা : স্কোয়াশ। পড়তে পড়তে রোহিণীর ঠোঁট মুচড়ে উঠল। নিশ্চয় কেউ লিখে দিয়েছে। বুল ওয়ার্কার! স্কোয়াশ! গোর্কি! ম্যাকেনরো! আবার মোয়াও! হঠাৎ তার চোখে পড়ল—প্রিয় ইচ্ছা : কৈশোর জীবনে ফিরে যাওয়া। কি আশ্চর্য, এতক্ষণ এটাই চোখে পড়েনি! মীনাকে তো এটা নিয়েই প্রশ্ন করা যায়।

মীনা ফিরে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই।

"পড়লেন?"

"সব নয়, খানিকটা। খুব উইটি উত্তরগুলো। এর মধ্য থেকেই আপনার চরিত্র অনেকটা ধরা যায়।"

"কি ধরা যায়?" মীনা উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল।

"আপনার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম আর্টিস্টিক বোধ রয়েছে, যেটা ফাইন আর্টের শিল্পীদের মধ্যে পাওয়া যায়। মনে হচ্ছে আপনি আর্টের ভক্ত। আর্ট মানে স্কালপচারস, পেইন্টিংস, এইসব আর কি।"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন।" তাকিয়াটা কোলে নিয়ে মীনা কুঁজো হয়ে বলল, "কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ির পিছনের অংশে ওনার ভাইপো থাকতেন, তিনি ছবি আঁকতেন। আমি আর দিদি গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। দেখতে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হত আমিও শিল্পী হব, ছবি আঁকব, স্রষ্টা হব।"

রোহিণীর মনে হল, এইবার মীনার আবেগ আসবে। সৃষ্টির কাজকর্মে নেমে পড়লে আর ওকে থামানো যাবে না। এখনি একটা বাঁধ তুলে আবেগের স্রোত থামাতে হবে।

"আমার মনের মধ্যে কি যে তখন হত, শিল্পীর তুলির ছাপ ক্যানভাসে তো নয় যেন আমার মনের ক্যানভাসেই রঙ ধরাত।"

"মিস চ্যাটার্জি, সেই শিল্পীর নাম কি?"

"শোভনেশ সেনগুপ্ত।"

"কোথায় তিনি আঁকতেন?"

"ওঁদের দোতলায়। লম্বা একটা বড় ঘরে।"

"বাড়িতে আর কেউ ছিল?"

"বাবা ছিল। যত দূর মনে হয়, আর কাউকে দেখিনি। প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা তো।"

"আর্টিস্টের স্ত্রী বা অন্য কেউ? বন্ধুবান্ধব?"

"স্ত্রী ছিল। শুনেছি, অসুখে না কিসে যেন মারা গেছে। আর বেঁটে মোটা একটা লোককে দু-একবার দেখেছি, বন্ধুই হবে।"

"উনি আপনাদের সঙ্গে কথাটথা বলতেন?"

"হ্যাঁ। ছবি বোঝাতেন। আঁকা কেমন করে হয়, মনের মধ্যে কিরকম অবস্থা থাকে আঁকার সময়—এইসব শুনতে শুনতেই বোধহয় আমি আর্টিস্টিক সেন্সটা পেয়েছি।"

"উনি কখনো আপনাদের ছবি আঁকেননি?"

"নিশ্চয়।" মীনার গলায় উঁকি দিল ঈষৎ গর্ব। "আমার মুখ এঁকেছিলেন।"

"আর দিদির ?"

মীনা উত্তর দিতে একটু সময় নিল। রোহিণীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কের মত বলল, "হ্যাঁ, দিদিরও।"

"আছে আপনার কাছে কোন ছবি ?"

"না নেই।" মীনার উত্তরটা এত দ্রুত এল যে, রোহিণীর পরের প্রশ্ন পিছু হটে গেল।

"আচ্ছা ওনার সঙ্গে কোথায় দেখা করা যাবে, মানে কোথায় এখন আছেন ? তা হলে জেনে নিতাম আপনার সম্পর্কে ওনার ইম্প্রেশনটা।"

মীনা হাসল। হাসিটার দশ-বারো রকমের অর্থ করা যায়। "ওঁকে পাওয়া শক্ত। তা হলে আপনাকে বহরমপুর জেলে যেতে হবে। ওখানে আছেন খুনের আসামী হয়ে।"

"খুন করেছেন !" রোহিণী আঁতকে ওঠার চেষ্টা করে দেখাল। "কাকে ?"

'একজনকে। নাম বললে আপনি চিনবেন না। একটি মেয়ে, যে ওঁর ছবির মডেল হত। ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড।" হঠাৎ সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে মীনা এবার যা বলল, তা শোনার জন্য রোহিণী একদমই তৈরি ছিল না।

"ভুল লোককে যাবজ্জীবন দিয়েছে। ইনোসেন্ট লোককে শাস্তি দিয়েছে। উনি খুন করে কোন দোষ করেননি। শোভনেশ সেনগুপ্তকে মেয়েটি ঠকিয়েছে। চিট করেছে। শুধু ওঁকেই নয়, আর একটি লোককেও ঠকিয়েছে, স্বামীকে।"

"ওহ বিবাহিতা ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আমি ছাড়া আর কেউই জানত না। শোভনেশ সেনগুপ্তও জানতেন না। আবার স্বামীও জানত না শোভনেশের প্রেমিকা তার স্ত্রী। এই ধরনের মেয়েদের আমি ঘৃণা করি। করা উচিত নয় কি ?" মীনা দেখল, রোহিণী নোট বইয়ে দ্রুত লিখছে। সন্তুষ্ট গলায় সে আবার বলল "আমার কোন নিকট আত্মীয়াও যদি এমন কাজ করে, তা হলেও আমি ক্ষমা করব না।"

"আপনি দেখছি অত্যন্ত নিরপেক্ষ। চিটারদের সম্পর্কে কোন মোহ নেই, দুর্বলতা নেই।"

"কারেক্ট। আপনি আমাকে ঠিকই বুঝেছেন। মানুষের মন নিয়ে যারা ঠকানোর কারবার করে, তারাই আসল খুনী।"

রোহিণীর মনে হল, মীনার কথাগুলোর মধ্যে আন্তরিকতা রয়েছে, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। নিজের দিদিকে যখন ঘৃণা করছে, বুঝতে হবে ঘটনাটা তার মনের গভীরে দাগা দিয়েছে।

রোহিণী এবার সাহসভরে, শালীনতার গণ্ডি পেরিয়ে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে একটা প্রশ্ন করব ?"

মীনা কৌতূহলভরে তাকিয়ে বলল, "করুন।"

"আপনি বোধহয় শোভনেশ সেনগুপ্তকে ভালবেসেছিলেন ? এখনো দুর্বলতা রয়েছে।"

যেন ভীষণ মজার কথা শুনল, এমন ভাবে মীনা হেসে উঠল। "আমার তো তখন বারো বছর বয়স, যখন ওই বাড়িতে প্রথম ওঁকে দেখি।"

রোহিণী নিমেষে যোগটা করে ফেলল। কুড়ি আর বারো, তা হলে মীনার বয়স এখন বত্রিশ।

"ভালবাসাটাসার কিছুই তখন বুঝি না, তবে মানুষটাকে আমার ভাল লাগত। ছবি নিয়ে যেমন পরিশ্রম করতেন, তেমনি সিনসিয়ারও ছিলেন। বলতে পারেন, এই দুটো গুণ আমি ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। এটা অবশ্যই উল্লেখ করবেন।"

"ওঁর আঁকা কোন ছবি যদি দেখতে পেতাম। আপনার কাছে যা শুনছি, তাতে ভীষণ ইচ্ছে করছে ওনার কোন কাজ দেখতে।"

মীনা ইতস্তত করল।

যে ছবিটা শোভনেশ আর গঙ্গাপ্রসাদ রোহিণীকে তার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এসেছিল, সেটা বোম্বাইয়ে দিদির কাছে যাবার সময় সে গঙ্গাপ্রসাদকে দিয়ে দেয়। চমৎকার ছবিটা। চোখ পড়লে কিছুক্ষণ না তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফেরানো যেত না। এই মুহূর্তে রোহিণীর আফশোস হল। না দিলেই হতো।

"আসুন আমার সঙ্গে। অনেক খুঁজে একটা ছবি সংগ্রহ করেছি।"

মীনা উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে সেই দরজাটা খুলল, পরশু যেটা দিয়ে রোহিণী ঘরের দেয়ালে বীণার ন্যুড ছবিটা দেখেছিল।

"ভেতরে আসুন...আমার বেডরুম।"

ফিল্ম তারকার শয়নকক্ষে ঢোকার সুযোগ পেয়ে রোহিণী যতটা না রোমাঞ্চিত হল, তার থেকেও বেশি বিস্মিত হল, ছবিটা এখন আর দেয়ালে নেই, রয়েছে একটা চেয়ারের উপর। চেয়ারটা রয়েছে ঘরের মাঝামাঝি। বিছানায় কাত হয়ে শুলে দৃষ্টির সমান্তরাল স্তরে ছবিটা দেখা যায়।

"বরাবরই কি এইভাবে ছবিটা রাখা?"

"হ্যাঁ। আমি রোজ ঘুমোবার আগে ছবিটাকে দেখি।"

মীনা কি মিথ্যা কথা বলল? পরশু সন্ধ্যায় সে ছবিটা দেয়ালেই দেখেছিল। কিংবা রাত্রে নামায়, আবার কোন এক সময় তুলে দেয় দেয়ালে। রোহিণী একটি ব্যাপারে নিশ্চিত হল, সুভাষ গায়েন তার আসল পরিচয়টা মীনাকে জানায়নি। সে শোভনেশের স্ত্রী, এই কথাটা জানলে মীনার ব্যবহার অন্যরকম হত। এত কথাও বলত না, ঘরে ডেকে নিয়ে ছবিটাও দেখাত না।

"দেখতে দেখতে জানেন, আমি এই জগত থেকে অন্য জগতে চলে যাই।"

"আমারও সেই রকম লাগছে। কী অসাধারণভাবে বডি কার্ভসগুলো এসেছে। সো সফট, টেন্ডার অ্যান্ড রিয়্যাল। বিদেশী ক্লাসিকাল মাস্টার্সদের যে কোন ভাল কাজের সঙ্গে তুলনীয়! দেখে ইচ্ছে করছে এই রকম আর্টিস্টের মডেল হতে...অবশ্য ওইরকম বডি আমার নেই।"

"কে বলল নেই। আমার দিদির পর এই আপনাকে দেখেই মনে হয়েছে, আপনার স্কিন, আপনার ফ্লেশ, ভলিউম, স্ট্রাকচার, প্রোপোরশন, শোভনকাকা ঝাঁপিয়ে পড়তেন।"

পড়তেন নয়, পড়েছিলেন। রোহিণীর চোখে পলকের জন্য ঝলসে উঠল শোভনেশের উন্মাদের মত চাহনি, সাঁড়াশির মত আঙুলগুলো, দুটো কাঁধ চেপে ঠাণ্ডা গলার কথা 'তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন?' পড়পড় করে ব্লাউজ ছেঁড়ার শব্দ! ধাক্কা দিয়ে তাকে ডিভানে ফেলে দেওয়া।

"আপনার দিদির পর বললেন কেন?" রোহিণী কৌতূহলের মধ্যে প্রভূত সারল্য মিশিয়ে বলল।

"আমার দিদিরও—" মীনা ছবির দিকে ঝুঁকে তাকাল। "চমৎকার বডি ছিল। হিংসে

করতাম দিদিকে। লোকে তাকিয়ে থাকত রাস্তা দিয়ে হাঁটলে।"

"তিনি এখন কোথায় ?"

মীনা ঝুঁকে ছবি নিরীক্ষণের ভান করছে, রোহিণীর প্রশ্নটা যেন শুনতে পায়নি এমন একটা ভাব করে।

"আপনার দিদি এখন কি করেন ?" রোহিণী নাছোড়বান্দা। মীনা কিভাবে মিথ্যা কথাটা বলে সেটাতেই সে কৌতূহলী।

"দিদি..." যেন চট্‌কা ভাঙল। "দিদি বিয়ে-থা করে সংসার করছে।" মীনা শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল।

"আপনি এখনো বিয়ে করেননি। কেন ?" কথার পিঠে কথায় প্রশ্নটা করার সুযোগ পেয়ে রোহিণী করেই ফেলল।

"এমনি। করার মত মানুষ পাইনি, পেলে নিশ্চয় করব।" মীনা হালকা সুরে বলল। রোহিণী নোট বইয়ে কলমের আঁচড় দিল।

"কি ধরনের মানুষ পেলে আপনি বিয়ের কথা ভাববেন ?" বাঁধা গৎ-এর প্রশ্ন। পৃথিবীর হাজার দশেক অভিনেত্রীকে এই প্রশ্নটা করা হয়ে গেছে, তিন হাজার খ্রিস্টাব্দেও করা হবে। পাঠকরা বা ভক্তরা নাকি এই সব খবর জানতে চায়। রোহিণীর মনে হল, মীনা যেন জানেই এই রকম প্রশ্ন তাকে করা হবে।

"আমি লম্বা পুরুষমানুষ পছন্দ করি। ছিপছিপে গড়ন হবে। মাথায় প্রচুর কালো চুলের মধ্যে কিছু কিছু রুপোলি ঝিলিক দেবে। গায়ের রঙ তামাটে হবে। মুখে চোখা বুদ্ধির ছাপ থাকবে। আর হতে হবে সহৃদয়। আমার নিশ্চয় অনেক দোষ আছে, বোকামি আছে, অজ্ঞতা আছে, সেগুলো নিয়ে বিরক্ত হবে না, কারণগুলো দেখিয়ে শুধরে দেবে। মোট কথা আমাকে প্রভাবিত করবে তার ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি দিয়ে। মুগ্ধ করতে পারলে তো আরো ভাল।"

"কিরকম পেশার লোক পছন্দ করেন ? মালটি ন্যাশনাল কোম্পানির কোন বড়কর্তা ? আই এ এস ? ব্যবসায়ী ? পলিটিশিয়ান ? বা এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার ? বা..."।

"না না এসব নয়, এসব নয়। এমন কি অমিতাভ বচ্চনও নয়, সুনীল গাওস্করও নয়। আমি বিরাট খ্যাতি, বিরাট বিত্ত নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না।"

রোহিণীর মনে এল, একটু আগেই মীনা যে কথা লোকগুলিকে বলল : 'না না এর কমে...।' টাকার ব্যাপারে মনে হয় মীনা একটু মীন টাইপেরই। বদনাম হতে পারে এমন ছবিতেও অভিনয়ে রাজী, যদি টাকা সেটা পুষিয়ে দেয়।

"আমি সত্যিকারের একজন পুরুষ চাই, যার কাছে ক্রীতদাসী হয়েও সুখ পাব। আর এরকম লোক তো ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টদের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব, তাই না।"

ঘোড়ার ডিম সম্ভব। রোহিণী মনে মনে হেসে উঠলেও, গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, পাওয়া নিশ্চয় সম্ভব।" কি ধরনের আর্টিস্টদের কথা আপনি ভেবেছেন, 'আমির খাঁ, রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ রায় ? নাকি জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ...কিংবা রামকিঙ্কর কিংবা শম্ভু মিত্র কিংবা—।"

"আপনি দেখছি ক্যাটালগ খুলে আউড়ে যাচ্ছেন। ওই সব তিমি মাছের পাশে আমি তো তেলাপিয়া !"

"তা কেন, আপনিও ব্‌া কম কিসে ?"

"অনেক কম, কনেক কম। আমার লিমিটেশনস কিছু কিছু বুঝতে পারি। যেটা বেশির ভাগ লোকই পারে না। আমি একজনকে জানি, যে নিজের সীমাবদ্ধতা না বুঝে মনে মনে এক ছবি আঁকিয়েকে ভালবেসেছিল। কিন্তু সেই ভালবাসা যখন প্রকাশ করল, তখন সেই লোকটি তাকে নিজের মেয়েকে বোঝাবার মত বোঝাল, আদর করল, শাসন করল। বলল, 'আমি তোমাকে অন্যভাবে পেতে চাই। সন্তানের মত।' মেয়েটির জীবন তিনি ঘুরিয়ে দিলেন।"

রোহিণী যেন মীনার চোখের কোণে জল দেখতে পেল। শোভনেশই। নিশ্চয় তার কথাই বলছে। এই প্রথম সে একজনকে পেল, যার চোখে জল এল শোভনেশের কথা বলতে গিয়ে।

"এই জন্যই আমি সহৃদয় মানুষের কথা ভাবি। আচ্ছা, আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, উত্তর দেবেন ?"

"দেব, যদি সাধ্যে কুলোয়।"

"আপনি বিয়ে করেছেন ?"

জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে এমন প্রশ্ন করল। রোহিণী জবাবটা সহজেই দিতে পারত, যদি প্রশ্নটা মীনার কাছ থেকে না আসত। সিঁদুর বা শাঁখা থাকলে প্রশ্নটা উঠতই না। এখন ইতস্তত করলে একটা সন্দেহ মীনার মনে জাল বুনবে।

"হ্যাঁ আমি বিবাহিতা। সিঁদুর পরি না বলে অনেকে বুঝতে পারে না।"

"পরেন না কেন ?"

"শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই যে, শাঁখা-সিঁদুর পরতেই হবে। ভারতে বহু হিন্দু সমাজে এসব পরার রীতিই নেই।"

"আপনার স্বামী চান না এসব পরুন ?"

"হ্যাঁ পছন্দ করতেন। তবে সেটা সৌন্দর্যের কারণে, ধর্মটর্ম বা রীতি মানার জন্য. নয়। বলতেন কিছু কিছু মুখ আশ্চর্যভাবে রূপসী হয়ে যায় একটা টিপ বা একটা লাল রেখার জন্য।"

"আপনি 'করতেন', 'বলতেন', এভাবে বলছেন কেন ? আপনি কি বিধবা ?"

"ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।"

"ওহ্। কি করেন উনি।"

এখন ঘানিটানি ঘোরান কি পাথর ভাঙেন। বা কলকাতায় ঘোবাঘুরি করছেন, হয়তো আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—যদি এই রকম উত্তর দেয় তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন আবার আসবে। আর যদি বলেই দেয়, যে লোকটিকে আপনি ভালবেসেছিলেন, এখনো যাকে মনে মনে পুজো করেন, রোজ যার আঁকা ছবি না দেখে ঘুমোতে পারেন না, তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছিল, তিনিই আমার স্বামী ! তাহলে মীনা চ্যাটার্জির মুখের অবস্থাটা এখন কেমন হবে ?

রোহিণী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রসঙ্গটা বোধহয় অস্বস্তিতে ফেলেছে, এই ভেবে মীনা বলল, "যাক্। আর কি প্রশ্ন করার আছে, করুন।"

যাক কেন ? হঠাৎ রোহিণীর মাথার মধ্যে একটা রাগ জমে উঠতে শুরু করল। তোমার কাছে গোপন করতে হবে, এমন কি গুপ্তকথা এটা ? আর তুমিই বা কী এমন গুরুত্বপূর্ণ লোক যে, স্বামীর নাম বললে সর্বনাশ হয়ে যাবে ? তোমার অনুগ্রহ নিয়ে তো আমার জীবন চলে না !

"প্রশ্ন নয়, আপনার কথাটার উত্তর দেব কিনা তাই ভাবছি। কেননা, যা বলব সেটা আপনার কাছে পৃথিবীর নবম বা দশম আশ্চর্য বলে মনে হবে।"

"কিরকম ?" মীনা আড়ষ্ট কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল।

"শোভনেশ সেনগুপ্ত বিয়ে করেছিলেন জেলে যাবার ছ' মাস আগে, সেটা নিশ্চয় জানেন।"

"হ্যাঁ।"

"বৌকে দেখেছেন ?"

মীনা স্থির দৃষ্টিতে রোহিণীর মুখের উপর চোখ রাখল। চোখের মণির আকার, রঙ, যেন বদলাচ্ছে। রগের কাছে দপদপ করল। ঠোঁট দুটি খুলে যাচ্ছে। মুখের পাতলা চামড়ার নিচে পাণ্ডুর রঙ ফুটে উঠছে।

"আমার দিদিকে আপনি দেখেছেন ?'

"না।"

"মুখটুকু বাদ দিলে হুবহু আপনিই। এখন মনে হচ্ছে, শোভন কাকা কেন বিয়ে করেছিলেন।"

"কিন্তু খুন করলেন কেন ?"

"সেটা আপনিই বলতে পারবেন। আপনি তখন ওই বাড়ির বাসিন্দা, ওঁর কাছের লোক। আমি কোন কারণ বার করতে পারিনি।"

"আমিও না।"

"উনি কি বিয়ে করে সুখী হননি ?"

"আমার পক্ষে যা সম্ভব, তা করবার চেষ্টা করেছি। যা অসম্ভব ছিল তা পারিনি।"

"কি অসম্ভব ছিল ?"

"ওর ছবি আঁকার মডেল হওয়া, যেটা আপনার দিদি পেরেছিলেন।"

মীনার মুখটা ধীরে ধীরে ফিরল ছবিটার দিকে। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। রোহিণীর কাছে এই মুহূর্তগুলো করুণ লাগছে। ওর মনের মধ্যে এখন কি ভাবনা চলছে, তা বোঝার উপায় নেই। বোধহয় কিছুই ভাবছে না। শূন্যতায় ভরা।

"একটা কথা আপনি জানেন না, জানা সম্ভবও নয়…।"

রোহিণী থেমে গিয়ে পরিস্থিতিটা নাটকীয় করে তুলল। মীনার চোখ থেকে শূন্যতা সরে গিয়ে ফিরে এল অনুভব ক্ষমতা।

"কী জানি না ?"

"শোভনেশ কয়েক দিন আগে পালিয়েছে বহরমপুর থেকে। হাসপাতালে ছিল আর একজন কয়েদির সঙ্গে। দু-জনে একসঙ্গে সেখান থেকে পালিয়েছে।"

"কোথায় এখন !" মীনা দাঁড়িয়ে উঠল। উত্তেজনা যেন তার সর্বাঙ্গে হুল ফুটিয়েছে। ছটফট করে সে আবার বলল, "আপনার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে ?"

"না।"

"দেখা হবে ?"

"বলতে পারব না।"

"আমার কথা বলবেন ?"

"নিশ্চয়, যদি দেখা হয়। কিন্তু আমি মোটেই দেখা হওয়ার জন্য ব্যস্ত নই। আমার জীবন থেকে তাকে মুছে ফেলেছি।" রোহিণীর স্বর আপনা থেকেই কর্কশ হয়ে উঠল।

"আমার আর তাকে প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু আমার আছে।" মীনা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, "ভোলা সম্ভব নয়।"

রোহিণী নীরবে তাকিয়ে। মীনা বসার জন্য পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে বিছানাটা খুঁজছে। চোখ দুটি সুদূর অতীতে। ধীরে ধীরে নিজেকে সে বিছানায় নামিয়ে দিল।

"আমি এবার যাই।" নরম গলায় রোহিণী বলল।

মীনার কানে কথাটা ঢুকল না। সে একদৃষ্টে ছবির দিকে তাকিয়ে।

"বছর চারেক আগে আমি দেখা করতে গেছিলাম। লুকিয়েই। বললেন, মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই, প্রকৃতির ছবি আঁকতে চাই। এখান থেকে বেরোতে চাই। আর নারীদেহ নয়।"

"আর কি বললেন ?" রোহিণীর আগ্রহ আবার ফিরে এল। শোভনেশের চরিত্রের আর একটা দিক খুলে যাচ্ছে।

"ছবি আঁকার কিছু এখনো শেখা হয়নি। আবার অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করতে চাই। যা এঁকেছি সব বাজে নষ্ট মনের কাজ। ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা উচিত। লোকের চোখে যাতে না পড়ে, সেজন্য ধ্বংস করে ফেলা দরকার। আপনি কি জানেন, ওঁর আঁকা ছবিগুলো এখন কোথায় ?"

"আমি চল্লিশ-পঞ্চাশটার মত ছবি দেখেছিলাম ওর স্টুডিওতে, গাদা করে একধারে রাখা ছিল। ওর বন্ধু গঙ্গাপ্রসাদ, যাকে আপনি ছোটবেলায় দেখেছেন, এখন তিনি এই মহারানীর মালিক, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেই ছবিগুলোর কি হল ? বললেন, পোকায় কেটে, বৃষ্টির জলে সব নষ্ট হয়ে গেছে।'

"সে কি ! আমি তো এই ছবিটাই তিন বছর আগে উপহার পেয়েছি একজন প্রোডিউসারের কাছ থেকে। তিনি তার মাত্র দু হপ্তা আগে কিনেছিলেন সাত হাজার টাকায়। এই সেদিনও এক আর্ট ডিলার বললেন, শোভনেশ সেনগুপ্তর ছবি নাকি এখন বাজারে একটা দুটো করে আসছে। দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা দাম।"

"আপনি উপহার পেয়েছেন, না আপনার দিদি তার এক বন্ধুর কাছে এটা রেখেছিল ?"

"তার মানে ?"

"এরকম ছবি বাড়ি নিয়ে যেতে লজ্জা হচ্ছিল বলে উনি বন্ধুকে দিয়ে দেন। এই রকমই তো শুনেছি।"

"মিথ্যে কথা। কে বলেছে আপনাকে ?"

"আপনার সেক্রেটারি সুভাষ গায়েন। আগের দিন উনি আমাকে বলেছেন। আচ্ছা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কি আপনার দিদির কোন···।" রোহিণী অসম্পূর্ণ রাখল বাক্যটি।

"এর সঙ্গেই দিদির বিয়ে হয়েছিল। দিদিকে দিয়ে কয়েকটা ছবি সুভাষদা জোগাড় করে। পারভারটেড বহু পয়সাওয়ালা লোক আছে, যাদের কাছে পর্নোগ্রাফিক মূল্য ছাড়া ওই ছবির আর কোন দাম নেই। তাদের কাছে বিক্রি করে বেশ কয়েক হাজার টাকা পায়। তাইতে ওর লোভ বেড়ে যায়। দিদিকে প্রেশার দিতে থাকে, আরো ছবি নিয়ে আসার জন্য। এমনকি, ভালগার অ্যাপিল তৈরি হয় এমন পোজে ছবি আঁকিয়ে নেবার জন্যও এমন সব কাণ্ড করেছিল, যেটা প্রায় অত্যাচারেরই মত। এসব কথা দিদি আমাকে বলেছে। দিদিকে, বলতে গেলে এই সুভাষদাই নষ্ট করেছে।"

"এমন লোককে আপনি রেখেছেন কেন ?"

মীনার মুখে পাতলা হাসির মোচড় দেখা দিল। ধীর কণ্ঠে বলল, "এই লাইনে একা মেয়েছেলের জন্য পদে পদে বিপদ অপেক্ষা করে আছে। সুভাষদা অত্যন্ত বিশ্বাসী বুলডগ। হুঁশিয়ার, চতুর, আমার ভালর জন্য সব করতে পারে। টাকাকড়িব ব্যাপারেও বিশ্বস্ত। দিদির মৃত্যুর পর আমি ওকে ডেকে আনি। যদিও ওকে আমি ঘৃণা করি।"

"যে প্রোডিউসার ছবিটা আপনাকে দিয়েছেন, তাঁর নাম কি? তিনি কাব কাছ থেকে কিনেছিলেন, সেটা কি জানেন?"

"জগন্নাথ ঘোষ, মাস ছয়েক আগে মারা গেছেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তো অবশ্যই, কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন, কিছুতেই বলা যাবে না কাব কাছ থেকে কিনেছেন। তখন আমি বলি, এই আর্টিস্টের আরো ছবি থাকলে কিনব। দিন তিনেক পর তিনি বললেন, আর ছবি নেই।"

"শোভনেশ আর কিছু কি আপনাকে বলেছিল?" রোহিণী আবার শুরুতে ফিরে যাবার জন্য বলল। শোভনেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহটা ক্রমশই তার বাড়ছে। মীনা যে মিথ্যা বলছে না, এই বিশ্বাস তার এখন হচ্ছে। শুধু একটা ধাঁধা তৈরি হল, শোভনেশের ছবি কোন এক জায়গা থেকে বিক্রির জন্য বাজারে আসছে আব ছবির দাম বেড়েছে। কেউ একজন টাকা করছে।

"আমাকে বলেছিলেন আর যেন ওঁর সঙ্গে দেখা না করি। কোনবকম ভাবে যোগাযোগ না করি অতীতকে একদমই ভুলে যেতে চান। নতুন মানুষ হতে চান। তা সত্ত্বেও আমি আবার গেছিলাম। দেখা করেননি।"

"আপনি কি ওকে স্বাভাবিক দেখেছিলেন? মানে কোনবকম মানসিক অসঙ্গতি কি কথা-বার্তায় ছিল?"

"আপনার আমার মতই পাবফেক্ট। বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন, পাগল হয়েছেন কি না?"

রোহিণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ বোধ করল। সোজাসুজি কারুর উপর মস্তিষ্ক বিকৃতির দায় চাপিয়ে দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। নিখুঁত মস্তিষ্ক কার আছে? সে নিজেও কি দাবি করতে পারে, তার কথা আর কাজ সব সময় স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়? ছ' ধাপ সিঁড়ি থেকে লাফ মারা যে কেউই শুনলে পাগল বলবে। রাতে ঘুমোবার আগে রোজ একটা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা, এটাও তো আর এক ধরনের পাগলামি!

"সবই শোনা কথা। আমিও শুনেছি। শোভন কাকার আগের জেনারেশন পর্যন্ত সত্যিই এটা ঘটেছে। ওঁর এক পিসিকে একটুখানির জন্য জানলা দিয়ে দেখেছি, একটা বন্ধ ঘরে আটকে রাখা। থুরথুরে বুড়ি। আমায় দেখে মুবগীব মত চিঁ চিঁ কবল। ভয়ে পালিয়ে আসি।"

"শোভনেশ নাকি অপেক্ষা করছিল পাগল হয়ে যাবার জন্য?"

"ওঁর জেনারেশনে দুজন, উনি আর ওঁর ভাই যাকে কবিরাজমশাই দত্তক নিয়েছিলেন। তাকে কি আপনি দেখেছেন?"

রোহিণী দেখেছে পরমেশকে। দুই ভাইয়ের মধ্যে চেহারায় অদ্ভুত সাদৃশ্য। ছাদ দিয়ে বাড়ির দুই অংশে যাতায়াত করা যেত। পরমেশ চুপিসাড়ে আসত একটি উদ্দেশ্যেই। যখন শোভনেশ আঁকত, তখন স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে দিত। স্টুডিওর বাইরের জানলা ছাড়াও ভিতরের বারান্দার দিকেও খড়খড়ির জানলা আছে। তারই পাখি তুলে সে দেখত নগ্ন মডেল বীণাকে। রোহিণী এ খবর পেয়েছিল বাড়ির ঠিকে ঝিয়ের কাছ থেকে। সে

একদিন পরমেশকে কুঁজো হয়ে পাখি তুলে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল। ঝি জানত, দাদাবাবু এখন বীণা দিদির ছবি আঁকছে। ধরা পড়েই পরমেশ ছুটে সিঁড়ি দিয়ে পালায়। ঝি ব্যাপারটা শোভনেশকে বলে। সে গিয়ে পরমেশকে ধমকায়, মারধোরও নাকি করে। ছাদের দরজায় চাবি দিয়ে শোভনেশ তারপর ছবি আঁকত।

পরমেশকে রোহিণী পাশের ছাদ থেকে স্টুডিওর দিকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকতে দেখেছে। তিনতলায় একটা ঘরের জানলার ভাঙা পাল্লার ফাঁক থেকেও ওকে তাকাতে দেখেছে। রোহিণীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই চট করে সরে যেত। ব্যাপারটা বুঝতে তার বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামাতে হয়নি। তারপর থেকে জানলার কাছে যাবার বা বাড়ি থেকে বেরোবার আগে সে আঁচল টেনে ঢেকে নিত নিজেকে। মীনার কথার উত্তরে সে বলল, "হ্যাঁ পরমেশকে মাঝে মাঝে দেখেছি।"

"একবার ওর খবর নিলে ভাল হয়। যদি রটনাটা সত্যিই হয়। তাহলে পরমেশের কিছু হয়েছে কিনা সেটা তো দেখা দরকার।"

"আমার আর কোন দরকার নেই। তবে পরমেশের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার বোধহয় আছে। যাকগে, এখন আমি চলি। জানি না, শোভনেশ এখন কোথায় কি করছে। পুলিশ নিশ্চয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"আপনার কাছে আসতে পারেন।"

"পারে, নাও পারে। ঠিকানা তো জানে না। তবে মহারানীর অফিস ও চেনে। সেখান থেকে জোগাড় করা তো সহজই।" রোহিণী নিরাসক্ত স্বরে বলল।

"যদি যান আপনার কাছে, কি করবেন ?" মীনা ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল। "আপনি কি পুলিশ ডাকবেন ?"

ফাঁপরে পড়ল রোহিণী। এমন অবস্থা হলে সত্যিই তো, সে ভেবে দেখেনি কি করবে ! ফাঁকা ফ্ল্যাটে সে আর শোভনেশ ! চিন্তা করা যায় না। থাকতে চায় যদি ? যদি গলা-টলা টিপে ধরে ? যদি বলে কিছু টাকা দাও চলে যাব, তাহলে যা আছে সব দিয়ে দেবে।

"জানি না কি করব।" অসহায়ভাবে রোহিণী বলল।

"আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ?" মীনা হাত চেপে ধরল রোহিণীর। "আমি ওঁকে লুকিয়ে রাখব। ওঁকে দিয়ে ছবি আঁকাব।"

রোহিণী যখন লিফটের জন্য অপেক্ষা করছে, তখন মীনা সম্পর্কে তার ধারণা বদলে গেছে। 'আর্টিস্টিক সেন্স' নিয়ে যে ব্যঙ্গটা তার মনে বুদ্বুদ কেটেছিল, সেটা আর নেই। মনে হল, মেয়েটির গভীরতা আছে।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে পা দিতেই প্লেনের আওয়াজে আকাশের দিকে মুখ তুলল। রাজেন এতক্ষণে দিল্লিতে পৌঁছে গেছে। বিকেলে জয়পুরের ফ্লাইট ধরবে। আর তাকে এখন আশুতোষ কলেজে গিয়ে সিধারথ সিনহার খোঁজ করতে হবে।

"মীনার ইন্টারভিউ নেওয়া হল ?"

রোহিণীর পিঠের কাছ থেকে বলে উঠল সুভাষ গায়েন।

সুভাষ গায়েনের লম্বা গলার পাটকাঠির মত সরু দেহটি সামনে ঝোঁকানো, মনে হয়

যেন বিনয়ের চাপে ধুঁকছে। ধুতি আর পাঞ্জাবি সেদিনের মতই সদ্য পাটভাঙা। আবার সে বলল, "মীনার ইন্টারভিউ নেওয়া হল ?"

"হ্যাঁ।" রোহিণী খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সুভাষ গায়েনের মুখটি। মিথ্যাবাদীদের মুখে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটা এবার থেকে তাকে জানতে হবে। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হল। এখন ওর মুখ আর প্রার্থনাসভায় রামধুন শ্রবণরত গান্ধীজির মুখ প্রায় একই রকম।

"মীনা খুব ভাল ইন্টারভিউ দেয়। আমি থাকলে ও ভাল করে কথা বলতে পারে না, তাই ওই সময়টা থাকি না।"

"কি করেন তখন ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন, রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকি।"

"মীনাকে আপনি আমার পরিচয়টা দেননি ?"

"নাহ্, দিতে যাব কেন ? আপনি একটা ম্যাগাজিন থেকে এসেছেন একটা কাজে, আপনার পরিচয় হল ইন্টারভিউয়ার, ব্যাস।"

রোহিণী ঘড়ি দেখল। দুধারে তাকিয়ে বলল, "ভবানীপুর যাব, বাস বা মিনিবাস এখান থেকে পাওয়া যাবে কি ?"

"একটু হেঁটে যদি সার্কুলার রোডে যান, তাহলে পাবেন।" সুভাষ গায়েন আঙুল তুলে দেখাল কোন রাস্তা ধরে হাঁটতে হবে। রোহিণী সেই আঙুলের ডগামত হাঁটার জন্য দু'পা গিয়েই ফিরে দাঁড়াল।

"আমি কিন্তু ওকে বলেছি আমি শোভনেশের স্ত্রী।"

যা দেখার জন্য রোহিণী কথাটা বলল, ঠিক তাই দেখতে পেল। সুভাষ গায়েনের মুখে চমকানিটা গান্ধীজির প্রশান্তিকে খানখান করে একটা নাথুরাম গডসে হয়ে বেরিয়ে এল।

"সে কি, বলতে গেলেন কেন ? তা মীনা কি বলল ?"

রোহিণী তখন হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। প্রায় দৌড়েই সুভাষ গায়েন তার পাশে এসে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

"শুনে মীনা কি বলল ?"

"অনেক কথাই বলল।"

"আমার সম্পর্কে কিছু ?"

"যৎসামান্য। তাতেই আপনাকে যা বোঝাব বুঝে গেছি।"

'কি বুঝেছেন ?"

"মিথ্যেবাদী আর···।"

দশ-বারো পা নীরব থেকে সুভাষ গায়েন বলল, "এই চায়ের দোকানটায় একটু বসবেন ? তা হলে দুটো কথা বলব।"

রোহিণী ঠিক করল, লোকটাকে এবার দুড়ুম দাড়াম কয়েকটা কথা বলবে।

রেস্টুরেন্টে এই সময় লোক থাকার কথা নয়। ফাঁকা টেবিলে ওরা বসল। দু কাপ চায়ের বরাদ্দ দিয়ে সুভাষ গায়েন বলল, "চা খাবেন তো ?"

"হ্যাঁ। বলুন কি বলবেন ?"

কি বলবে সেটা ইতিমধ্যে ঠিকই করে ফেলেছে সুভাষ গায়েন, ভনিতা না করেই শুরু করল। "আমার থেকেও অনেক বেশি মিথ্যেবাদী আপনি পাবেন। হ্যাঁ বীণা আমার বৌ, রেজিস্ট্রি বিয়ে। ওর বাড়িতে আপত্তি ছিল জাত নিয়ে আর রোজগারপতিও খুব ছিল না। ইউনিভার্সাল অপেরায় ছোটখাট পার্ট করতুম আর ম্যানেজমেন্টের এটা-ওটা কাজ···আমিই

বীণাকে যাত্রায় নিয়ে যাই। তখন ইউনিভার্সাল খাবি খাচ্ছে, পরপর তিনটে পালা ফ্লপ করে। কিন্তু পরে বুঝতে পারি, বীণাকে নিয়ে গিয়ে ভুল করেছি। অ্যাক্টিংয়ের অ্যা-ও জানত না, আর কিছু বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। চতুর্থ পালাটা ফ্লপ করতেই ইউনিভার্সালের গদি ওল্টায়। তখনই বিয়ে করি, মীনা তার একজন সাক্ষী ছিল।

"হ্যাঁ, টাকা আমাদের দরকার ছিল, আর সে জন্যই বীণার মডেলের কাজে আমি আপত্তি তো নয়ই বরং মনে-প্রাণেই চাইতাম। ওর একদমই ভাল লাগত না স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে থাকতে। পঞ্চাশ টাকা পেত, মাসে কয়েকদিন, তাও অনেক সময় টাকা বাকি থাকত। তখন একটা ডীল করি শোভনেশ সেনগুপ্তর সঙ্গে। সরাসরি আমি নয়, বীণাকে দিয়েই বলাই, নগদের বদলে ছবি দিয়ে টাকা শোধ করতে। ওই ধরনের ছবি কেনার খদ্দের অনেক আছে। তবে বিশেষ ধরনের পোজের ছবি। এমন কি এও বীণাকে দিয়ে বলাই, যদি টাকা রোজগার করতে চান তা হলে বেশি করে এই ধরনের ছবি আঁকুন, বিক্রি করে দোব পঁচিশ পারসেন্ট কমিশন নিয়ে। তখন ওনার খুব টানাটানির অবস্থা, রাজি হয়ে যান।"

চা এল। দুজনে চুমুক দিল। রোহিণীর এখন মীনাকে বলা শোভনেশের কথাগুলো মনে পড়ছে : 'যা এঁকেছি, সব বাজে। নষ্ট মনের কাজ। ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা উচিত। লোকের চোখে যাতে না পড়ে সে জন্য ধ্বংস করে ফেলা দরকার।' সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "এমন ছবি কতগুলো এঁকেছিলেন ?"

"অনেক অনেক। বিক্রি করে অন্তত হাজার তিবিশ টাকা ওঁকে পাইয়ে দিয়েছি। আমি নিজেই পরে ছবির দালাল হয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতুম। তবে বীণার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ওঁকে জানাইনি। আর বীণাও আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছিল একটা ব্যাপারে, শোভনেশ সেনগুপ্তকে ও ভালবেসে ফেলেছে। অবশ্য এটা সব বিবাহিত মেয়েই স্বামীর কাছে লুকোবে, স্বাভাবিকই।"

"আপনি জানতে পারলেন·কবে, কি ভাবে ?"

সুভাষ গায়েন লম্বা চুমুকে চা শেষ করে বলল, "আর এক কাপ খাব, আপনি ?"

রোহিণী মাথা নাড়ল। এই সময় সে এক চুমুকও চা খায় না। শুধু দোকানে বসার অজুহাত পাবার জন্য সে চা নিয়েছে, ঠোঁটে কাপ ঠেকিয়েছে মাত্র দু'বার।

"একটা লোক আমাকে উড়ো চিঠি দিয়ে জানায়। চিঠিতে যে রকম খুঁটিনাটি কথা ছিল তাতে মনে হল, লোকটি শোভনেশের ঘনিষ্ঠ, অনেকদিন ধরেই পরিচয়। তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট, এই ধরনের ছবি এঁকে নিজের ট্যালেন্টকে অসম্মান করছে এই শিল্পী, তাতে সাহায্য করছে তার মডেল। আর এই মডেল এতে রাজি হয়েছে যেহেতু সে প্রেমে পড়েছে, শিল্পীর কাছে বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ পাচ্ছে।"

"চিঠি পেয়ে আপনি কি করলেন ? বৌয়ের মডেল হওয়া বন্ধ করে দিলেন ?" রোহিণী সরলভাবে প্রশ্ন করল। সুভাষ গায়েন সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দেওয়ায় ব্যস্ত হল। বোঝাই যাচ্ছে, উত্তরটা ভেবেচিন্তে দিতে চায়।

"না, বীণাকে আমি বারণ করিনি। আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বীণা তো মরেই গেছে, টাকার জন্যই আমি ওকে চিঠির কথাটা বলিনি, ওর যাওয়াও বন্ধ করিনি। হ্যাঁ, ওকে ভাঙিয়ে টাকা রোজগারের এই পথটা আমি খোলা রাখতে চেয়েছিলুম।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রীর এটা ভাল লাগত না। তিনি আপত্তি করতেন।"

"মীনা আপনাকে বলেছে ?" সুভাষ গায়েন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাটা বলেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল। "হ্যাঁ, বীণাকে মারধোরও কিছু করেছি। তবে কি জানেন, বীণা তো যেতে চাইত নিজেই। কিন্তু ওর মাথাতেও কি করে যেন ঢুকে যায় চিন্তাটা—একটা আর্টিস্ট এই সব ছবি এঁকে নিজেকে নষ্ট করছে। কিন্তু আপনিই বলুন, আর্টিস্টকে তো আগে বাঁচতে হবে, তার তো খাওয়া-পরা দরকার, তারপর তো আর্টের চর্চা। আমি তো ওঁর অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থাই করছিলুম। ওঁকে তো আর্টের ছবি আঁকতে আমি বারণ করিনি ? তিনি যদি না আঁকেন, আমি কি করতে পারি ?"

প্রসঙ্গটা এড়াতে রোহিণী বলল, "এ সব তো তর্কের ব্যাপার। শিল্প সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের কথা ওঠে। কিন্তু আপনাকে উড়ো চিঠিটা কে লিখল বলে মনে করেন ?"

"দুটো নাম মনে হয়েছিল। শোভনেশ সেনগুপ্তর বন্ধু আপনার ম্যাগাজিনের মালিক গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি আর মীনা, এই দুজনের একজন।"

"গঙ্গাদা !"

"হ্যাঁ। এই দুজনই বীণা-শোভনেশ সম্পর্কটা জানত। শোভনেশ তার বন্ধুকে আর বীণা তার বোনকে মনের কথা খুলে বলত। ওরা দুজনে বীণাকে পবামর্শ দিয়েছিল, আমাকে ছাঁটাই করে দিতে।" সুভাষ গায়েন গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "শুধু ওর জীবন থেকেই নয়, পৃথিবী থেকেও।"

"বলেন কি ! ...খুন !"

সুভাষ গায়েন মাথাটা হেলিয়ে দিল।

"চেষ্টাও হয়েছিল। প্রথ'ম বিষ দিয়ে, তারপব গাড়ি চাপা দিয়ে। দুটোতেই দৈবক্রমে বেঁচে যাই।"

"এসব কবে ঘটেছিল ? মানে বীণা খুন হবাব কত আগে ?"

"চারদিন আগে। রাত্রে টালা ব্রীজে ওঠার মুখে মোটব চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছিল, তার চারদিন পরই বীণা ছাঁটাই হয়।"

"মনে হচ্ছে, আপনি ওই দুজনের কাউকে খুনী বলে ধরে নিয়েছেন, শোভনেশকে নয়।"

সুভাষ গায়েনের মুখটা মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়েই মোলায়েম হয়ে পড়ল। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে দোকানের ছেলেটাকে বলল, "তিনটে চায়ের দাম কত ? তারপর রোহিণীকে লক্ষ করে, "আপনি ভবানীপুব যাবেন বলছিলেন না ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা পেলাম না।"

"প্রশ্ন আবার কি ? কৌতূহল বলুন। এত বছর পর এসব বাসি জিনিস ঘাঁটলে দুর্গন্ধ বেরোবে। যেখানে যাচ্ছিলেন, যান।"

রোহিণীকে ফেলে রেখে সে হনহন করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীও বেরিয়ে এল। লম্বা পায়ে, সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে মোড়া শীর্ণ দেহ নিয়ে সুভাষ গায়েন বকের মতই হেঁটে চলে যাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে আবার একটা ধোঁয়াটে যুক্তি ও অযুক্তির মধ্যে পড়ে গেল।

সুভাষ গায়েনকে খুন করার চেষ্টা কে করবে, কেন করবে ? মিনিবাসে ভবানীপুর যাবার পথে রোহিণী ভেবে দেখার একটা চেষ্টা করল। যদি ধরা যায় মীনাই, তাহলে কারণটা এইভাবে হতে পারে—শোভনেশকে সে ভালবাসে সুতরাং মীনা তার মঙ্গলই চায়।

বীণাকে ইতিমধ্যে শোভনেশের নেশায় পেয়ে বসেছে, অতএব মীনা তার দিদিকে সূক্ষ্মভাবে ঈর্ষা করতে পারে, মনে মনে রাইভালও ভাবতে পারে। যদিও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়িনীর জন্য কোন ট্রফি নেই, আছে অহঙ্কার রক্ষার জন্য এক ধরনের তৃপ্তি। অতএব মীনা চাইবে না দিদি সিটিং দিতে যাক। অবশ্য বীণাও নাকি আর চাইছিল না শুধু এই উদ্দেশ্যেই শোভনেশের কাছে যেতে। কিন্তু সুভাষ গায়েন অর্থাৎ স্বামী তাকে বাধ্য করত যাবার জন্য। কিন্তু যাকে ভালবেসেছে, তার সান্নিধ্য তো সবাই কামনা করে। বীণার তো তা হলে শোভনেশের কাছে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই থাকার কথা। অথচ বীণাকে নাকি সুভাষ গায়েন জোরজার করে পাঠাত। তাই কখনও হয়! রোহিণীর বিশ্বাস হচ্ছে না এই মারধোর করে পাঠাবার গল্পটা। বীণার গায়ে সুভাষ গায়েন হাত তুলত, কিন্তু সেটা বোধহয় অন্য কোন কারণে।

যাই হোক, রোহিণী ভেবে চলল, সম্ভবত মীনার এই বিশ্বাসটাই হয়ে যায় যে, শোভনেশ তার প্রতিভাকে নষ্ট করছে এই সব ছবি এঁকে, আর তাকে নষ্ট করাচ্ছে সুভাষ গায়েন তার বৌকে পাঠিয়ে। সুতরাং প্রচণ্ড ঘৃণায় ক্ষেপে উঠে মীনা চাইতেই পারে এই বদমাস লোকটা ধরাধাম থেকেই বিদায় হোক। কিন্তু চাওয়া আর সেটাকে কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তব করে তোলা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আরশোলা দেখলে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলে এমন মেয়েও খুনের ব্যাপারে অসম্ভব সাহস দেখাতে পারে। মীনা শক্ত ধরনের মেয়ে, আরশোলা বা চামচিকে দেখলে চিৎকার না করে প্রথমেই সে ঝাঁটা খুঁজবে। অবশ্যই গলায় ফাঁস দিয়ে বা বিষ খাইয়ে রক্তপাতহীন খুন করবার যোগ্যতা মীনা রাখে। কিন্তু খুনটুন করা মানেই ঝুঁকি নেওয়া আর এই ঝুঁকি সে নেবে কেন?"

রোহিণীর কাছে সুভাষ গায়েনের এই খুনের অভিযোগটা মোটেই গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। বরং সে যদি বলত, মীনা তার দিদিকে বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল তাহলে নয় টেনেটুনে একটা মোটিভ খাড়া করা যেতে পারে। কিন্তু ওই লোকটাকে? ···রোহিণী মাথা নেড়েই দেখল ভবানীপুর থানা এসে গেছে। নামার জন্য সে উঠে দাঁড়াল।

দশ মিনিট পর সে মুখোমুখি হল যে লোকটির, তার উচ্চতা ফুট পাঁচেক হলেও ব্যক্তিত্বের দৈর্ঘ্য অন্তত পাঁচ মিটার। তবে রামছাগলে দাড়িটা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখনো বিয়ে হয়নি, কেননা বৌ থাকলে কিছুতেই সে এমন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চোখা এবং সবল মুখটাকে দাড়ি রেখে ভোঁতা হতে দিত না। রোহিণী এজন্য অতি মৃদু ধরনের আঘাত পেল বটে, কিন্তু ওর কৌতূহল ভরা ঝকঝকে চোখ এবং হাসিটা তাকে আঘাত কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করল।

"আমি সিদ্ধার্থ সিংহ, আপনি?···দাঁড়ান দাঁড়ান, যদি না আমার স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে আপনি রোহিণী, ঠিক?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে···"

"কি করে চিনলাম? বলছি। তার আগে বলুন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, আমার এ হেন সৌভাগ্যের কারণটা কি?"

"আপনার একটা লেখা পড়ে কয়েকটা কথা জানতে···।" রোহিণী তার ঝোলা থেকে ম্যাগাজিনটা বার করল।

সিদ্ধার্থ এক নজর দেখেই বলল, "আমার আজ আর ক্লাস নেই। মিনিট দু-তিন দেরি করে এলে আপনার সঙ্গে দেখা হত না। বাড়ি চলে যেতাম।"

"তাহলে চলুন, বাইরে গিয়েই বলব।"

কলেজের ফটক থেকে বেরিয়েই রোহিণী কৌতূহলটা আর চেপে রাখতে পারল না। ব্যগ্র হয়েই বলল, "আমাকে আপনি চিনলেন কি করে ?"

"ওই লেখাটা তৈরি করার জন্য তিন-চারটে খবরের কাগজের পুরনো ফাইল ওলটাতে হয়েছিল। দুটো কাগজে আপনার ছবি দেখেছিলাম, শুধুই মুখটুকু। বাকি অংশটুকু আর দেখা হয়ে ওঠেনি।"

ফিচেল। বিচ্ছু। দাড়িটা ধরে একটা টান মারলে কেমন হয়। রাজেনেরই বয়সী। ওরা একই সময়ে যাদবপুরের ছাত্র ছিল। বয়সে তার থেকে ছোটই হবে। এটা ভেবেই রোহিণীর মেজাজ লঘু হয়ে এল। সিংহ মশাই আসলে কতটা কেশর ফোলাতে পারে দেখার জন্য সে বলল, "বাকি অংশটুকু দেখে কি ধারণা হল ?"

"শোভনেশ সেনগুপ্ত ভাল আর্টিস্ট ঠিকই, কিন্তু ভাল বুদ্ধির লোক ছিলেন না। চোদ্দ বছর নির্বাসনে যান যে লোক এই রকম 'বাকি অংশটুকু' ফেলে রেখে, তাঁকে আমি···আপনিই বলুন বোকা নন্ কি ?" সিদ্ধার্থ নকল গাম্ভীর্য ভরা মুখটা ফিবিয়ে তাকাল পাশে হেঁটে চলা রোহিণীর দিকে। রোহিণীর ভ্রূ দুটি কৌতুকে একবার ওঠানামা করল।

"শোভনেশ সেনগুপ্ত কতটা লম্বা ছিল নিশ্চয় তা জানেন ? ওর বুদ্ধিটাও ছিল ওর হাইটের সঙ্গে মানানসই। কিন্তু কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে বুদ্ধিটা নেমে এসে, মানে আমার হাইটের থেকেও নেমে এসে বোকামি করত। জানেন, একবার তো দাড়িও রেখেছিল।"

রোহিণী ভেবেছিল, সিদ্ধার্থ এবার রেগে উঠবে। তার বদলে হাসতে শুরু করল। হাসিটা ওর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে গিয়ে দমকা বাতাসে নুয়ে পড়া গাছের ডালের মত ওর শরীরটাকে বাঁকিয়ে দিল অ র "উ হু হু হু" ধরনের একটা শব্দ মুখ থেকে বেরোতে লাগল। রাস্তার কিছু লোক ওর দিকে না তাকিয়ে থাকতে পাবল না।

"বলেছেন ভাল। সত্যিই আমি খুব শর্ট হাইটেড, এ জন্যই আর ছাদনাতলায় দাঁড়ানোর সুযোগ হল না। উ হু হু হু··· দাড়টা··· উ হু হু হু··· এটা বোধহয়।"

"হ্যাঁ, ওটা কালই নির্মূল করুন। দেখবেন, ছাদনাতলাব রাস্তাও পবিষ্কার হয়ে যাবে। সবাইকে কি সব জিনিস মানায় ?"

"আমার বৌদিও ঠিক এই কথাই বলেছে, আর আপনার সঙ্গেই বৌদি লেডি ব্রেবোর্নে পড়েছে। আপনার বাকি অংশের খবর তার কাছ থেকে আগেই পেয়েছি।"

"বৌদি আমার সঙ্গে পড়তো ? কি নাম ?"

"শেফালি কর এখন সিংহ। আপাতত লস অ্যাঞ্জেলিসের ইউ সি এল এ-তে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো স্বামীর রান্নাঘর সামলাচ্ছেন।"

"ওম্মা ! শেফালি আপনার বৌদি ? সেই কবে কত বছর আগে—।" রোহিণী আর কথা বলতে পারলো না।

"চলুন মেট্রোয় উঠি। আপনি এখন কোনদিকে যাবেন ?"

"আমি কাজ করি মহারানী পত্রিকায়, থাকি সল্ট লেকে। দুটোই এখান থেকে উত্তরে। আপনি তো—।" রোহিণী থেমে গেল। রাজেন বলেছিল, অরবিন্দ সরণিতে নাকি সিদ্ধার্থর বাড়ি। কিন্তু এখন রাজেনকে টেনে এনে সিদ্ধার্থর সামনে দাঁড় করানোর দরকার নেই।

"আমিও উত্তরে। চলুন পাতালে প্রবেশ করা যাক্।"

সিদ্ধার্থ টিকিট কাটল। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় সে বলল, "বলুন, কি

জানতে চান। তবে তার আগে বলে রাখি, এই লেখাটা তৈরি করার জন্য আমি অনেকের কাছে গেছি। প্রশ্ন করেছি। আপনাকে খুঁজতে মহারানী অফিসেও গেছিলাম। কিন্তু আমাকে ওখানে বলা হয়, আপনি দু'মাসের ছুটি নিয়ে বোম্বাইয়ে দিদির বাড়ি গেছেন।"

"সে কি ! কে বলল এ কথা ? আমি তো আজ পর্যন্ত দু'সপ্তাহও ছুটি নিইনি। কবে বলেছেন ?"

"বলেছেন গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি, তা প্রায় সাত-আট মাস আগে। আমি তাঁকেও কিছু প্রশ্ন করেছিলাম শোভনেশ সেনগুপ্ত সম্পর্কে।"

"কিন্তু গঙ্গাদা এমন মিথ্যা কথাটা বললেন কেন !" রোহিণী বিস্ময়টা মুখ থেকে বার করে ফেলেই মনে মনে নিজেকে ধমকাল। আবার নিজেকে প্রকাশ করছ ? বেশি কথা না বলে নিজেকে আড়ালে রেখে শুধু অন্যদের খবরই নেবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তার কি হল ?

"সেটা আমি কয়েকদিন পর বুঝতে পাবি। তবে গঙ্গাপ্রসাদবাবু কিছু উল্টোপাল্টা কথা আমায় বলেছিলেন, যা আমি লেখায় ব্যবহার করিনি। আমি অনুমান করছি, আপনি বোধহয় জানতে চান, সেনগুপ্তদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আমি জানলাম কি ভাবে, ঠিক ?"

"ঠিকই।"

"ট্রেন আসছে। আগে উঠি, তারপর বলছি।"

এসপ্ল্যানেডগামী ট্রেনে এই সময় ভিড় থাকে না। ওরা বসার জায়গা পেল। "দরজা বন্ধ হচ্ছে" কথাটা তিনটি ভাষায় ঘোষিত হবার পর দরজা বন্ধ হয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলে সিদ্ধার্থ বলল, "আমার ঠাকুর্দার মেজভাই সেনগুপ্তদেব এস্টেটেব ম্যানেজাব ছিলেন। তাঁর একটু লেখালেখির বাতিক ছিল। ডায়েবিও রাখতেন। সেটা আমি পেয়ে যাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি ধনী ব্যবসায়ীদের, জমিদাবদের উত্থান আব পতন নিয়ে এখন অনেকেই গবেষণা করছেন। মেজ ঠাকুর্দারও ইচ্ছে ছিল তেমন কিছু একটা করার, অবশ্য সমাজবিজ্ঞান বা অর্থনীতির কিছুই তিনি জানতেন না। না জানলেও, একটা ফ্যামিলিকে ধরে তাদের কয়েক পুরুষের ওঠা আর পড়ার ঘটনাগুলো সাজিয়ে তিনি বাংলার, ওঁর মতে বাঙালি ধনীদের পিছু হটার কারণ দেখতে চেয়ে ডায়েরিতে কিছু কিছু কথা লিখে রাখেন, পরে কাজে লাগাবেন বলে। তাতে বেশির ভাগ তথ্য ছিল সেনগুপ্তদের সম্পর্কেই।"

"উনি কি বেঁচে আছেন ?"

"আমি যখন স্কুলে পড়ি তখনই মেজ ঠাকুর্দা মারা যান, বছব পনেরো তো হলই।"

"আপনি বৌবাজারের বাড়িতে গিয়ে কখনো কি খোঁজ নিয়েছিলেন, ওদের এই জেনারেশনের কেউ পাগল হয়েছে কি না ?"

"না খোঁজ করিনি। আপনিও কি করেছেন ?"

"না। আমি তো আপনার লেখাটা পড়ার আগে পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।"

"তবে আমি গঙ্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি প্রথমে তো সন্দেহেব চক্ষে আমাকে দেখলেন। নানান প্রশ্ন করলেন লেখাটার উদ্দেশ্য নিয়ে। বললেন, পাগলামির লক্ষণ মাঝে মাঝে শোভনেশের মধ্যে দেখা দিত। তবে দ্বিতীয় বিয়ের পর স্পষ্ট হয়েই দেখা দেয়। ওঁর মতে এজন্য দায়ী শোভনেশের নতুন বৌ রোহিণী।"

"আমি ! কিভাবে ?" রোহিণী তার আসনে টলে পড়ছিল। অবশ্য এসপ্ল্যানেড

স্টেশনে ট্রেন ব্রেক কষে থামার জন্যই কি না, তা বলা শক্ত।

"চলুন, কার্জন পার্কে বসে সেটা বলছি।"

মেট্রো রেল স্টেশন থেকে বেরিয়েই ওরা একটা মিছিল দেখতে পেল। দক্ষিণ দিক থেকে এসে ধর্মতলার মোড় ঘুরে বাঁ দিকে সিধু-কানু ডহরে বেঁকছে। পুব দিক থেকেও লেনিন সরণি ধরে আর একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। ফলে ট্রাম বাস মোটর দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক বন্ধ।

"মিছিল আর ট্র্যাফিক জ্যাম দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, আপনার?" সিদ্ধার্থ এগিয়ে যেতে যেতে বলল।

"এটা কি একটা ভাল লাগার জিনিস?" রোহিণী একটু অবাক একটু বিভ্রান্ত হয়ে তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। "কত লোকের কত অসুবিধে হয়, বলুন তো?"

"নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে, ছন্দও আছে। আপনাকে সেটা খুঁজে বার করে নিতে হবে। একটা উচ্চাঙ্গের মার্ডারের মধ্যেও কত যত্ন, কত মাথা খাটানো সূক্ষ্মতা থাকে···ভাল পেইন্টিং কি স্কালপচারেও আপনি সেটা পাবেন, ভাল খেয়াল বা ঠুংরিতেও পাবেন। এত লোকের অসুবিধে ঘটানো—এটা কি সহজ কাজ?"

এই সময় ধুতি পাঞ্জবি পরা মাঝবয়সী একটি লোক মিছিল থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে ফুটপাতে উঠে মাটির জমিটুকু পার হয়ে লেনিনের মূর্তির প্রায় আট-দশ ফুট কাছে গিয়ে দু'পা ফাঁক করে ধুতির কোঁচা টেনে সরালো। সিদ্ধার্থ মুখ ফিরিয়ে খুব মন দিয়ে লোকটির কাজ দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে বোধহয় এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে, ব্রিফকেস হাতে প্যাণ্ট পরা এক যুবক মিছিলের সারি থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে মন্থর গতিতে এগোল মূর্তির দিকে, তারপর লেনিনের মূর্তির কাছাকাছি হয়ে চলনের গাম্ভীর্য খসিয়ে প্রায় ছুটেই ধুতি পরার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"বেচারা! কতক্ষণ আর প্রকৃতির ডাক প্রত্যাখ্যান করা যায়! নিশ্চয় বহুক্ষণ সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল", সিদ্ধার্থ সখেদে মাথা নাড়ল।

"কি ভাবছে বলুন তো?"

"কে, লেনিন? না, না, উনি মোটেই কিছু ভাবছেন না···বুদ্ধিমান লোক, এই ক'বছরে কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতাকে চিনে ফেলেছেন ঠিকই।"

"আমি বলছিলাম, চারপাশের হাজার হাজার মানুষ, তারা দেখে কি ভাবছে?"

"মানুষ!" সিদ্ধার্থ অবাক চোখে এধার-ওধার তাকাল, "মানুষ কোথায়? হাজার হাজার ধ্যানমগ্ন নির্বিকার ঋষি বলুন। চলুন, এই তপোবন থেকে অচিরে এবার বিদায় নেওয়া যাক।"

"জায়গাটা ঘিরে দেওয়া উচিত।"

"একটা কোন উপলক্ষ আসুক, দেখবেন তখন ঢাকঢোল পিটিয়ে, মঞ্চ বেঁধে বক্তৃতা করে লেনিনের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা হবে।"

কার্জন পার্কের দিকে যেতে যেতে সিদ্ধার্থ আবার তিক্তস্বরে বলল, "ড্রাগের নেশায় নাকি আমাদের তরুণসমাজ ধ্বংসের পথে···কিন্তু মনে হয় না কি গোটা কলকাতাটাই হেরোইন খেয়ে ঝিমোচ্ছে? সেলফ ডিগনিটি বোধটাও আর অবশিষ্ট নেই।"

দুজনে পার্কের দক্ষিণ দিকে রানী রাসমণির মূর্তির কাছাকাছি বসল।

"একজনের আসার কথা, এইখানেই। তবে মনে হচ্ছে, জ্যামের জন্য দেরি হবে।···

হ্যাঁ এইবার কাজের কথায় আসি।" সিদ্ধার্থ বাবু হয়ে মুখোমুখি। চোখ বুজে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিল। "শোভনেশ সেনগুপ্তর মধ্যে পাগলামি দ্বিতীয় বিয়ের পর স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্তত গঙ্গাপ্রসাদের মতে, আর সেজন্য দায়ী আপনি।"

সিদ্ধার্থর কথার মধ্যে বিঘ্ন না ঘটাবার জন্য রোহিণী চুপ করে শুধু তাকিয়ে রইল।

"আমি তখন কারণ জানতে চাইলাম। উনি বললেন, শোভনেশ তিন-চারবার তার কাছে অভিযোগ করে, বীণা চ্যাটার্জির স্বামী তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। বীণার যে স্বামী আছে, এটা সে আগে জানত না। এই স্বামীটি তাকে প্রায় বাধ্যই করছে আজেবাজে ছবি আঁকতে। যদি না আঁকে, তাহলে পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারের মামলা করবে বলে শাসানিও দেয়। এতে শোভনেশ ভয় পেয়ে যায়। এতই সে মামলাকে ভয় করতে যে, বীণার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। বাড়িতে দরজা বন্ধ ঘরে বেশির ভাগ দিনই কাটাচ্ছিল। বীণা কয়েকবার দেখা করতে এসে সদর থেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই সময় শোভনেশের নানা রকম মানসিক বিকার দেখা দিতে শুরু করে। গঙ্গাপ্রসাদ এর পর শোভনেশকে সরিয়ে বাসুদেবপুরে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লুকিয়েই রাখে। প্রায় পাঁচ মাস ছিল নির্বাসিতের মত। সেখানে শোভনেশ অনবদ্য কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ, গ্রামজীবনের কিছু ছবি আঁকে আর স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকে। তারপর ছবির প্রদর্শনী, সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা, আর সেই দেখাতেই ওর মধ্যে আবার অস্থিরতা জেগে ওঠে। গঙ্গাপ্রসাদের ধারণা বিশেষ একটা ধাঁচের মেয়েদের শরীর ওকে উত্তেজিত করে। বীণার সেই ধাঁচের শরীর ছিল, আর আপনার রয়েছে। আবার ন্যুড আঁকার জন্য অশান্ত হয়ে ওঠার পরিণতিতেই এই বিয়ে। কিন্তু আপনি সিটিং দিতে রাজি না হওয়াতে উনি ক্ষেপে ওঠেন আর আবার বীণার কাছে ছুটে যান। কিন্তু বীণা এবার ওকে প্রত্যাখ্যান করে, ওর স্বামীও শোভনেশকে তাড়িয়ে দেয়। এর কারণটা কি জানেন ?"

"না।"

সিদ্ধার্থ মুখ ঘুরিয়ে এধার ওধার তাকিয়ে কাউকে খোঁজার চেষ্টা করল, নিজের মনেই বলল :

"নাহ্ জ্যামেই আটকা পড়েছে।"

"ঝালমুড়ি খাবেন ?"

রোহিণীর এখন ইচ্ছে করছে মুখরোচক কিছু চিবোতে চিবোতে শোভনেশের কাহিনী শোনার। অনেকগুলো প্রশ্ন তার করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে রাখার সিদ্ধান্তটাই বাদ সাধল। গঙ্গাদার চরিত্রটাও রীতিমত ইন্টারেস্টিং, ক্রমশই কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে। শোভনেশ পাগল হয়ে উঠছিল আর সেজন্য দায়ী কিনা আমি! অথচ এই সেদিন বললেন, ওদের বংশে পাগল হওয়াটা তার কাছে নাকি নতুন কথা! এই রকম উল্টোপাল্টা কথা বলার উদ্দেশ্যটা কি ? কিছুর থেকে যেন নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন।

"খাব। অনেকদিন খাইনি আর এভাবে অনেকদিন ঘাসের উপর বসিওনি। আপনি ?"

রোহিণী বলতে যাচ্ছিল, এই তো সেদিন ইডেনে···কিন্তু রাজেন আবার এসে পড়বে কথার মধ্যে, এই ভেবে বলল, "আমিও অনেকদিন ঘাসে বসিনি।"

ঝালমুড়ি কিনে ঠোঙা থেকে মুখে কিছুটা ঢেলে সিদ্ধার্থ বলল, "বীণাদের গোয়াবাগানের বাড়িতে শোভনেশ সেনগুপ্ত গেছিল, এই পর্যন্ত বলে গঙ্গাপ্রসাদ বাঁড়ুজ্যে

আর কিছু আমাকে জানাতে পারেননি বা জানাতে চাইলেন না। কেন জানি আমার মনে হল, এইখানে একটা ভাইটাল লিঙ্ক রয়েছে এই ঘটনা পরম্পরার। কিন্তু বাড়িটা যে ঠিক কোথায়, ঠিকানাই বা কি, তা আমি জানি না। বীণার স্বামীই বা এখন কোথায়, তাও জানি না।"

সিদ্ধার্থ ঠোঙা তুলল মুখে মুড়ি ঢালার জন্য। রোহিণী ভাবল, সুভাষ গায়েনের হদিশ যে আমি জানি, সেটা কি ওকে বলা উচিত হবে ? বরং আরও কি বলে শোনা যাক। নিজেকে জাহির করার সময় এটা নয়।

"আমার এক আত্মীয় থাকে গোয়াবাগানে। গেলাম তার কাছে। কত বছর আগে খুনটা হয়েছে, তখন ওখানে একটু চাঞ্চল্যও পড়েছিল, যদিও খুনটা হয় বৌবাজারে। তাহলেও বীণার বাড়ি কিছুটা তো তখন বিখ্যাত হয়ে গেছিলই। আত্মীয়কে বলতেই সে বলল, এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি বাড়িটা, গোবরবাবুর আখড়ার খুব কাছেই। গিয়ে দেখলাম বাড়িটা। ওরা মাস কয়েক মাত্র ছিল। কারুর সঙ্গে মিশত না। একতলায় থাকত, দুটো বড় ঘর আর লম্বা দালান নিয়ে। এখন অবশ্য অন্য লোক থাকে। শুনলাম, বীণার স্বামীর নাম সুভাষ গায়েন। ছবির ব্যবসা করত। আরও শুনলাম, লোকটার ঘরে আর দালানেই ছবি আঁকা হত। পাঁচ ছ'জন লোক বসে ছোট-বড় নানান আকারের ছবি আঁকত। বাইরের কাউকে আঁকা দেখতে দেওয়া হত না। ওখানেই ছবির ফ্রেম তৈরি হত। বাঁধানো হত। মাঝে মাঝে লোকজন আসত, ছবি নিয়ে চলে যেত। বীণা মারা যাবার পরও তার স্বামী কয়েক মাস ওখানে ছিল। তারপর কোথায় যে চলে গেল, কেউ তা আর বলতে পারল না।'

"ছবির বিষয় সম্পর্কে জানা গেলে হয়তো বলা যেত, আসলে ঠিক কি কারবার বীণার বাড়িতে ঘটছিল।"

"হ্যাঁ। সেটা সুভাষ গায়েন বলতে পারে আর পারে সেই সব আর্টিস্টরা, যারা ওখানে বসে ছবি আঁকত। এই প্রসঙ্গে একটা খবর জানাই, কিছুদিন আগে কাগজে পড়লাম, বোম্বাইয়ে এক বাড়ি তৈরি করার ব্যবসায়ী, ছবি নকল করার এক কোম্পানি খুলেছে। ইওরোপিয়ান পেইন্টিংসের ওল্ড মাস্টার্সদের—দা ভিঞ্চি, দিউরার, কোরেগ্গিও, রেমব্রান্ট, রুবেনস, বোত্তিচেল্লি, টিশিয়ান, গোইয়া, কার নাম করব, সবারই কাজ নকল করার এক কারখানাই খুলে ফেলেছে জনা পঞ্চাশ বেকার ফ্রিলান্স পেইন্টারসকে কাজে লাগিয়ে। সবগুলোই যে অরিজিনাল সাইজের তা নয়, তবে স্কেল অনুসারে আসলের সঙ্গে মেপে ছোট করা হয়। দাম কত জানেন ? পনেরো হাজার থেকে শুরু তারপর কুড়ি, পঁচিশ, তিরিশ !"

"এ সব জিনিস লোকে কেনে !"

"এদেশে দুধের বদলে পিটুলি গোলা খাবার লোকের অভাব আছে নাকি ! লতা মঙ্গেশকর, কি রফি, কি কিশোরকুমারকে যদি পাড়ার ফাংসানে না আনা যায়, তাহলে কুছ পরোয়া নেই। লতাকণ্ঠী, রফিকণ্ঠ দিয়েই রমরম করে ফাংসন হবে। অ্যামপ্লিফায়ারে চিৎকার করে জানিয়ে দেওয়া হয় নকলরা, ভেজালরা গান গাইবে, আপনারা পয়সা খরচ করে তাদের গান শুনতে আসুন। দলে দলে ছেলেবুড়ো সেই গান গিলতে টিকিট কাটে না কি ? যারা কলোনিয়াল স্টাইলে বাস করতে চায়, বাড়ি সাজাতে চায়, তারা যদি রিনেইসান্স পিরিয়াডের নকল ছবি কেনে, তাহলে দোষ দেবেন কেন ? বড়লোক, মধ্যবিত্ত

আর গরিব সবাই তো পিটুলি গোলা পান করার ব্যাপারে একই সারিতে দাঁড়িয়ে।"

রোহিণী এতক্ষণে বুঝে গেছে, প্রসঙ্গান্তরে ছিটকে যাবার একটা প্রচণ্ড প্রবণতা সিদ্ধার্থর মধ্যে রয়েছে। কলেজ মাস্টারদের এই এক ব্যাধি, সামান্য চান্স পেলেই লেকচার দিতে শুরু করে। আর তাতে যদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মওকা থাকে তো কথাই নেই!

"কিন্তু সুভাষ গায়েন কি এই রকম একটা ছবি নকলের ব্যবসা শুরু করেছিল বলে আপনার মনে হয়েছে?"

"ভীষণভাবে মনে হয়েছে। আরো মনে হয়েছে, শোভনেশ সেনগুপ্ত এটা জেনে ফেলেছিল।"

"তাহলে গঙ্গাদাও জেনেছিলেন।"

কথাটা বলেই রোহিণী জিভ কামড়াল। এটা তো সিদ্ধান্ত-বিরোধী কাজ হয়ে গেল। তার চিন্তাটা এভাবে আচমকা মুখ থেকে বেরিয়ে এল কেন? গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে কি তার অবচেতনে বাজে কোন ধারণা তৈরি হয়ে গেছে?

সিদ্ধার্থ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবল। "হতে পারে, হতে পারে। গঙ্গাবাবুকে হয়তো শোভনেশ বলেছিল।"

তারপরই কি সুভাষ গায়েনকে খুন করার চেষ্টা হয়? লোকটা হয়তো মিথ্যে বলেনি। রোহিণী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সন্দেহটা করে ফেলেই বলল, "শোভনেশের ছবি নাকি এখন বাজারে আসছে কোনো এক অজ্ঞাত জায়গা থেকে?"

"তাই নাকি!" সিদ্ধার্থ নড়ে-চড়ে বসল। "আমি অবশ্য ছবির বাজার সম্পর্কে খবর রাখি না।"

"একজনের কাছে শুনলাম, দশ থেকে পনেরো হাজার দাম। তিন বছর আগের দর এটা।"

"তাহলে এখন আরো বেশিই হবে। ফিদা হুসেইনের ছবিই পাঁচ লাখে বিক্রি হয়েছে। তাহলে শোভনেশ সেনগুপ্তর ছবি, যদিও হুসেইনের মত পাবলিসিটি পাননি, হাজার পঞ্চাশ তো পেতে পারেই। কিন্তু ছবিগুলো কোথা থেকে বাজারে আসছে, ফেক না অরিজিনাল?"

"বলতে পারব না, ছবির এসব আমি কিছুই বুঝি না।" বলতে বলতে রোহিণীর চোখ পড়ল ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটি লোকের থমকে পড়ার দিকে। অফিসের উৎপল। অবাক হয়ে সে পার্কের রেলিংয়ের কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি এখানে বসে?"

রোহিণী গলা চড়িয়ে বলল, "এনার সঙ্গে একটু গল্প করছি।"

সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে উৎপল, "অ"। বলে আবার হাঁটিতে শুরু করল।

"ওই লোকটা মহারানীর কাজ করে না? আমি প্রথমে এর কাছেই আপনার খোঁজ করেছিলাম। খুব বিরক্ত হয়ে বলেছিল, এডিটারকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কিছু জানি না। এডিটার প্রশান্তবাবু তখন ছিলেন না।"

শুনে রোহিণী হাসল। বলল, "আপনার লোক এখনো এল না কিন্তু।"

"চলুন ওঠা যাক, বাড়িতে গিয়ে একটা লেখায় বসতে হবে।"

দুজনে উঠে পড়ল। বাস টার্মিনাসের দিকে যেতে যেতে রোহিণী বলল, "সব তো শোনা হল না, বাকি অংশটুকু পরে—"

সিদ্ধার্থ হঠাৎ দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করে বলল, "কার বাকি অংশটুকু?"

রোহিণী পুরুষ হলে অবশ্যই হো হো করে হেসে উঠত। তার বদলে মুখে একরাশ নীরব হাসি ছড়িয়ে বলল, "অবশ্যই শোভনেশের। ওর বাড়ির বিষয়ে আর কী আপনি জানেন সেটা একটু জানতে হবে।"

"আর বিশেষ কিছুই জানাবার মত নেই।... ওহ ভাল কথা, বৌবাজারের বাড়িটার এখন মালিক কে বলুন তো?"

"জানি না, আমি কোন খবর রাখি না ওর বিষয়-সম্পত্তির। যাতে আমার প্রয়োজন নেই, তা নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ কি?"

"এ জিনিসটা যদি সবাই বুঝত, তাহলে পৃথিবী থেকে কত কোটি কোটি টন ব্যথা যে কমে যেত! আপনি কত নম্বরে উঠবেন? আমার বাসস্ট্যান্ড আর একটু ওধারে... বৌদিকে জানাব আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে।"

"জানাবেন। একটা কথা কিন্তু আপনাকে জানাতে ভুলে গেছি, শোভনেশ বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, সেখান থেকে দিন কয়েক আগে পালিয়েছে।"

"বলেন কি! এটা তো দারুণ খবর!"

"নিদারুণ আমার পক্ষে। পুলিশের হাতে যদি ইতিমধ্যে ধরা পড়ে যায় তো ভাল, নইলে কোনভাবে যদি আমার কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে বিপদে পড়ে যাব।"

"আমার মনে হয় না আপনার কাছে যাবে। গঙ্গাপ্রসাদবাবুর কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছিল, আপনার ওপর শোভনেশ খুব চটা। আপনি যাতে বিষয়-সম্পত্তি কিছু না পান, সেজন্যই নাকি বাড়িটা বিক্রি করে দেন যখন মামলা চলছিল।"

"বিক্রির টাকাটা কি হল?"

"মামলার খরচে লেগেছে।"

অথচ গঙ্গাদা বলেছিলেন, বাড়িটা তাদের বিয়ের আগেই মর্টগেজ ছিল একজনের কাছে। ব্যাঙ্কে সতেরো হাজার টাকা ছিল, যা তিনি মামলার জন্য উকিলকে দিয়েছেন। রোহিণী ছোট করে মাথা ঝাড়া দিল। ভিতরে ভনভন করে একটা সন্দেহের পোকা উড়ছে। সেটাকে বার করে দেবার চেষ্টায় সে বলল, "বন্ধুকে বাঁচাতে উনি নিজেও অনেক খরচ করেছেন।"

"হ্যাঁ, তাও বলেছেন।"

রোহিণীর চোখে পড়ল সুজাতা আর হৃদয়রঞ্জন বাসের জন্য দাঁড়ানো যাত্রীদের লাইনের শেষ মাথা খুঁজছে।

"আচ্ছা তাহলে এবার চলি, আমার বাস ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। স্টেট বাস, বুঝতেই পারছেন, এটা মিস করলে পরেরটার দেখা কখন যে পাব!"

"আমার কার্ডটা রাখুন। যদি কখনো আবার দরকার পড়ে!"

সিদ্ধার্থর হাত থেকে কার্ড নিয়ে রোহিণী থলির মধ্যে সেটা রেখে যাত্রী-লাইনের শেষে দাঁড়ানো গুপ্ত দম্পতির দিকে এগিয়ে গেল।

"মাসিমা! কোথায় গেছলেন?" রোহিণী ভীষণভাবে অবাক হয়েই বুঝল অবাক হওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। তাই পরিমাণটা কমিয়ে আবার বলল, "এই একটু আগে আপনার কথা একজনকে বলছিলাম।"

সুজাতা এবং হৃদয়রঞ্জন একই সঙ্গে জিজ্ঞাসু চোখে রোহিণীকে ছেঁকে ধরলেন।

রোহিণী ঠোঁট দুটো ইলাস্টিকের মত টেনে হৃদয়রঞ্জনের দিকে আলাদাভাবে তাকিয়ে মাথাটা হেলাল।

"আমার কথা! কেন, কাকে বলছিলে? আমি আবার কি অপরাধ করলাম?" সুজাতাও তাঁর অবাক হবার ক্ষমতা দেখালেন, তবে তাঁর বিস্ময়টা যে কৃত্রিম সেটা বোঝাবার জন্য জুড়ে দিলেন, "বাব্বাঃ, আজ দেখছি সারপ্রাইজের মিছিলের মধ্যে পড়ে গেছি।"

"আপনাকে তা হলে আরো সারপ্রাইজ দেব। আমার এক বন্ধুর দেওর, নাম সিদ্ধার্থ সিংহ, অ্যাবনরম্যাল সায়কোলজি নিয়ে রিসার্চ করছে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে শোভনেশ সেনগুপ্তর কথাটা বললাম। আপনার কাছে যা যা শুনেছি ঠিক সেই সেই কথাগুলোই বললাম। পাগল হবার ভয়ে একটা লোক কিরকম উদ্ভট আচরণ করছে। তাই আমি ভাবলাম, এই ব্যাপারটা জানলে হয়তো ওর রিসার্চের কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সব শুনে-টুনে সিদ্ধার্থ কী বলল জানেন? বলল, শোভনেশ সেনগুপ্তদের বংশে কেউ কখনো পাগল হয়নি, তবে ছিটগ্রস্ত ছিল কেউ কেউ। আমি বললাম, তুমি জানলে কি করে? তুমি কি লোকটাকে চেন? বলল, শুধু চিনিই নয়, ওর নাড়িনক্ষত্রেরও খবর জানি। একটু পারভার্ট ধরনের ছিল, মেয়েদের খারাপ খারাপ ছবি আঁকত।"

রোহিণী লক্ষ করল, হৃদয়রঞ্জন আড়চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়েই বৌয়ের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু সুজাতার মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না। রোহিণী মনে মনে বলল, আজ আমি সারপ্রাইজের মিছিল দিয়ে ধুন্দুমার করে দেব। জ্যাম করব, কনফিউজড করব, টিয়ারগ্যাস, গুলি, অ্যারেস্ট, বোমা-পটকা, স্লোগান দিয়ে একটা বিপ্লব বাধিয়ে দেব। দেখি, কে আমায় আটকায়!

একটা বাস আসছে। ঢিলেঢালা সারি নড়াচড়া করে আঁট হয়ে উঠল। যাত্রীরা নেমে যেতেই কন্ডাক্টর বাসের পিছনের দরজার সামনে দাঁড়াল নতুন যাত্রীদের টিকিট কাটার জন্য। সারিটা এগোচ্ছে। রোহিণী থলি থেকে টাকার ব্যাগ বার করল। বসার জায়গা পাবে কিনা আঁচ করার জন্য দেখে নিল, সারিতে মেয়ে ক'জন রয়েছে। গোটা পনেরো সিট থাকে মেয়েদের জন্য। তার মনে হল, বসার জায়গা হয়তো পাওয়া যাবে, তবে বাসের সামনের দিকে মুখ করে বসার সিট হয়তো পাবে না।

"টিকিট আমি কেটে নিয়েছি।" হৃদয়রঞ্জন হাত তুলে রোহিণীকে দেখালেন।

বাসের মধ্যে পা দিয়েই "মেসোমশাই বসে পড়ুন, বসে পড়ুন।" বলতে বলতে রোহিণী সামনের লেডিজ সিটের দিকে ছুটে গেল অনেকটা অপোনেন্ট ডিফেন্সের মধ্য দিয়ে চিমা ওকোরির মত। পা মাড়িয়ে, পায়ের গোছে লাথি মেরে এবং কাঁধের ধাক্কায় একজনকে হুমড়ি খাইয়ে রোহিণী তার গোল পেয়ে গেল। তবে চিমার থেকে তার কৃতিত্বটা একটু বেশি। শুধু এই কারণেই, বাসের পিছন থেকে সামনে এক হাতে সুজাতাকে ধরে টানতে টানতে ডিফেন্স ভেঙে সে এগিয়েছে! সুজাতাকে ঠেলে সিটে বসিয়ে দিয়েই সে ঝপ করে পাশে বসে পড়ল, সেকেন্ডের ভগ্নাংশে তার আধা বয়সী এক সালোয়ার-কামিজকে ডজ করে। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে এক প্লেট সন্দেশের মত এগিয়ে দিল মিষ্টি হাসি।

"কম করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো থাকতে হবে।" রোহিণী ফিসফিসিয়ে সুজাতার কানে বলল। তিনি মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন।

"তা হলে আপনি আমার প্যাকেটটা ধরুন।" মেয়েটি ফিতে বাঁধা রঙিন কাগজের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরতেই রোহিণী সেটা হাতে নিল।

"কতদূর যাবে ?"

"বাগমারি।"

"অনেকটা, প্রায় আধ ঘণ্টা।"

রোহিণী খুঁজল হৃদয়রঞ্জনকে। যা আশঙ্কা করেছিল, তাই হয়েছে। রড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, বসার জায়গা পাননি।

"মেসোমশাই বসতে পারেননি।"

"উনি বাসটাসের ভিড়ে অনভ্যস্ত। চটপটেও নন।"

"বরাবরই কি ?"

"বরাবরই। আমার বিয়ে হওয়া থেকেই দেখছি। ভীতু ধরনের। ঝগড়াঝাটি হবার সম্ভাবনা আছে দেখলে সে দিকে আর মাড়াবেন না।"

অথচ গঙ্গাদা বলেছিলেন, বেধড়ক এমন পিটিয়েছিলেন যে, সুজাতার নড়ে বসারও জোর শরীরে ছিল না। শোভনেশের সম্পর্কে জেলাসি থেকেই নাকি এই হিংস্রতা! তারপর শোভনেশের স্টুডিয়োতে গিয়ে ছবির ফ্রেম ভেঙেছেন, দু পায়ে ছবি মাড়িয়েছেন, পেপারওয়েট দিয়ে শোভনেশকে মারতেও গেছিলেন। অথচ ইনি বলছেন, ওঁর স্বামী নাকি ভীতু, ঝগড়া-টগড়ার ধার দিয়েও হাঁটেন না।

তা হলে সত্যি কথাটা কে বলছে ? কনফিউজড করবে ঠিক করে শেষে কি না নিজেই সে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে!

যাত্রা শুরু করল বাস। অসম্ভব ভিড় আজ। রোহিণীর মনে হল ভিড়ের কারণটা বোধ হয়, হাজিরা দিয়েই মিটিং থেকে অনেকে সটকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কিংবা আজ টিভি সিরিয়াল বুনিয়াদের তারিখ হয়তো। এটা তো মাঘ মাস, আজ বিয়েরও দিন থাকতে পারে। হাতের প্যাকেটটা দেখে মনে হচ্ছে, উপহারের কিছু এর মধ্যে আছে।

"মাসিমা এখন কোথা থেকে ফিরছেন ?"

"গেছলাম পূর্ব পুটিয়ারিতে ছোট ননদের বাড়িতে। ওর সেজ ছেলের বিয়ে সামনের বুধবার। ছেলে একটা স্কুলে পড়ায় আর ছবি আঁকে। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পাস করা। মেয়েটিও পাস করা আর্টিস্ট। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। একই সঙ্গে ওরা পাস করেছে।" সুজাতা হাসলেন, যার অর্থ হল বিয়েটায় অভিভাবকদের হাত নেই।

"আর্টিস্টরা দেখছি আপনাকে কোন না কোন ভাবে ছুঁয়ে আছেই।"

"হ্যাঁ। ওরা বোধ হয় ছুঁয়ে থাকতে চায়, ভালবাসতেও।"

ভালবাসে বললেন কেন ? রোহিণী সন্দিগ্ধ হল। তা হলে কি শোভনেশকে ভালবেসেছিলেন ? এখনো ভালবাসেন ? গঙ্গাদার থিওরি মানলে, স্বামীর ওপর ঘৃণা থেকে রিবাউন্ড করে শোভনেশের কাছে ন্যুড সিটিং দিয়েছেন। এটাকে ভালবাসা বলা যায় না। এখন তো কেমন দিব্যিই স্বামী স্ত্রী সুখেই রয়েছেন!

"তোমার বন্ধুর দেওর বললেন, খারাপ খারাপ ছবি আঁকত ? কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে তো ওকে কখনো খারাপভাবে মেয়েদের দেহকে অপমান করে কিছু আঁকতে দেখিনি!"

"সিদ্ধার্থ বলল, প্রচুর ভালগার ছবি এঁকেছেন।"

"পরে এঁকেছে, পরে। আমি ওখানে থাকার সময় নয়। আজ আমিও শুনলাম অনুতোষের কাছে, আমার ননদের ছেলে, যার বিয়ে। ওরা তো সব খবরই রাখে বড় বড়

আর্টিস্ট সম্পর্কে। ও-ই বলল, শোভনেশ খুন করে জেল খাটছে এখন।"

"ওমা, তাই নাকি!"

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে রোহিণীর মুখটা যেন মাইক্রোস্কোপে দেখলেন। তাইতে রোহিণী একটু ঘাবড়ে গেল। হাসি চেপে সুজাতা বললেন, "শোভনেশ আবার বিয়ে করেছিল।"

রোহিণীর বুকের মধ্যে নিশ্বাস জমে দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। জ্যাম হওয়া বোধ হয় একেই বলে। সে ক্ষণেকের জন্য ভুলে গেল, ভগবান নেই তার এই বিশ্বাসটাকে। মনে মনে কাতরে উঠে বলল, ভগবান আর আমি কখনো ইয়ার্কি করেও মিথ্যে কথা বলব না। এই বুড়ি কতদূর জেনেছে বুঝতে পারছি না, বুঝে কাজও নেই। তবে এখুনি যেন না বলে ফেলে, তুমিই তো সেই বৌ, যে পরিচয় লুকিয়ে আমার পেট থেকে কথা বার করেছ! দোহাই ভগবান -এই ভিড় বাসের মধ্যে নয়।

"তাই নাকি?" রোহিণী ফ্যাকাসে মুখে বলল।

"অনুতোষ বলল, এই দ্বিতীয় বৌটা নাকি খুব মানসিক টর্চার করত। ওর ছবিটবি নিয়ে খোঁটা দিত, কখনোই ভাল বলত না। উৎসাহ দেওয়া, প্রেরণা দেওয়া এ সবের ধারেকাছেও ছিল না। নিজেকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকত। খুব খরচেও ছিল। খালি টাকা চাইত। আর সেই টাকা জোগাতে গিয়েই শোভনেশ অশ্লীল ছবি আঁকার কারবার শুরু করে।"

এবার রোহিণী টেলিস্কোপ দিয়ে সুজাতার মুখভাব লক্ষ করে যাচ্ছে। টিয়ার গ্যাস, বোমা পটকা তো তুচ্ছ জিনিস, উনি তো পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুলি চালিয়েছেন। ছুটে পালাতেও দিচ্ছে না। হাত তোলারও উপায় নেই। কি সব কথা বলছেন! প্রত্যেকটাই ডাহা মিথ্যে, এত মিথ্যে যে, কলকাতার টেলিফোনের থেকেও কম বিশ্বাসযোগ্য এমনকি লোকাল ট্রেনের টাইমটেবলের থেকেও!

"শোভনেশের যে শেষে এই পরিণতি হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। শুনে মনটা যে কী খারাপ হয়ে গেল।"

সুজাতা বেদনায় অতঃপর স্তব্ধ হবার জন্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। রোহিণীও তাকালো। বৌবাজারের মোড় ছাড়িয়ে বাস কলেজ স্ট্রিটে চাকা রাখছে।

"আপনার ওই অনুতোষ এত সব ব্যক্তিগত খবর পেল কি করে? বৌ খোঁটা দিত, টাকা চাইত, খরচে ছিল এ সব তো বাইরের লোকের জানার কথা নয়?"

"শুনেছে কোথাও থেকে।"

সুজাতা অতি নিরীহ স্বরে ফিসফিস করে তারপর যোগ করলেন, "আমার নামেও তো এক সময় কত কথা লোকে বলত শোভনেশকে জড়িয়ে। উনি বলতেন, কান দিও না। স্বার্থান্বেষীরা এইভাবে রটায়, চরিত্র হনন করে।"

"ঠিক বলেছেন মাসিমা, আমাদের কাগজের মালিক, এক সময় শোভনেশ সেনগুপ্তর বন্ধু ছিলেন, ওদের বাড়িতে অল্পবয়স থেকেই যাতায়াত ছিল। তা তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, ওর একটা ছবির মডেলকে তার স্বামী এমন বেধড়ক পিটিয়েছিলেন যে, মডেল বেচারা বিছানা থেকে সাতদিন উঠতে পারেনি। তাই নয়, সেই স্বামী ছবিটার ফ্রেম ভেঙে, মাড়িয়ে একসা কাণ্ড করেন। পেপারওয়েট দিয়ে মারতেও যান শোভনেশকে। শুনে আমি বললাম, এত কথা জানলেন কি করে? বললেন, ওখানে নিত্য নামে যে চাকরটা তখন ছিল, তার কাছ থেকে শুনেছেন। বুঝুন মাসিমা, চাকরবাকরের কথা শুনে এই সব গুজব ওঁর মত শিক্ষিত লোকও কিনা রটাচ্ছেন! কি যে

দেশের অবস্থা !"

রোহিণীর টেলিস্কোপ ও সুজাতার মাইক্রোস্কোপ এখন মুখোমুখি। একজন দেখতে পেল, গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীতে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে, অন্যজন দেখলেন, নানাবিধ ভাইরাস কিলবিল করছে।

"তোমার কাজের মালিকের নাম কি ?"

"গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি।"

শুনেই সুজাতার মুখের উপর দিয়ে কালো মেঘ ভেসে গেল। ঠোঁট টিপে ধরলেন, চোয়ালের পেশি শক্ত হল।

"মনে হচ্ছে, লোকটাকে তখন দেখেছি। অনুতোষের কাছে শুনলাম, শোভনেশের ভাল ভাল বহু ছবি নাকি ওর কাছে আছে। চড়া দামে নাকি একটা দুটো বিক্রি করছে আর টাকাটা পকেটে পুরছে। আবার ছবি জাল করার ব্যবসাও নাকি আছে।"

"কার, গঙ্গাপ্রসাদের ?"

"হ্যাঁ। এই গঙ্গাপ্রসাদ আর একটা লোক মিলে নাকি জাল করার ব্যবসাটা চালাচ্ছিল। অনুতোষ তখন বেকার। ও তখন কিছুদিন কাজ করেছিল।"

"শোভনেশ সেনগুপ্ত কি জানত না, তার ছবি নিয়ে জালিয়াতি কারবার চলছে ?"

"হয়তো জানত, হয়তো জানত না। আমি সে কথা আর বলি কি করে ! তবে বৌয়ের গঞ্জনায়, টাকা রোজগারের জন্য হয়তো জেনেও টাকা খেয়ে চুপ করে ছিল।"

"অনুতোষ কোথায় গিয়ে কাজ করত ?"

"জায়গাটার কি একটা নাম যেন বলল···কি একটা বাগান দিয়ে নাম।"

"চোরবাগান, মোহনবাগান, লাটবাগান, জোড়াবাগান, গোয়াবাগান, নাথেরবাগান···।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, গোয়াবাগান, হেদোর কাছে।"

"বৌটাই তা হলে আসল পাজি।"

রোহিণী জ্যাবজ্যাবে সাবল্য মুখে লেপে, দৃঢ় সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেখল ঠনঠনে স্টপে বাস হাজির।

তার হাতে প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছিল যে মেয়েটি, সে কপালে ও বুকে দুবার আঙুল ছুঁইয়ে কালীপ্রণাম সেরে নিল।

"এইসব মেয়েরাই পুরুষদের নষ্ট করে। মাসিমা, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা ফিচার লিখব মহারানীতে। আপনি আমায় মেটিরিয়াল দেবেন ? নাম ঠিকানা কি জানেন এই বৌটার ? তা হলে একবার কথাও বলে নিতাম।"

আবার টেলিস্কোপ ! সুজাতা কি একটা বলতে গিয়ে হাঁ করেও মুখ বন্ধ করলেন।

"এসব কথা এখন থাক।"

রোহিণী ভেবে দেখল, ঠাণ্ডা যুদ্ধটা যখন শুরু হয়েই গেছে, তখন বার্লিন প্রাচীরের মত একটা টেনশান দিয়ে সেটা মুলতুবি রাখলে কোনদিনই এর মীমাংসা হবে না। সুজাতা জেনেছে সে কার বৌ, আর সেও জানিয়ে দিয়েছে হৃদয়রঞ্জনের হাতে মার খেয়ে সুজাতা সাতদিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। কিন্তু ননদের ছেলে অনুতোষের নাম করে তার সম্পর্কে যে সব কথা বলল, সেটা তো হিরোসিমার উপর নামিয়ে দেওয়া অ্যাটম বোমাটার থেকেও ভয়ঙ্কর ! সে কিনা শোভনেশকে মেন্টাল টর্চার করত ? সে কিনা খুব খরচে ছিল ? খালি টাকা চাইত ? গঞ্জনা দিত ? এই রকম মিথ্যে কথা তো গোয়েরিংয়ের জিভেও আটকে যাবে।

মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে উঠল রোহিণীর। বুড়িটা নিশ্চয় কথাগুলো বানিয়ে বলল। আসলে তাকে টর্চার করে মজা পাবার জন্যই এই বিটলেমিটা করল। ঠিক আছে, এর শোধ কিভাবে নিতে হয় তা দেখাব। রোহিণী মুখ ঘুরিয়ে দেখল হৃদয়রঞ্জন একই জায়গায় একই ভাবে রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নির্লিপ্ত গোবেচারা মুখ। ওটা ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস বা ক্রাকাতোয়া কিনা, সেটা একবার খুঁচিয়ে দেখলে কেমন হয়। বৌকে পিটিয়েছিল যে-জ্বলুনিতে, সেটার উৎপত্তি যদি ঈর্ষা থেকে হয় তাহলে ওর বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরিটা এখনো থাকারই কথা। ঈর্ষা কখনো নেভে না। নিশ্চয় শোভনেশ সম্পর্কে ওরও কিছু বলার কথা আছে।

এরপর রোহিণীর মাথার মধ্যে আগুনটা একটু একটু করে নিভে আসতে লাগল, যখন বিধান সরণি থেকে বাসটা বিবেকানন্দ রোডে ঘুরল। তার সম্পর্কে কে কি বলল, কে কি ভাবল, তাই নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। যে জীবন ছেঁড়া কাপড়ের মত ফেলে দিয়ে এসেছে, সেটাকে আবার কুড়িয়ে নিয়ে তার খুঁটে কিছু বাঁধা আছে কিনা দেখার ইচ্ছেটা আর নেই।

তবে গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে সুজাতা যা বলল, সেটা রোহিণীকে আশ্চর্য করল না। এই রকমই একটা সন্দেহ তার হচ্ছিল যে, শোভনেশের ছবিগুলো গঙ্গাদাই হাতিয়েছেন, হয়তো বাড়িটাও কব্জা করেছেন, সিদ্ধার্থ বলল, মামলা চলার সময়ই বাড়িটা বিক্রি হয়েছে। কে কিনেছে ? গঙ্গাদাই কি ? ছেলের নামে কিংবা বৌয়ের নামে।

ছবি জাল করার ব্যবসায় কি গঙ্গাদা নামবেন ? আর একটা লোকের সঙ্গে মিলে এই ব্যবসাটা গঙ্গাদা চালাচ্ছিলেন। লোকটা তো অবশ্যই সুভাষ গায়েন। কিন্তু কথাটা কি বিশ্বাস করার মত ? এই দুটো লোক একসঙ্গে জুটল কি করে ? জুটতে পারে। স্বার্থ যদি একই হয়, তখন সাপও ব্যাঙের গালে চুমু খায়। গঙ্গাদার কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ছবি জালের কারবার, সুভাষ গায়েনকে খুনের চেষ্টা, তাকে লেখা উড়ো চিঠি, এবং গায়েনের সন্দেহ—এই সব কথা পেড়ে দেখতে হবে কিভাবে রিয়্যাক্ট করেন।

কিন্তু এই যে বুড়ি, গঙ্গাপ্রসাদের নাম শোনামাত্র মুখ কালো করে দাঁতে দাঁত ঘষার মত একটা মুখভাব করল, নিশ্চয় এও গঙ্গাদা সম্পর্কে কিছু জানে, ওর পেট থেকে আর কিছুল বেরোয় কিনা সেটা দেখতে হবে। খুন হলেই নাকি মেয়েছেলে খোঁজা হয় পিছনের উদ্দেশ্য আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে, টাকাই মূল মোটিভ। কিন্তু তাই বলে দ্বিতীয় বৌয়ের ঘাড়ে দোষ চাপানো ?

মাণিকতলার মোড় পেরোনোর সময় বড় বড় গর্তে পড়ে বাসটা এমনই লাফালাফি করল যে, রোহিণীর চিন্তার গতিপথটাই বদলে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, খুনটা যদি টাকার জন্যই হয়, তাহলে টাকা কামাবার জন্য শোভনেশ বাধ্য হয়েছিল, যেহেতু তার দ্বিতীয় বৌটা তাকে অবিরাম টাকার জন্য খোঁচাত, গঞ্জনা দিত। এই রকম একটা ধারণা বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারলে দোষটা রোহিণীর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

আর এই ছড়ানোর কাজটাই বোধহয় নিয়েছে সুজাতা গুপ্ত। ওর ননদের ছেলে অনুতোষ তাকে এই সব বলেছে—একদম বাজে কথা। গঙ্গাদা যে সেদিন বললেন, "সী ইজ এ লায়ার", বোধহয় ভুল বলেননি। অনুতোষের নাম করে নিজেই এসব বানিয়েছে। এখন নানান জায়গায় বলে বেড়াবে। নানান জায়গা বলতে তো কয়েকটা ফ্ল্যাট !

ওদের সামনে তুষার দত্তরা, রোহিণীর সামনের শ্রীনিবাসনরা, নিচের দোতলার দত্তরায়রা, কি যেন মেয়েটির নাম ? রোহিণী অবাক হল ! এর মধ্যেই নামটা ভুলে

গেলাম। মাথাটা কি যে গণ্ডগোল করছে না! সে প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। আর এই চেষ্টাটায় সফল হয়ে যখন সে আপন মনেই "কুন্তী, হ্যাঁ, কুন্তী" বলে উঠল, তখন সুজাতা গুপ্ত ঝুঁকে বললেন, "কিছু বলছ ?"

"না।" রোহিণী বাধ্য হল বোকার মত হাসতে। "একটা নাম মনে আসছিল না, এখন মনে এল।"

"তুমি তো অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি বিড়বিড় করে কি যেন আপন মনে বকে যাচ্ছিলে, মাথা নাড়ছিলে। ভাবলাম পাগল-টাগল হয়ে গেলে নাকি ?"

পাগল টাগল বললেন কেন ? রোহিণী টেলিস্কোপ তাক করল। সৌরমণ্ডলে কোন বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছে না। তাহলে কি ধরে নেবে, পাগল-টাগল বলার পিছনে কোন উদ্দেশ্য নেই ? পাগলের বংশে বিয়ে হওয়ার খোঁচা তাহলে বোধহয় নয় ! হতে পারে।

"তোমার হাতে প্যাকেট রেখে মেয়েটা গেল কোথায় ?" সুজাতা ভিড়ের মধ্যে দৃষ্টি সেঁধোবার চেষ্টা করতে করতে বললেন "তাই তো। গেল কোথায় ? আমরা এলাম কোথায় ?" রোহিণী সামনে দাঁড়ানো লোকটিকেই জিজ্ঞাসা করল। প্যাকেটটার গায়ে আঠা দিয়ে একটা কাগজ আঁটা। লতাপাতার নক্সার মধ্যে তাতে লাল কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে বড় বড় করে লেখা : 'সুধীর সরকারের সঙ্গে রানী মণ্ডলের বিয়েতে প্রীতি উপহার--প্রণতা খুকু (সুচরিতা দত্ত, ক্লাস নাইন।)

কোথায় এসেছে সেটা জানালা দিয়ে দেখার জন্য লোকটি নিচু হল। রোহিণীর মুখের কাছে মুখ। মুখে ভাল জর্দার গন্ধ।

"মাড়োয়ারিবাগান ছাড়িয়ে এখন কাঁকুড়গাছি যাচ্ছে।"

জায়গা চিনতে লোকটি একটু বেশিক্ষণই নিচু হয়ে রইল। কিছু করার নেই। কিন্তু মেয়েটি বলেছিল বাগমারিতে যাবে। তাহলে অন্তত তিনটে স্টপ আগে নেমে গেছে। ভিড় বাস থেকে নামার জন্য অনেক আগে থেকে একটা মানসিক অঙ্ক কষতে শুরু করতে হয়। তার উপর ধাক্কা, চাপ এবং ঝাঁকুনি সামলাতে দুটো হাতকেই কাজে নিযুক্ত রাখতে হয়। মন এবং হাত ব্যস্ত থাকলে হাতে রাখার জিনিসটা ভুলে যাওয়াই সম্ভব।

তাহলে কি করবে সে এখন ? বেচারা নিশ্চয় বিয়েবাড়িতেই যাচ্ছিল উপহার নিয়ে। প্যাকেটটার ওজন খুব বেশি নয়। সামান্য দামের জিনিসই হবে।

"কি করি মাসিমা ?" রোহিণী অসহায় স্বরে পরামর্শ চাইল।

"কণ্ডাক্টরকে দিয়ে দাও। ও জমা দিয়ে দেবে বাসের অফিসে। যার জিনিস সে নিশ্চয় একবার খোঁজ করবে, তখন পেয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, তাই করা উচিত। কিন্তু এখন তো সে হাতে করে উপহারটা দিতে পারছে না। নিশ্চয় খুব লজ্জায় পড়ে যাবে। সবাই দিচ্ছে, অথচ সে খালি হাতে যেন শুধু খেতেই এসেছে। অবশ্য ও বলবেই যে, বাসে একজনকে ধরতে দিয়েছিল, কিন্তু তাড়াহুড়োয় নামতে গিয়ে ভুলে গেছে আর যার হাতে রাখতে দিয়েছিল, সেও বেমালুম চেপে গেছে। না, না, আমার খুব বিশ্রী লাগছে।"

"এখন তো আর মেয়েটিকে খুঁজে বার করা সম্ভব নয় যে, তার হাতে দিয়ে আসবে।"

বাস কাঁকুড়গাছির মোড়ে। রোহিণী ধড়মড়িয়ে উঠে ধাক্কাধক্কি করে সিঁড়িতে দাঁড়ানো লোকেদের পা মাড়িয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল। খুঁজে বার করা সম্ভব নয় ! দেখি তো।

সে বাগমারির দিকে হাঁটতে লাগল। একটা বাড়িতে সার সার লাল-নীল-হলুদ টুনি বাল্‌ব ঝালরের মত চারতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত জ্বলছে। ফটকে উজ্জ্বল আলো,

অবশ্যই বিয়েবাড়ি। মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চাদের পোশাক, হাতে রাখা প্যাকেট, গহনা এমনকি আকণ্ঠ খাওয়ায় মুখের হাসফাঁসানি দূর থেকে দেখেই বোঝা যায়, কাছাকাছি বিয়ে কি বৌভাত হচ্ছে। রোহিণীর ভরসা এখন, বেনারসী-পরা, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো মেয়েরা। এদের ধরে ধরে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয় বেরিয়ে পড়বে, রানী মণ্ডলের বিয়ের ছাদনাতলাটা।

"আচ্ছা, আপনারা কি কোন বিয়ে বা বৌভাতে যাচ্ছেন ?"

বৌটি ভ্রু তুলে বলল, "বিয়েতে যাচ্ছি।"

"কনের নাম কি রাণী মণ্ডল ?"

"শুচিস্মিতা গাঙ্গুলি।"

"মাপ করবেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। আসলে ঠিকানাটা মনে করতে পারছি না··· অফিস কলীগ, তাই এইভাবে জিজ্ঞেস করে করে··· ।"

রোহিণী ঠিক করল, প্রথমে বাসস্টপগুলো দেখবে। নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরা লোকেদের কেউ না কেউ নির্ঘাৎ বাস ধরতে এখানে থাকবেই। রেল ব্রিজের তলা দিয়ে এগিয়ে সে দু' ধারের বাড়িগুলোর একটাতেও বিয়ে বাড়ির আলো দেখতে পেল না। ফুল সাজানো একটা মোটরও রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই, বরযাত্রীদের মিনিবাসও নয়। অ্যামপ্লিফায়ারে সানাই, হিন্দি গান এমনকি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডও বাজতে শুনল না। দুদিকে গলি দেখলেই থমকে গিয়ে ভিতর দিকে চোখ পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাসস্টপে চারজন। তাদের একজনের হাতে রঙচটা একটি থলি, দুজনের মুখে ক্ষিদে, অন্য জন এক শিখ।

হতাশ হল রোহিণী। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে রইল বাসস্টপে, যদি ফুল, শাড়ির প্যাকেট হাতে ধুতি-গরদের পাঞ্জাবি বা ফাউণ্ডেশন ব্লাশার-কমপ্যাক্ট-গ্লো গেটাব লাঞ্ছিত মুখ একবারের জন্যও নজরে পড়ে।

একটা মিনিবাস থামল। তা থেকে পাঁচ জনের একটা পরিবার নামতেই রোহিণীর মুখে হাসি ফুটল। বিয়েবাড়ি যাওয়ার নিখুঁত প্রমাণ মহিলার শাড়িতে, গহনায়, বড় মেয়ের হাতে ধরা শাড়ির বাক্সে, কর্তার শাদা চটিতে।

"কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব···আপনারা কি কোনো বিয়েতে যাচ্ছেন ?"

মহিলা প্রথমে হকচকালেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ যাচ্ছি, কেন ?"

"আচ্ছা, কনের নাম কি রানী মণ্ডল ?"

"তা তো বলতে পারব। ওনার বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ে। আমরা বরযাত্রী। হ্যাঁ গো, কনের নামটা কি ?"

কর্তা বিব্রত হলেন। সেটা কাটাতেই একটু বিরক্তি দেখিয়ে বললেন, "কেন, তা দিয়ে কি হবে ?"

"আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি। একটা বিয়ে বাড়িতে যাব, কিন্তু ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। শুধু বর কনের নামটাই— ।"

"খেতে যাবেন অথচ বাড়িটাই চেনেন না !"

"আপনি কি কনের নামটা জানেন ?" রোহিণী গলার স্বর খরখরে করল।

"বরের নাম জানি, অচ্যুত মুখার্জি। রাইটার্সে কাজ করে।"

"নাহ্। ধন্যবাদ !"

রোহিণী আর দাঁড়াল না। পরের স্টপের জন্য বাগমারির দিকে হাঁটা শুরু করল।

পেয়েছি। রজনীগন্ধার ছড়, প্রেসার কুকারের বাক্স নিয়ে সাত-আটজনের একটা দল। একজন বাদে সবারই পরনে প্যান্ট। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রোহিণী গতিরোধ করল এবং "আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি" দিয়ে শুরু করল।

"কনের নাম? অ্যাই কার্ডটা দ্যাখ তো। মানে বিয়েটা আমাদের কলিগের বোনের।"

"বরের নাম সুধীর সরকার কি?"

"না তো", একজন নিমন্ত্রণপত্র বার করে পড়ে বলল, "নীলোৎপল ঘোষ আর মানসী গুহ।"

"সরি আপনাদের ট্রাবল দিলাম।"

"না না, এ আর..."

রোহিণী পা বাড়াল। কানে এল চাপা মন্তব্য "খিদেটা মাইরি বেড়ে গেল।" বাগমারি বাজারের স্টপে কিছু লোক। এইটাই তার শেষ চেষ্টার জায়গা। তিনটি কিশোরী। বিয়েবাড়িরই সাজগোজ। একটু নিশ্চিত হবার জন্য রোহিণী ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কথা শোনার জন্য।

ওরা কথা বন্ধ করে তাকে দেখতে লাগল। কানে কানে কিছু বলে মুখটিপে হাসলও। রোহিণী একটু বিব্রত হল। নিজের শাড়ি ঠিক আছে কিনা দেখল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে রুমালটা দেখল। কিছু লেগেনি মুখে। তাহলে হাসল কেন?

"আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব?" তিনজনের একজন সপ্রতিভ ভাবে রোহিণীকে বলল।

"বলো।"

"আমাদের এক বন্ধু ঠিক আপনার মত দেখতে একজনকে বাসে একটা জিনিস, আজকেই, এই আধ ঘণ্টাটাক আগে—"

"আরে, আমি তো তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই কত দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। যদি রাস্তায় দেখা হয়ে যায়, এই ভেবে আন্দাজেই আসছি। শুধু বলেছিল, বাগমারিতে নামব। তোমার বন্ধুর নাম কি?"

"সুচরিতা।"

"ব্যস, মিলে গেছে। এই নাও, তাকে গিয়ে দিয়ে দাও। বাব্বা হাঁফ ছাড়লাম।"

"আপনি গিয়েই বরং ওকে দিন। এই তো খুব কাছেই এক মিনিটের পথ। ও চুপ করে বসে আছে। কাঁদছিল।"

"আহা রে, চলো চলো। কার বিয়ে? স্কুলের ক'জন এসেছে?"

"রাণীদির বিয়ে। আমাদের ফিজিক্যাল সায়ান্সের টিচার। আমরা চারজন যারা ওঁর কাছে প্রাইভেটে পড়ি, তাদেরই শুধু বলেছেন।"

মিনিট দুই হাঁটতে হল। ছোট একতলা বাড়ি। দরজায় একটা দুশো ওয়াটের বাল্ব আর ভেলভেটের পর্দা। বাইরে কয়েকটা চেয়ারে বরযাত্রীরা বসে। ভিতরে মাটির উঠোনে সামিয়ানার এক ধারে খাওয়ার জায়গা, অন্য ধারে কাপড় ঘেরা জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

সুচরিতা খবর পেয়ে ছুটে এল। প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দিতেই, আবেগে দিশেহারা হয়ে সে রোহিণীকে প্রণাম করল। প্রণাম পাওয়া রোহিণীর মনে হল, জীবনে তার এটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রাপ্তি। সুচরিতার মাথায় হাত রেখে রোহিণী তৃপ্ত নয়নে তাকে জড়িয়ে

ধরে বলল, "আমার পরিশ্রমটা সার্থক হল।"

কথাটা বলেই দেখল, বিয়ের জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসছে সুভাষ গায়েন। রোহিণীকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়ে বলল, "আপনি এখানে ? এটা তো আমার বোনের বাড়ি। রানী তো আমার ভাগ্নী।"

এটা আপনার বোনের বাড়ি !"

আজ দ্বিতীয়বার সুভাষ গায়েনের সঙ্গে তার দেখা হল। আর কি অদ্ভুত একটা জায়গায়। বিয়ে বাড়িতে, যেখানে সে রবাহূত !

"হ্যাঁ বোনের বাড়ি, কিন্তু আপনি ? রানীর সঙ্গে বোধহয় পরিচয় আছে।"

সুভাষ গায়েন ধরে নিয়েছে তার ভাগ্নী রানী মণ্ডল, যার আজ বিয়ে, রোহিণী বোধহয় তার বান্ধবী বা ওই রকম কিছু। সুভাষের ভুলটা ভেঙে দিয়ে, এখানে তার আসার পিছনের কারণটা রোহিণী বলল।

"তাজ্জব কথা ! একটা উপহার ফেরত দেবার জন্য এত কাণ্ড করলেন ?"

"এর মধ্যে কাণ্ড দেখলেন ? একটু বুদ্ধি আর একটু ইচ্ছা খরচ করে যদি একটা মেয়ের সেন্টিমেন্ট রক্ষা করা যায়, তাতে তাজ্জব হবার কি আছে ? এর থেকেও তো কত বড় বড় কাণ্ড আপনিই করে ফেলেছেন, সেটা কি ভুলে গেলেন ?"

"আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।" সুভাষ গায়েন প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। "এসে যখন পড়েছেন, তখন খেয়ে যেতেই হবে।"

রোহিণী "আরে না না", বলে শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুভাষ গায়েন ঝপ করে তার কব্জি চেপে ধরে টানল ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য। রোহিণী ওর মুখ দেখে বুঝল, অত্যন্ত খুশি এবং প্রীত হয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আপনজনের মতই তার হাতটা ধরেছে। হঠাৎই এমন এক অতিথি পেয়ে গিয়ে ওর মানসিক ভারসাম্যটা কয়েক ডিগ্রি পড়ে গেছে। রোহিণীর মনে হল সুভাষ গায়েন মোটেই কঠিন, ক্রুর, খল চরিত্রের লোক নয়।

"না খাবার জন্য আপনি তেত্রিশটা কারণ দেখাবেন, আর আমি ছেষট্টিটা কারণ দাখিল করতে পারি। আচ্ছা শেষ কবে বিয়েবাড়িতে খেয়েছেন বলুন তো ?"

রোহিণী ফাঁপরে পড়ল। সত্যিই সে মনে করতে পারছে না। বছর দশেকের মধ্যে তো নয়ই। বিয়ের পর শোভনেশের সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়নি। বোম্বাইয়ে দিদির কাছে থাকার সময় এক গুজরাতি বৌভাতে দিদির সঙ্গে গেছিল। একটা সফ্‌ট ড্রিঙ্ক খেয়েছিল। বাড়ি ফিরে দিদি বলেছিল, "এই ভাল। সর্ষের তেল আর বনস্পতি পেটে ঢুকিয়ে গ্যাসট্রিকটাকে বাড়িয়ে শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করার থেকে এইসব খাওয়ার পাট তুলে দেওয়াই ভাল।" বোম্বাই থেকে ফিরে সে যেভাবে জীবন কাটাচ্ছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবহীন হয়ে, তাতে বিয়ের নিমন্ত্রণ কপালে জোটার কথা নয়।

"অনেক দিন খাইনি, আর সেজন্যই আমার স্টমাক বিয়ের ভোজে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং সুভাষবাবু, আমাকে মাফ করবেন।"

"দই সন্দেশেও কি অভ্যস্ত নয় ?"

"একটা সন্দেশ, ব্যস।"

"তাহলে ভেতরে আসুন একবার।"

সংসার করার যাবতীয় জিনিসে ভরা একটি ছোট ঘর। খাটের কোণে মেঝেয় বসে আছে কনে। তাকে ঘিরে রয়েছে নানা বয়সী স্ত্রীলোক। উপহারগুলো কনের পাশে

জড়ো করে রাখা। একটি মেয়ের হাতে খাতা কলম। ঘরে পা ফেলার জায়গা নেই। বিয়ের লগ্ন দশটায় শুরু। বর এখনো আসেনি। প্রথম ব্যাচ খেয়ে উঠেছে। বিয়ে দেখে যাওয়ার সময় তাদের নেই। তাদের বাড়ি ফেরার বাস পাবে না। কলকাতায় সামাজিকতা নিয়ন্ত্রণ করে পরিবহণ ব্যবস্থা। সমস্যাটা রোহিণীরও। অজ পাড়াগাঁর লোকেদের মত রাত নটা বেজে গেলেই তারও উসখুশানি শুরু হয় সল্ট লেকের বাসের কথা ভেবে।

সুভাষ গায়েন তাকে পরিচয় করিয়ে দিল এই বলে, "বিখ্যাত আর্টিস্ট শোভনেশ সেনগুপ্তর স্ত্রী। কাজ করেন মহারানী ম্যাগাজিনে। আজ সকালে মীনার ইন্টারভিউ নিতে গেছিলেন, তখনই ওনাকে নেমন্তন্ন করেছিলুম। অবশ্য আর একটা ব্যাপারও ঘটে গেছে এর মধ্যে। বাসে ওঁর হাতে একটি মেয়ে উপহারের প্যাকেট ধরতে দিয়ে ভুলে গিয়ে নেমে যায়। উনি সেটা ফিরিয়ে দেবার জন্য খুঁজে খুঁজে শেষকালে এইখানেই পৌঁছে গেছেন। একেই বলে ভগবানের হাত ! কি অদ্ভুত যোগাযোগ !"

ঘরের দরজার কাছ থেকেই রোহিণী নমস্কার জানাল। কনে স্কুল শিক্ষিকা, বয়স বছর ত্রিশ। রোহিণীর মজা লাগল ঘরের সকলের অবাক চাহনি দেখে। তার ক্ষীণভাবে ইচ্ছে হল, এদের সঙ্গে বসে গল্প করার। এরা সবাই মা, মাসি, পিসি-বোনঝি-ভাইঝি, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সামাজিক, পারিবারিক পরিচয়ে চিহ্নিত। তার পরিচয় শুধু কিনা আর্টিস্টের স্ত্রী, যে আর্টিস্ট এখন জেল ভেঙে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ জানে না, আর সে নিজে কিনা কোন্ এক মহারানীতে কাজ করে ! এটা কি কোন মেয়ের পরিচয় হল ? সে কারুর ননদ নয়, ভাজ নয়, বৌদি নয়, কাকিমা নয়।

হঠাৎ রাজেনকে তার মনে পড়ল। এতক্ষণে জয়পুরে কোন হোটেলে নিশ্চয় গা এলিয়ে খাটে শুয়ে। ফিরে এলেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে রাজেন তার সম্পর্কে কি বলেছে সেটা ভাল করে ভেঙে বলছে না। নিশ্চয় কিছু কিছু ব্যাপার চেপে গিয়েই বলেছে। এটা উচিত নয়। সে নিজে গিয়ে রাজেনের মা'র সঙ্গে কথা বলে আসবে।

"চলুন বাইরে চেয়ারে ততক্ষণ বসি।"

বাইরে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গেই রোহিণী বলল, "মিথ্যা কথাটা বললেন কেন ? সকালে তো ঘুণাক্ষরেও বলেননি আজ আপনার ভাগ্নীর বিয়ে, নেমন্তন্ন করা তো দূরের কথা !"

"একটু আধটু রঙ চড়িয়ে বলা আমার অভ্যেস। এতে তো কারুর ক্ষতি হচ্ছে না।"

"তাহলে এতদিনে যা যা বলেছেন, তাতেও রঙটঙ চড়িয়েছেন ?"

"যেমন ?"

"গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জির সঙ্গে মিলে আপনি শোভনেশের ছবি নকল করার ব্যবসা খুলেছিলেন। আমার কাছে এই কথাটা চেপে গেছেন আর আপনাকে খুনের চেষ্টার কথাটা বলেছেন রঙ চড়িয়ে।"

সুভাষ গায়েনের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে ওঠার বদলে থমথম করে উঠল রাগ। সেটা রোহিণীর জন্য নয়।

"কিছু কিছু মিথ্যে কথা আপনাকে বলেছি ঠিকই, তবে সবটাই তা নয়। শোভনেশের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলি, বীণার বিশেষ বিশেষ পোজের ছবি আঁকার জন্য। টাকার জন্য উনি রাজি হন। এ কথার মধ্যে কোন ভেজাল বা রঙটঙ নেই। ওই রকম একটা ছবি গঙ্গাপ্রসাদ দেখে ফেলে শোভনেশের বাড়িতে। দেখার পর লোকটার মনে কি ঘটল

কে জানে, সে শোভনেশকে সরিয়ে তার বাড়িতে মোমিনপুরে, তারপর সেখান থেকে গ্রামের বাড়ি বাসুদেবপুরে নিয়ে গিয়ে রাখে। আমি খোঁজ করে করে বাসুদেবপুরে গিয়ে হাজির হলুম। গিয়ে কী দেখলুম জানেন ?"

"কি করে জানব ?" রোহিণী মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছে সিদ্ধার্থর কাছ থেকে আজ বিকেলেই শোনা কথাগুলোকে।

"শোভনেশ ছবি আঁকছে, হ্যাঁ বীণারই ছবি, তবে ন্যুড নয়। গলা টিপে ধরে, খাড়ার কোপ মেরে, গায়ে আগুন লাগিয়ে, জলে মুখ চেপে ধরে, বন্দুক দিয়ে গুলি করে—যত রকমে সম্ভব, তত রকমে একটা উলঙ্গ মেয়েকে খুন করছে একটা লোক এই হচ্ছে শোভনেশের ছবির বিষয়, লাল আর কালো রঙে আঁকা বীভৎস সব ছবি !"

"ওখানে আপনি ওকে গ্রাম আর প্রকৃতি নিয়ে ছবি আঁকতে দেখেননি ?"

"না। ঘরে শুধু ওই ছবিগুলোই দেখেছি।"

"আপনাকে কিছু বলল ?"

"আমি ওকে এক সময় ভয় দেখিয়েছিলুম, যে-রকম ছবি ওকে আঁকতে বলেছি, যদি সেই রকম ছবি এঁকে না দেয়, তাহলে কোর্টে যাব, আমার বৌয়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত এই অভিযোগ নিয়ে। তাইতে উনি ভয় পান আর আমার চাহিদা মত ছবি আঁকেন। বাসদেবপুরে আমাকে দেখে তেড়ে এলেন। এই মারেন তো সেই মারেন। বললেন, আর আমাকে দিয়ে নোংরা ছবি আঁকাতে পারবে না। আমাকে তোমরা নষ্ট করেছ, আমিও তোমাদের খুন করব। ওকে দেখে মনে হল মাথার ঠিক নেই, কেমন যেন উন্মাদের মত হাবভাব। আমি চলে এলাম।"

"এসে তারপর জাল করার কারবার শুরু করলেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি একা নই। তার আগে আপনার গঙ্গাদা একদিন এসে হাজির আমার গোয়াবাগানের বাড়িতে। উনি শোভনেশের কাছ থেকে সব শুনেছিলেন আমার সম্পর্কে। এই বদবুদ্ধিটা ওনার মাথাতেই প্রথম খেলে। উনিই আমাকে প্রস্তাব দেন, এই সব ছবির যখন এত ভাল বাজার, এত ভাল দাম, তাহলে দুজনে মিলে শুরু করা যাক। আমি রাজি হইনি। কেন হবো ? ব্যবসাটা তো আমি একাই শুরু করতে পারি, আবার পার্টনার নোব কেন ? গঙ্গাপ্রসাদকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি একাই নেমে পড়লাম।"

"গঙ্গাদা নিশ্চয় তা জানতে পারেন।"

"হ্যাঁ পারে। তার প্রমাণ আমাকে খুনের চেষ্টা। কোন সন্দেহ নেই, গঙ্গাপ্রসাদই আমাকে মারতে চেয়েছিল। আমি যে বাসুদেবপুর গিয়েছিলুম, এটা জানতে পেরে উনি ক্রমাগতই বন্ধুকে ওসকাতেন আমার বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ করতে। কিন্তু শোভনেশ তাতে রাজী হয়নি। কেননা তাহলে বীণাকেও কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হতো। এরপর ওই প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে গঙ্গাপ্রসাদের আসা আর আমার রাজী না হওয়া…থাক এখন এসব কথা, নিন ধরুন।"

একটি মেয়ে মাটির প্লেটে কলাপাতার উপর কয়েকটি রুই মাছের টুকরো, চারটি সন্দেশ, মাটির গ্লাসে দই নিয়ে রোহিণীর সামনে দাঁড়িয়ে। দেখেই আঁতকে উঠল সে।

"আপনার যা স্বাস্থ্য, তাতে এগুলো ব্রেকফাস্ট হওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ উচিত, তবে এখন তো ব্রেকফাস্টের সময় নয়। তাই একটা সন্দেশ, কেমন ?"

"তাহলে কাল সকালেই খাবেন। ওরে এগুলো কলাপাতায় মুড়ে বেঁধে দে তো।"

"তার মানে ! ছাঁদা ?"

"উপহার। ছাঁদা কে বলল ?" সুভাষ গায়েন মৃদু ধমক দিল। "আপনার ওই ঝোলার মধ্যে দিব্যি চলে যাবে, শুধু দেখবেন বাসে, কেউ চাপটাপ না দেয়।"

"কিন্তু এভাবে, না না।"

"নিয়ে যান, এতে লজ্জার কিছু নেই। মীনাও বহু পার্টিতে না খেয়ে খাবারটা বাড়িতে নিয়ে আসে। আমিও তাতে ভাগ বসাই। আপনার বাড়িতে আরো তো লোক আছে ?"

"না, আমি একাই থাকি। একটা ঝি-চাকরও নেই।"

"নিজেই রাঁধেন। বাহ্ তাহলে তো একটু বেশি করেই—" বলতে বলতে সুভাষ গায়েন ভিতরে ঢুকে গেল।

অপ্রতিভ অপ্রস্তুত রোহিণী। এতক্ষণ যে সব কথা বলে সুভাষ গায়েন তাকে অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখে দিয়েছিল, এখন তার দ্বিগুণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল। শোভনেশ খুনের ছবি আঁকত বাসুদেবপুরে। গঙ্গাদা বলেছে, গ্রামজীবনের শান্ত স্নিগ্ধ ছবি আঁকত। গঙ্গাদাই তাহলে ছবি নকল করার মতলবটা সুভাষ গায়েনকে দেয় ! সুভাষকে খুনের চেষ্টা—হ্যাঁ, গঙ্গাদার পক্ষে তা করার পিছনে যুক্তি আছে। অতঃপর মনে হল, ছাঁদাটা একটু বড় করে দেওয়ার পিছনেও যুক্তি আছে। বাড়ি গিয়ে তাকে তাহলে রান্নার উদ্যোগ করতে হবে না।

"দেখি, দিন।"

রোহিণীর কাঁধ থেকে ঝোলাটা টেনে খুলে নিয়ে সুভাষ গায়েন তালের মত একটা কাগজের পুঁটলি তার মধ্যে সাবধানে বসিয়ে দিল।

"শীতকাল, মনে হয় না নষ্ট হবে। কাল দুপুরেও ভাতের সঙ্গে— অবশ্য আজ রাতেই যদি সব শেষ করে না দেন।"

"আমাকে দেখে কি খুব খাইয়ে মনে হচ্ছে ?"

"বীণা খুব খেতে ভালবাসত। চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি।"

বীণা ভালবাসত বলে সেও খেতে ভালবাসবে, এমন ধারণা লোকটার হল কি করে ? হঠাৎ রোহিণীর মনে পড়ল সিদ্ধার্থকে বলা গঙ্গাদার কথা : বীণা আর তার শরীরের ধাঁচ নাকি একই রকম।

মিনিবাসে ওঠার আগে সুভাষ গায়েন বলল, "আরো অনেক কথা ছিল, পরে একদিন বলবখন।"

বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে রোহিণী ফ্ল্যাটের দরজা খোলার সময় উপরের সিঁড়ির দিকে তাকাল। সুজাতা বা হৃদয়রঞ্জন যে দাঁড়িয়ে থাকবেন না সিঁড়িতে, তা জানে। তবু এই রকমই হয় মনের মধ্যে। ওঁদের সঙ্গে পরিচয়ের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হবার আগেই ভেঙে গেল।

পুঁটলি খুলে কলাপাতা সরিয়েই রোহিণী "ওরে বাবা" বলে উঠল। দুজনে দুবেলা খাওয়া যায় এত জিনিস ! লুচিতে বেগুন ভাজাটা রেখে, পাট করে মুখে সবে দিয়েছে, তখনই বেল বেজে উঠল। রোহিণীর বুকের মধ্যে কাঁপন লাগল।

আই হোল দিয়ে তাকিয়ে দেখল হৃদয়রঞ্জন শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে।

"কি ব্যাপার ! এত রাতে আপনি ?"

রোহিণী সারাদিনে যত বিস্ময় সঞ্চয় করেছে তা একসঙ্গে উদ্গিরণ করল গলা দিয়ে। এখন সে শোভনেশকে দেখলেও ততটা আশ্চর্য হত না, যতটা হল, যথেষ্ট আলাপ না

হওয়া, বার্ধক্যে পৌঁছানো তার এই প্রতিবেশীটিকে দেখে।

"আপনার কাছে রক্ত বন্ধ হওয়ার কোন ওষুধ আছে?" ক্ষীণ মৃদুস্বরে কথাটা বলে হৃদয়রঞ্জন, সকাতর নিবেদন করার মত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"রক্ত! কেন? কার?" রোহিণীর বোধ-বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে রক্ত শব্দটা শুনে। "আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।"

"আমার নয়। ফিস ফিস স্বরে হৃদয়রঞ্জন ভুল শুধরে দিলেন, "সুজাতা পড়ে গেছে মাথা ঘুরে। ডাইনিং টেবলের কোণটা গালে লেগেছে। টিংচার কি বেঞ্জিন কি মলম-টলম যদি থাকে?"

রোহিণী অসহায় বোধ করল। কোনোটাই নেই তার কাছে। ছোটখাট দুর্ঘটনার জন্য এই সব ওষুধপত্তর হাতের কাছে রাখা যে দরকার, এটা সে ছোটবেলাতেই বাবার কাছে শুনে রেখেছে। কাটা, মচকানো বা সর্দি-জ্বরের মত ব্যাপারের জন্য কিছু ওষুধ কিনে রাখার কথা ভেবেও কিনি কিনি করে আর কেনা হয়নি।

"আমার কাছে তো কিছুই নেই, অন্য কারুর কাছে যদি...দাঁড়ান দাঁড়ান তুষারবাবুর কাছে বোধহয়—"

কথা শেষ না করেই রোহিণী এক এক লাফে দুটো করে সিঁড়ি টপকে উপরে এসে তুষার দত্তর ফ্ল্যাটের বেল বাজাল। সেকেন্ড দশেকের মধ্যেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন স্বয়ং তুষার দত্তই। তিনিও চমকিত এবং বিগলিতও।

"তুষারবাবু, আপনার কাছে ধাক্কা লেগে কেটে যাওয়ার কোন ওষুধ আছে?"

"আপনার? কোথায় কোথায়? ...কোথায় ধাক্কা লাগল, কোমরে?"

তুষার দত্তর বাড়ানো হাত থেকে রেহাই পেতে রোহিণী দুহাত পিছোল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। অ্যাই নন্দা, ফার্স্ট এড বাক্সোটা দে, চটপট। ...চলুন।"

সেই মুশকিলটা আবার ঘটেছে, যেটা ঘটেছিল শ্রীনিবাসনদের কপালে। হৃদয়রঞ্জন ব্যস্ততার জন্য সঙ্গে চাবি নিয়ে বেরোননি। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই তালা পড়ে গেছে। এখন ভিতর থেকে না খুলে দিলে দরজা খুলবে না। ভিতরে সুজাতা রয়েছে, কিন্তু তিনি তো গুরুতর আহত। রোহিণী ভাবল, হেঁটে এসে দরজা খুলে দিতে পারবেন কি? তবু সে আর একবার বেল বাজাল। দরজায় কান ঠেকিয়ে শোনার চেষ্টা করল সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা!

একেবারেই চুপচাপ। ভিতরে কোন প্রাণী আছে বলে মনেই হচ্ছে না। হৃদয়রঞ্জন অসহায়ভাবে আই হোলের কাচের দিকে তাকিয়ে। তুষার দত্ত আর নন্দা তাকিয়ে রোহিণীর দিকে। নিজেদের দরজায় আরতিও দাঁড়িয়ে কৌতূহল নিয়ে। তুষার দত্ত আরো দু-তিনবার বেল বাজিয়ে বলল, "ভেঙে ফেলব দরজাটা?"

"না, না, আর একটু অপেক্ষা করা যাক। বুড়ো মানুষ, ইনজুরি নিয়ে দরজার কাছে হেঁটে আসবেন—" রোহিণীর কথা শেষ হবার আগেই লক-এর হাতল ঘোরাবার শব্দ হল। ধীরে ধীরে দরজার পাল্লাটা খুলে গেল। সুজাতা দাঁড়িয়ে।

একটা ভিজে ন্যাকড়া বাম গালে চেপে ধরে রয়েছে। বাঁ চোখে কালসিটে। ফুলে উঠে চোখ প্রায় বন্ধ। অন্য চোখে বিরক্তি। একটু শ্রান্ত স্বরে সুজাতা বললেন, "এত রাতে লোকজনকে বিরক্ত করার কি দরকার ছিল, ভেতরে এসো।"

হৃদয়রঞ্জন মাথা নিচু করে ভিতরে যেতেই সুজাতা বললেন, "উনি খুব নার্ভাস টাইপের, আমার তেমন কিছুই হয়নি। বরফ লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা—।"

দরজা বন্ধ হতেই তুষার দত্ত হতাশ চোখে তাকাল রোহিণীর দিকে। আর তখনই রোহিণী বলে উঠল, "সর্বনাশ হয়েছে।" সে প্রায় হুমড়ি খেতে খেতে নিচে নেমে এসে দেখল, সত্যিই তাই হয়েছে। তার নিজের ফ্ল্যাটের দরজাটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। উপরে উঠে আসার ব্যস্ততায় ভুলেই গেছে চাবিটা সঙ্গে রাখতে।

তুষার দত্তও তার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে তিন তলায়। রোহিণীর সমস্যাটা বুঝতে পেরেই তার মুখ থেকে হতাশা কেটে গিয়ে ঝলমল করে উঠল তৃপ্তি।

"আর 'না' বলতে পারবেন না। এবার দরজাটা ভাঙতেই হবে। বেশি নয়, একটা ছোট্ট পুশ করব কাঁধ দিয়ে, আর মড়াত করে একটা আওয়াজ হবে।"

"কিন্তু সেই আওয়াজ শোনার সৌভাগ্য তো আমার কপালে নেই।" রোহিণী মুখটা বিষণ্ণতায় ভরিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়ানো নন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার ডুপ্লিকেট চাবিটা এনে দাও তো নন্দা।"

"ওহ্ হো, তাই তো আপনার একটা চাবি তো আমাদের কাছেই রাখা আছে।" তুষার দত্তকে মনমরা দেখাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে বলল, "দেখুন, আমারই বুদ্ধিতে চাবিটা সেদিন করিয়েছিলেন বলেই আজ দরজা ভাঙার দরকার হল না।"

"নিশ্চয়। আমি তো বরাবরই মনে করি, আপনার মত বুদ্ধি, আপনার মত গায়ের জোর এই কম্বিনেশনের লোক শাদা বাঘের মতই খুব বেয়ার, পাওয়াই শক্ত।" বলতে বলতে রোহিণী চাবিটা নন্দার হাত থেকে নিয়ে দরজায় লক-এ ঢোকাল এখন তুষারের মুখটা কেমন দেখাচ্ছে, তা সে জানে। পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে সে বলল, "আচ্ছা তুষারবাবু, ধন্যবাদ।"

দরজা বন্ধ করে রোহিণীর প্রথমেই সুজাতার মুখটা মনে পড়ল। চোখে ওই রকম কালসিটে টেবলের কোণা লেগে হয় না, মোটা ভারী ধরনের কিছুতে ধাক্কা লাগলে হয়। তা হলে কী! রোহিণী অবাক হয়ে ভাবল, হৃদয়রঞ্জনই কি ওই কালসিটের উদ্ভাবক? কিন্তু কেন? শোভনেশের সঙ্গে সুজাতার ব্যাপার তো কোন্ কালে চুকে বুকে গেছে! এত বছর পরেও কি ঈর্ষা বেঁচে থাকে বা একজনের স্মৃতি কি কেউ লালন করে বাঁচিয়ে রাখে!

রোহিণী পা ধুয়ে, সুভাষ গায়েনের ভাগ্নীর বিয়ের খাবার থেকে মাছগুলো আর দুটো সন্দেশ খেয়ে, লুচি-বেগুনভাজা ঢাকা দিয়ে রেখে দিল গৌরীর মার জন্য। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে জানলাগুলো খুলে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে সে তাকিয়ে রইল। আনমনা হয়ে সে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত তার কাজকর্মের ধারা মনে করার চেষ্টা করল। মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছে, একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে গেছে, পরেরটার জায়গায় আগেরটা এসে পড়ছে। নিজের উপর বিরক্ত হয়ে সে টেবল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেবিলে বসল কাগজ আর কলম নিয়ে।

সকাল দশটায় মীনা চ্যাটার্জি। কাগজের উপরে কথাটা লিখে তলায় লাইন টানল। রোহিণী মনে করতে চেষ্টা করল, তাদের কথাবার্তার মধ্যে তাৎপর্যময় বক্তব্য বা ঘটনা কোন্‌টা, যা শোভনেশের সম্পর্কে অজানা কিছু উদ্ঘাটন করেছে? কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে সে ভাবতে শুরু করল।

মীনা বলেছে, স্বামী আর প্রেমিকদের যে ঠকায়, তাকে অর্থাৎ দিদিকে সে ঘৃণা করে। তাকে সে ক্ষমা করতে রাজী নয়। মানুষের মন নিয়ে যারা ঠকানোর কারবার করে, তারাই আসল খুনী। মীনার কোন দুঃখ নেই বীণা খুন হওয়ায়। তার মতে ছবির ব্যাপারে শোভনেশ ছিল পরিশ্রমী আর সিনসিয়ার।

ভাল কথা। কিন্তু রোজ রাতে শোভনেশের আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা ! মীনা বলেছে, তার দিদির চমৎকার বডি ছিল। দিদিকে হিংসে করত। এখনও বোধহয় করে। তাই রোজ রাতে বীণাকে নিয়ে আঁকা ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে—বোধহয় সে—শোভনেশকেই অভিশাপ দেয়। কেন 'অভিশাপ' শব্দটা হঠাৎ তার মনে এল ? রোহিণী যুক্তি খুঁজতে খুঁজতে ভাবল, হয়তো তাকে মডেল না করে দিদিকে পছন্দ করেছিল বলেই মীনা নিজেকে বঞ্চিতা মনে করে।

হতে পারে। মীনা তো তাকে বললই, আপনার স্কিন, ফ্লেশ, ভলিউম, স্ট্রাকচার, প্রোপোরশন দেখলে শোভনকাকা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কিন্তু মীনার জন্য ঝাঁপায়নি। শোভনেশ বিশেষ গড়নের শরীর পছন্দ করত, যে শরীর ওর নেই। মীনার হিংসা তার বারো বছর বয়স থেকে শুরু হয়, আর কুড়ি বছর ধরে সেটাকে ঘাড়ে নিয়ে আজও সে চলেছে। হয়তো মনে মনে বলে, বীণার বদলে আমাকে যদি বাছতেন, তা হলে আজ এই পরিণতি হত না। হিংসা নয়, রোহিণী মাথা নাড়ল, করুণা। মীনা বোধহয় করুণা দেখাতেই ছবিটার দিকে তাকায়।

মীনা নতুন কী জানাতে পারল শোভনেশ সম্পর্কে ? রোহিণী কলমটা ঠুকতে লাগল কাগজের উপর। কালো কালো বিন্দু ফুটে উঠছে শাদা কাগজে। মীনা বলেছে, সে তার লিমিটেশনস জানে, বুঝতে পারে। শোভনেশকে ভালবাসা জানিয়ে মোলায়েমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বলার সময় তার চোখে জল দেখেছিল সে।

শোভনেশকে যতটা নিষ্ঠুর উন্মাদ বা নারীলোভী মনে হয়, মীনার এই চোখের জল থেকেই রোহিণী বুঝেছিল, ততটা নয় সে। ওটা অভিনেত্রীর অভিনয় ছিল না। মীনা এখনো মনে মনে পুজো করে শোভনেশকে।

কিন্তু বীণার খুনের কারণ মীনা বলতে পারেনি। পরিষ্কারই বলল, "কোন কারণ বার করতে পারিনি।" সত্যি কথা বলল কি ?

কনফিউসড, বিভ্রান্তি, এলোমেলো, গুবলেট, আর কি কি হওয়া সম্ভব ? রোহিণী কলমটা এবার কপালে ঠুকতে লাগল। পর পর খাতায় লিখে কোন কিনারা পাওয়া যাবে না। ছবি জাল করে বিক্রির মতলবটা প্রথম গঙ্গাদার মাথাতেই খেলেছিল ! একথা কি বিশ্বাস করা যায় ? কিন্তু সুভাষ গায়েন আজ সত্যি কথা বলার মত মেজাজেই ছিল। ভাগ্নীর বিয়েতে আচমকা রোহিণীকে দেখে লোকটা যেন হঠাৎই স্নেহপরায়ণ হয়ে হৃদয়ের উপর জমা শ্যাওলা পরিষ্কার করতে শুরু করে দেয়।

মীনা চ্যাটার্জির কাছে কিছু কি আর জানার আছে ? আপাতত নয়। গঙ্গাপ্রসাদ ? অবশ্যই আরও অনেক কিছু।

কিন্তু কি ভাবে সে কথা শুরু করবে ? গঙ্গাদা নিশ্চয় চটবেন তার প্রশ্নে। চটলে তার চাকরি 'নট' করে দিতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে এই ফ্ল্যাটও তাকে ছাড়তে হবে। অবশ্য চাকরি সে জোগাড় করে নিতে পারবে। নিজের সম্পর্কে এই আস্থাটা তার আছে। কোনো পত্রিকায় বা বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে বা প্রাইভেট ফার্মে। কিন্তু বলামাত্রই তো আর চাকরিটা তার ঝুলিতে কেউ ভরে দেবে না, কয়েকটা দিন তো সময় চাই। ততদিন সে থাকবে কোথায় ? হাতে তো জমানো টাকা সামান্যই।

আহহ ! রোহিণী চেয়ারের পিছনে মাথাটা হেলিয়ে সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে রইল। এই এক সমস্যা। এই সময় বাজেন যদি থাকত, তা হলে নিশ্চয় বলত—গো অ্যাহেড, আমি তো আছি। থাকা খাওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বটা আমার। তুমি গঙ্গাদাকে যা প্রশ্ন

করার, করো।

রোহিণী মাথা নাড়ল। রাজেন না ফেরা পর্যন্ত তাকে চুপচাপ থেকে চাকরি করে যেতে হবে। অবশ্য তার মধ্যে যদি—ভাবনাটা থমকে গেল রোহিণীর। সে নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি কবতে লাগল, ভাবনাটাকে আর একটু টেনে নিয়ে গিয়ে এই রকম একটা আশা করবে কিনা—তার মধ্যে যদি শোভনেশ এসে পড়ে!

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সে নিজেকে বলল, আসুক। ও ছাড়া কার কাছ থেকেই বা সত্যি কথাটা জানব?

সকাল থেকে রোহিণী টেবিলে। মীনা চ্যাটার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা লিখে ফেলে আজই প্রশান্তদাকে দিতে হবে। নোটবইটা মাঝেমাঝে দেখতে হচ্ছে মীনার কথাবার্তা উদ্ধৃত করাব জন্য। দেখার পর চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভেবে আবার ঝুঁকে পড়ছে লেখাব জন্য। এইভাবেই চলছে গত দেড় ঘণ্টা ধরে। টেবিলে গ্লাসের দুধে সর পড়ে গেছে, টোস্টগুলো মিইয়ে ভিজে পেস্টবোর্ডের মত। লিখতে লিখতে বাঁহাতে মুখে পুরে দেওয়া দুটো সিদ্ধ ডিম ছাড়া আর কিছু তাব পেটে যায়নি। গৌরীব মা লুচি-বেগুনভাজা কাগজে মুড়ে বেখে কাজ সারতে গেছে উপরে, সুজাতাদেব ফ্ল্যাটে।

চেয়াব থেকে উঠে বোহিণী পায়চাবি শুরু কবল। মীনার সঙ্গে শোভনেশের ব্যাপারটা তাব লেখায় কতটা রাখবে ঠিক বুঝতে পাবছে না। ছোটবেলায় একজন আর্টিস্টের সংস্পর্শে এসে মীনাব মধ্যে একটা টান জেগেছিল শিল্প সম্পর্কে, একটা শিল্পবোধ গড়ে উঠেছিল। লেখাটাতে সে মীনাকে ওই দিক থেকে দেখিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, ভালবেসে প্রেম নিবেদন করে শোভনেশেব কাছে মোলায়েম প্রত্যাখ্যান পাওয়া, আজও তাব স্মৃতি ধবে বাখা, এই সব ডেলিকেট জিনিস তাব লেখাব মধ্যে বাখলে লেখাটা খুলবে ঠিকই, কিন্তু মীনা চ্যাটার্জির পক্ষে অস্বস্তিব এমনকি হয়তো বাগেরও কারণ হয়ে উঠতে পাবে। ভেবি ভেরি প্রাইভেট অ্যাফেয়াব এগুলো। তাছাড়া কমার্শিয়ালিও চোট পেতে পাবে। মীনার যা ইমেজ—দাগ না পড়া, টোল না খাওয়া হৃদয়, বাজপুত্রের জন্য প্রতীক্ষাবতা রাজকন্যে, অনাঘ্রাতা ফুলেব মত শরীব। এইগুলোই পাবলিসিটিতে প্রচ্ছন্নভাবে কাজে লাগানো হয়। "নির্মল, কোমল ত্বকের জন্য" বলে মীনা সাবানের বিজ্ঞাপনে যে হাসিটা দেয়, তা নাকি দেবকন্যাবা ছাড়া আব কাকর পক্ষে সম্ভব নয়। এহেন দেবকন্যা একদা কাউকে হৃদয় দিয়ে ফেলেছিল, এখনো সেই হৃদয় প্রত্যাহার কর্বেনি, তা জানলে ফ্যানেবা আঘাত পাবে, তাদের সংখ্যা কমে যাবে! প্রোডিউসাররা এসবও নাকি কাউন্ট কবে নায়িকা নির্বাচনের সময়।

বোহিণী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসল। ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখটা নামিয়ে, পাশে ফিরিয়ে পাঁচ-ছ' রকম ভাবে হেসে শেষকালে মাকালীর মত জিভ বার করে মনে মনে বলল, "এইটেই হচ্ছে আসল হাসি।"

টেবিলে এসে কাগজগুলো তুলে সে কত শব্দ লেখা হয়েছে, তাব একটা হিসাব কষল। এক হাজার শব্দ তো বটেই এগাবোশোও হয়ে যেতে পাবে। প্রশান্তদা বলেছেন, বারো-তেরোশোর বেশি কিছুতেই নয়। সঙ্গে তিনটে ছবিও যাবে।

দুধের গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে শেষ করল। সাদা গোঁফটা কেমন তৈরি হল দেখার জন্য সে আবার আয়নার সামনে দাঁড়াল। একটা হাল্কা হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। ছোটবেলায় সে আর দিদি কম্পিটিশন করতো দুধের গোঁফ বানাবার। কার গোঁফ

চীনেম্যানের মত হয়েছে, তার বিচার করতে হতো বাবাকে। একবার বাবা বললেন, "সুনুরটা আজ ঠিক মাও সে তুংয়ের মত", অমনি দিদি দুকাঁধ ঝাঁকিয়ে ভাংরা নাচ শুরু করে বলল, "আমি আজ মাও! আমি আজ মাও!" বাবা তারপর সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, "রুনিরটা একদম চিয়াং কাইশেক।" ব্যস, শুনেই দিদির মুখ শুকিয়ে গেল। রাগে দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে সদরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা গিয়ে ওকে বোঝালেন, "আরে বোকা মেয়ে, মাওয়ের কাছে তো যুদ্ধে চিয়াং হেরে গেছে, তাহলে রাগ করছিস কেন?"

রোহিণী জিভ দিয়ে ঠোঁটের উপর থেকে দুধের রেখা সবে চাটতে শুরু করেছে, তখনই বেল বেজে উঠল। গৌরীর মা নিশ্চয়, লুচি-বেগুনভাজা নিতে এসেছে। টোস্ট আর খেতে ইচ্ছে করছে না, ওগুলোও ওকে দিয়ে দেবে ঠিক করে সে দরজা খুলতে গেল।

"আরে, কি ব্যাপার, এসো এসো।" রোহিণী অবিশ্বাস্য বেগে প্রথম কণ্ঠস্বরকে পিছনে ঠেলে দিয়ে তার দু নম্বরি স্বর বার করে আনল।

"আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম না তো?" কুন্তী একগাল হেসে বলল, ভিতরে না ঢুকে।

"একটুও না, একটুও না। বরং এখনই ভীষণ ভাবে চাইছিলাম খুব মিষ্টি মুখের কোন মেয়ে যদি গল্প করতে আসে, তাহলে খুব ভাল হয়। ভেতরে এসো।"

পুলকে উজ্জ্বল চোখ দুটি বার চারেক পিটপিট করে কুন্তী ভিতরে ঢুকল।

"দ্যাখো, অত সাহেবি ফর্ম্যালিটি আমার সঙ্গে করতে হবে না। ডিস্টার্বড হলাম কি না হলাম, তাতে তোমার কি আসে যায় বাপু?" রোহিণী স্নেহভরে নরম ধমক দিল। "দরজা খোলা পেলেই ঢুকে পড়বে। কাজ-টাজের কথা যদি থাকে বলে ফেলবে, তারপর যদি হাতে তোমার সময় থাকে, পরচর্চা শুরু করে দেবে। এটা আমি ভীষণ ভালবাসি, তুমি?"

"আমিও বাসি, তবে খুব বেশি নয়।"

"বেশি নয় মানে! পরচর্চা আবার ডিগ্রি মেপে করা যায় নাকি? করবে যখন, প্রাণ খুলে চুটিয়ে করবে। তোমার কত্তা করে?"

"করে, তবে শুধু অফিস কলিগদের নিয়েই। আচ্ছা, অচেনা লোকদের সম্পর্কে পরচর্চা করে কি সুখ হয়, বলুন? কালকেই ক্লাব থেকে ফিরে এসে বলল, বাণ্টু ঘোষের বৌকে নাকি দেখা গেছে গড়িয়াহাটের এক কাপড়ের দোকানে হাফ প্রাইসে শাড়ি বিক্রি করছে। দু মাস আগে বিয়ে হয়েছে, সত্তর-আশিটা শাড়ি পেয়েছে। অত শাড়ি দিয়ে কি আর হবে, তাই চুপি চুপি দোকানে গিয়ে কথাবার্তা বলে আদ্দেক দামেই নতুন নতুন শাড়িগুলো সেল করে দিয়েছে। আর সেটা দেখে ফেলেছে বাণ্টু ঘোষের অফিসেরই একজন।"

"বাহ্‌হ্‌, এটা তো ভাল সাবজেক্ট!"

"কিন্তু বাণ্টু ঘোষকে আমি চোখেই দেখিনি, তার বৌকে তো নয়ই। ওরা কি রকম কথাবার্তা বলে, কিভাবে থাকে, স্যালারি কত, পার্কস কিরকম পায়, ওদের টেস্ট কেমন, কানেকশনস কেমন, শ্বশুর কি করে, বৌ কোন স্কুলে পড়েছে, সেসব কিছুই জানি না। মজার কথা কি জানেন পণ্টুও তা জানে না।"

"পণ্টু কে?"

"আমার কত্তা, ভাল নাম অলকেন্দু। ম্যাগনানি অ্যান্ড ফ্রেজিয়ারের হরিসাধন দত্ত ক্লাবে এটা গল্প করেছে। আর বাণ্টু ঘোষ থাপার গ্রুপ ছেড়ে সবে জয়েন করেছে ইলেকট্রনিকস ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম মিলকমে। কে বাণ্টু, কে হরিসাধন কাউকেই জানি না, কী পরচর্চা করব বলুন তো?"

কুন্তী ঝরঝর করে হেসে উঠল। রোহিণীর মজা লাগল ওর কথা শুনে। বাস্তব থেকে কিছুটা দূরে, একটু আলাদা জগতে অন্যভাবে মানুষ হওয়া, সরল মেয়ে। সচ্ছলতা থেকে সচ্ছলতায় এসে পড়েছে।

"ঠিকই বলেছ, একদম অপরিচিতদের নিয়ে হয় না। যদি আমার মত প্রতিবেশীও হতো, তাহলেও নয় করতে পারতে।"

"না না রোহিণীদি, আপনাকে—"

"রোহিণী নয় রুনি।"

"হ্যাঁ, রুনিদি আপনাকে নিয়ে আমরা একটুও চর্চা করি না। সত্যি বলছি, মা কালীর দিব্যি।"

মা কালী তাহলে মুখ থেকে বেরিয়েছে! কুন্তী নামটা মহাভারত থেকে, সিঁথেয় সিঁদুরও দিতে হয়। নির্ঘাত মা বা ঠাকুমা কিংবা এখানে যার ফ্ল্যাটে রয়েছে সেই বিধবা মাসিমা রীতিনীতি মানা সম্পর্কে একটু জবরদস্ত প্রাচীনা।

"ঠিক বলছ তো? আমাকে নিয়ে কোন আলোচনা হয় না?" রোহিণী হাসি চেপে বলল। 'সোফিয়া লোরেনের মত হিপ সুইং করে' বলতে পার যখন, আর কিছুও যে বল না, এটা কি বিশ্বাস করতে হবে?

বেল বেজে উঠল। গৌরীর মা।

"কি গো, এত দেরি হচ্ছে দেখে আমি তো ঠিক করেই ফেলেছিলাম, লুচি বেগুনভাজা শেষ পর্যন্ত বোধহয় আমার পেটেই যাবে।"

"খাবে তো খাও না। বাসি নুচি খেতে যা লাগে না দিদি।"

গৌরীর মা চটপট কাগজ খুলে এগিয়ে দিল, কুন্তী উৎসুক চোখে তাকাল। রোহিণী ইতস্তত করে "আচ্ছা তাহলে একটা—" বলেই একটা লুচি আধখানা বেগুনভাজা মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে চোখ বুজে বলল, "গ্রে এ এ ট।"

"খুব দারুন, না?" কুন্তীর ঠোঁট সামান্য খুলে গেল। জুলজুল করে তাকিয়ে।

'নাও না, তুমিও একটা নুচি খেয়ে দ্যাকো।'

কুন্তী চট করে একটা শক্ত মড়মড়ে লুচি তুলে নিয়েই কামড় বসাল।

"বেগুনভাজা নিলে না!" গৌরীর মা ব্যস্ত হল।

"না, শুধুই খাব। সত্যি রুনিদি··উমমম··মনে হচ্ছে কার্ল লিউইসের চাবটে ওলিম্পিক গোল্ড মেডেল চিবিয়ে খাচ্ছি সিলভেস্টার স্ট্যালোনের হিরোইন মনে হচ্ছে, মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে গান গাইছি, আর একটা খাব? কুন্তী প্রায় ভিক্ষা চাওয়ার মত ভঙ্গিতে গৌরীর মাকে বলল।

"খাও না। একটা কেন, অত রয়েছে, দুটো নাও।"

কুন্তী দুটো লুচি তুলে নিয়ে রোহিণীকে বলল, "জানেন, পল্টু আমায় তেল, ঘি, বাটার, সুগারের জিনিস একদম খেতে দেয় না, পার্টিতে সবসময় নজর রাখে আমার প্লেটের দিকে। খালি ক্যালরি আর ক্যালরি শুনে মাথা খারাপ হবার মত অবস্থা। কারণ, মোটা হয়ে যাব। আচ্ছা আমার ওই ফড়িংয়ের মত চেহারা ছেলেদের ভাল লাগবে? আপনার মত ফিগার না হলে—।" কুন্তী থেমে গেল আচমকা। রোহিণী ওর চোখে ক্ষোভ আর হতাশা দেখতে পাচ্ছে, গৌরীর মাও বোধহয়। বিদ্রোহীর মতই কুন্তী কচমচ করে লুচি দুটো খেয়ে নিজেই গ্লাস নিয়ে বেসিনের কল থেকে ঢকঢক করে জল খেল।

রোহিণী ওর কষ্টটা বুঝেছে। মেয়েটা রোগাই। একটু ভরন্ত হলে খারাপ দেখাবে

না। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই সে বলল. "তোমার ফিগার তো খারাপ নয়, স্লিম, ছিপছিপে বেতের মত—"

"থাক্, আপনাকে আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না। আমি যে কী, সেটা আমি ভালই জানি। পল্টু যেসব ম্যাগ কেনে, তাতে শুধু সেক্সি মেয়েদের ছবি। কেন ? আমার ফিগার যদি অ্যাট্রাকটিভই হবে. তাহলে চুরি করে আপনার—" কুন্তী আবার থেমে গেল। রোহিণী গম্ভীর হল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, মীনা তার দিদিকে হিংসে করত এই শরীরের জন্যই।

"গৌরীর মা, আমরা আর খাব না, এবার তুমি ওগুলো নিয়ে যাও।" রোহিণী কথাগুলো বলল ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। গৌরীর মা খুবই চালাক-চতুর এবং গোপ্পে। কুন্তীর কথাগুলো এই বাড়ির অন্যান্য ঝিয়েদেব মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ুক এটা রোহিণী চায় না।

"দিদি, তুমি একবার ওপরে গিয়ে মাসিমাকে দেখে এসো। কাল রাতে পড়ে গিয়ে চোখের যা অবস্থা হয়েছে না ! মেসোমশাই তো সকাল থেকে বসে বসে কাঁদছে।"

রোহিণী অবাক হল। হৃদয়রঞ্জন কাঁদছেন কি অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ? এই বুড়ো বয়সেও এত ভালবাসা ?

"হ্যাঁ যাবখন দেখতে।"

"মাসিমা তোমাকে যেতে বলেছেন।" গৌরীর মা যাবার সময় বলে গেল।

রোহিণী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কুন্তী দুবার কি যেন বলল, সেটা তার মাথায় ঢুকল না। সুজাতা কেন যেতে বলেছেন, তার কারণ বার করার জন্য মাথাটা তার ব্যস্ত।

"রুনিদি, আপনি কী অত ভাবছেন যে, আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না ?"

"ওহ্‌ঃ···হ্যাঁ, বলো. একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাই।"

"আমি লিখতে চাই।"

"কোন ভাষায়, ইংরিজিতে ?"

"না না বাংলাতেই। আপনাদের ম্যাগাজিনে আপনি একটু চান্স করে দেবেন ? এইটে বলতেই এসেছি।"

"বেশ তো, খুব ভাল কথা। কি বিষয় নিয়ে লিখবে ? আগে কি কোথাও লেখা বেরিয়েছে ?"

"কোথাও না। আমি কখনো লিখিইনি জীবনে। কিন্তু ঠিক করেছি এবার লিখব, ছাপাব, আর সবাইকে দেখাব।"

"সবাই মানে তো, কত্তা ?"

"হ্যাঁ, পল্টুকে তো দেখাবই। ও ভীষণ জেলাস টাইপের, আমি লিখে ফেমাস হয়ে গেলে হিংসেয় মরে যাবে।"

"ভাল কথা। তা কি নিয়ে লিখবে ?"

"সেটা আপনি বলে দিন।"

"ওম্মা, আমি বলে দেব, তারপর তুমি লিখবে। তাই কখনো হয় ?"

"হয়। আমি অনেক রকম জিনিস পড়ি, ভাবি, মনেও রাখি। যেমন সিনেমা, রক মিউজিক, স্পোর্টস, গোস্ট স্টোরিজ, ক্রাইম ডিটেকশন, ফিজিক্যাল ফিটনেস, ডেকরেশনস, গার্ডেনিং, আর ধরুন—"

"ধরেছি। ক্রাইম ডিটেকশন পারবে ? তাহলে তোমাকে একটা খুনের গল্প বলব, সেটা

সল্‌ভ করার চেষ্টা করতে পার।"

"সল্‌ভ করলে ছাপাবেন ?"

"আমি ছাপাবার মালিক নাকি ? তবে তোমার হয়ে সম্পাদককে যে খুবই ধরাধরি করব, এই কথাটা দিতে পারি।"

"বেশ, বলুন কিরকম খুন ? সত্যি তো ?"

"একদম সত্যি। কিন্তু ভাই এখন তো সময় নেই হাতে, একটা লেখা এখুনি শেষ করতে হবে। তুমি বরং এক কাজ করো, যে ম্যাগাজিনটা সেদিন তোমাদের কাছ থেকে এনেছিলাম, সেটায় সিধারথ সিনহা নামে একজনের একটা আর্টিকেল—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়েছি। কি যেন নামটা, দ্য আর্টিস্টস হু ওয়্যার কনজিউমড .এই ধরনের একটা বিরাট নাম। পড়েছি, পড়েছি। একটা ন্যুড ছবি আছে, যে জন্য পল্টু ওটা কিনেছিল।"

"কারেক্ট। আগে ওটা পড়ে ফ্যালো। শোভনেশ সেনগুপ্ত নামে একজনের কথা ওতে আছে, সেটা খুঁটিয়ে মন দিয়ে পড়ে তারপর এসো, তখন বলব কি কি ব্যাপার ডিটেক্ট করতে হবে, কেমন ?"

কুন্তী ভীষণ খুশি হয়ে উঠল। সময় কাটাবার জন্য কাজের মত একটা কাজই শুধু পাওয়া নয়, লেখার সঙ্গে তার নামটাও বেরোবে। তার মানে পরিচিতি আর খ্যাতিও।

"আপনি এখন ব্যস্ত, তার মানে ডিস্টার্ব করছি। এখন তাহলে আসি। কালকেই আপনাকে বলব কিভাবে, কি কারণে মার্ডার হয়েছে, আর কে করেছে।" দরজা খোলার জন্য গোলাকার নবটায় হাত রেখে কুন্তি অবশেষে বলেই ফেলল, "আপনি বাড়িতে ব্রা পরেন'না কেন ?"

"বাইরেও তো অনেক সময় না পরেই বেরোই।"

"কেন ? উইমেনস লিব সাপোর্ট করেন বলে ? অবশ্য ব্রা না পরলেও আপনার চলে।"

"মোটেই না। পুরুষদের মাঝে মাঝে একটু জ্বালাতন করার ইচ্ছে হলে পরি না।" বলেই রোহিণী জোরে হেসে উঠে তারপর বলল, "তোমার আবার পুরুষদের মত এই সব দিকে নজর কেন ?"

"আমি অত এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না পল্টু বলে, আমি শুনি।"

তার মানে কথা হয়েছে। রোহিণী মনে মনে বলল, সোফিয়া লরেন তো হয়েছি, তারপর কি লোলোব্রিজিদা, মনরো না অ্যানিটা একবার্গ ? কিন্তু এদের জেনারেশন মনরো বা একবার্গকে কি দেখেছে ? এখন বিগ গার্লসদের যুগ তো আর নেই।

"শ্রীমান পল্টু যা বলে, শুনে যেও। আর আমি যা বলছি সেটাও শুনে নাও, এখন দৌড়ে গিয়ে ম্যাগাজিনটা পড়তে শুরু করো আর কাল কি পরশু আমাকে বলে যেও ওর মধ্যে থেকে কি কি মিস্ট্রি তুমি খুঁজে পেয়েছ। তারপর তোমাকে কয়েকটা ক্লু দেব। এখন কেটে পড়ো, আমার লেখা শেষ করতে হবে।"

দরজা বন্ধ করে রোহিণী একবার ভাবল, উপরে গিয়ে সুজাতাকে দেখে আসবে কি না। কিন্তু লেখাটা আগে শেষ করে ফেলা দরকার। রাতে গিয়ে দেখে এলেও, মারা তো আর যাচ্ছেন না।

একঘণ্টার মধ্যেই রোহিণী লেখা শেষ করে ফেলল। মীনার সঙ্গে শোভনেশ প্রসঙ্গ নিয়ে সে গভীরে যাবার কোনো চেষ্টাই করল না। টাইপ করা বায়োডাটা থেকে কিছু কিছু

খবর তুলে সে মোটামুটি বোঝাবার চেষ্টা করল, এমন শিক্ষিতা মেধাবী, সুরুচিসম্পন্না ও সুরসিকা অভিনেত্রী বাংলায় কখনো জন্মায়নি। লেখাটা ভাঁজ করে ঝুলিতে রাখতে গিয়ে, কি ভেবে সে ভাঁজ খুলে তলার দিকে এক জায়গায় লিখল—বোধহয় জন্মাবেও না। রোহিণী জানে, প্রশান্তদা কথাটা কেটে দেবেনই।

অফিসে লিফট থেকে বেরোতেই সে কমলের মুখোমুখি হল। রোহিণী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, ছেলে এখন কেমন আছে ? কিন্তু তার আগেই কমল বলল, "দুবার আপনার খোঁজ করেছেন। গিয়ে এখুনি দেখা করুন।"

"কে গঙ্গাদা ?"

"হ্যাঁ।"

লেখাটা প্রশান্ত হালদারের টেবিলে রেখে দিয়েই রোহিণী কামরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভাবল, দুবার খোঁজ করা কেন ? শোভনেশ সম্পর্কে কিছু কি জানতে পেরেছেন ?
গঙ্গাপ্রসাদ প্লাস পাওয়ারের চশমা পরে টেবলে ঝুঁকে টাইপ করা কাগজ পড়ছিলেন। চশমাটা নাকের ডগার কাছে নামানো। ফ্রেমের উপর দিয়ে তিনি তাকিয়ে বললেন, "বোসো, এক মিনিট।"

এক মিনিট ফুবোবার আগেই পড়া বন্ধ করে তিনি বললেন, "টিভি র জন্য একটা বিভাগ কবব বলেছিলাম, মনে আছে তো ?"

রোহিণী মাথা নাড়ল।

"তোমাকে একটা সেট কিনে দেব বলেছিলাম। কয়েক দিনেব মধ্যেই ওটা পৌঁছে দিয়ে আসবে, অ্যান্টেনাও লাগিয়ে দেবে। কখন লোক গেলে তোমার সুবিধে হবে, সেটা প্রশান্তবাবুকে বলে দিও।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ ড্রয়ার খুলে রুমাল বার করে মুখ ঘাড় গলা মুছলেন। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজলেন। একটা লবঙ্গ বেরোল। সেটা মুখে পুবে গলা খাঁকারি দিয়ে অবশেষে রোহিণীর মুখের দিকে তাকালেন।

"টিভি-র কথা বলার জন্য তোমাকে ডাকিনি।"

রোহিণী সেটা অনেকক্ষণ আগেই অনুমান করে নিয়েছে। গুরুতর কিছু বলার আগে গঙ্গাপ্রসাদ নিজেকে স্টেডি করার জন্য অযথা ব্যতিব্যস্ত হন।

"শোভু ফোন করেছিল কাল রাতে। আমি তখন খেতে বসেছি। বুঝতে পাবলাম না কোথা থেকে করছে, মনে হল কাছাকাছি রয়েছে। কয়েকটা কথা বলল, যা তোমাকে জানানো দরকার।"

রোহিণীর পিঠ শক্ত হয়ে উঠল। বগলের কাছে সিরসির করছে। ঘাড়ে রোঁয়া উঠল। তাহলে শেষ পর্যন্ত—। নাহ্‌ সে ভয় পাচ্ছে না, পাবার মত কিছুই তো বাকি নেই। এই ক'টা দিন ভয় পেতে পেতে সে ভয় পাওয়াটাতেই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। সে তো এখন চাইছেই, জট পাকানো সত্যি-মিথ্যেগুলো ছড়িয়ে দেবার জন্য শোভনেশ ফিরে আসুক।

গঙ্গাপ্রসাদ স্থির চোখে তাকিয়ে রোহিণীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছেন। কিন্তু রোহিণীরও স্থির সিদ্ধান্ত, কোনরকম ভাব যেন মুখে ফুটে না ওঠে। মিনিট খানেকের একটা সংঘর্ষ নীরবে ঘটে গেল টেবিলের দুধার থেকে। রোহিণী আগ্রহ দেখাল না শোভনেশের বলা কথাগুলো শোনার জন্য। ভ্রূ কুঁচকে উঠল গঙ্গাপ্রসাদের।

"প্রথমে ভাবলাম কেউ রসিকতা করছে, যখন 'হ্যালো' বলতেই শুনলাম, 'কে গঙ্গা

নাকি, আমি শোভু বলছি।' শুনেই তো পাথর হয়ে গেলাম। গলা দিয়ে স্বর আর বেরোয় না। কোনক্রমে বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু শোভু কে ?' বলল, 'এর মধ্যে ভুলে গেলি ? ছ'টা বছর তো মাত্র ! আমি জেল থেকে পালিয়েছি গঙ্গা, কাগজে কি সে খবর বেরিয়েছে ? আমি মিথ্যে করেই বললাম, 'কই চোখে পড়েনি তো ! শোভু মানে শোভনেশ সেনগুপ্ত কি ?' বলল, 'এতক্ষণে সেটা বুঝতে পারলি ! শোন্, আমি তোর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু পুলিশ নিশ্চয় আমার চেনাজানাদের ওপর নজর রাখবে। বৌবাজারে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে কোথায় দেখা হতে পারে ?' আমি বললাম, 'দেখা করার দরকারটা কি ?' ও বলল, 'অনেক দরকার। আমার ছবিগুলো নিয়ে কথা বলব। প্রচুর জাল ছবি আমি দেখেই গেছিলাম, বাজারে তখনই বেরিয়ে গেছিল। মানুষ হিসেবে সমাজে আমার জায়গা হয়তো হবে অনেক নিচেই, কিন্তু শিল্পী হিসেবে এদেশে আমি প্রথম পাঁচ সাত জনের মধ্যে তো পড়বই ! আমাব রেপুটেশন অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট ধ্বংস হচ্ছে এই সব জাল ছবির জন্য। এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এই জন্যই দেখা করতে চাই। এই জন্যই আমি পালিয়েছি।' আমি বললাম, 'তুই কোথায় আছিস বল, আমি গিয়ে দেখা করব।' ও এড়িয়ে গেল, আমার প্রস্তাব। হঠাৎই বলল, 'রোহিণী কোথায় আছে জানিস ?' কথাটা শুনেই আমি কিরকম ঘাবড়ে গেলাম।"

গঙ্গাপ্রসাদ থেমে গিয়ে নাটকীয় নীরবতা তৈরি করলেন। টানটান হয়ে উঠল রোহিণীর ঔৎসুক্য। কেন জানি তার মনে হল, গঙ্গাদা তাকে দূরবীন দিয়ে দেখছেন, কি কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কথাগুলো শুনে। তাই সে প্রাণপণে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে পায়ের উপব পা তুলে, উরুর উপর শাড়ির পাট ঠিক করতে করতে বলল, "হুঁ, তারপর ?"

"কোথায় আছ, সেটা বলব কি বলব না ভাবতে-ভাবতে বলেই ফেললাম, 'রোহিণী কলকাতাতেই আছে, এক জায়গায় চাকরি কবছে।' শুনেই ওর মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল। অনেকটা যেন থুথু ফেলার মত। বলল, 'ঠিকানাটা কি জানিস, একবার ওকে দেখব।' মনে হল, থ্রেটনিং টোন যেন গলায় পেলাম। বললাম, 'ঠিকানা জানি না।' ও বলল, 'আর বেশিক্ষণ কথা বলা সম্ভব নয়, তোকে আমি আবার ফোন করব। এই বলে রেখে দিল।"

"এবার ফোন করলে বলবেন, 'রোহিণী তোর সঙ্গে কথা বলার জন্য দেখা করতে চায়।"

গঙ্গাপ্রসাদের চোখে পলকের জন্য বিভ্রান্তি ফুটে উঠেছিল, যা রোহিণীর নজর এড়াল না।

"তুমি দেখা করবে ! কেন ? ওর মানসিক অবস্থা এখন কেমন, তা তুমি জান না। আমিও নয়। তোমার সম্পর্কে ওর মনোভাব যা দেখেছিলাম তাতে— ।"

"অর্থাৎ এই মার্ডারের জন্য আমিই দায়ী। আমিই সিটিং দিতে রাজি না হওয়ায় শোভনেশ ক্ষেপে উঠে বীণার কাছে ছুটে যায়। যদি না যেত, তাহলে মার্ডারটাও আর হত না।"

কথাটা বলেই রোহিণী ঠিক করে ফেলল, আর নয় ! এবার নখ দাঁত বার করে অন্য মূর্তি ধরতে হবে। গঙ্গাপ্রসাদের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটছে দেখেও সে ঘাবড়াল না।

"কাল তুমি কার্জন পার্কে বসেছিলে ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু একা নই। উৎপল কি সেটা বলেনি ?"

"বলেছে। সিদ্ধার্থ সিংহিকে অনেক কথাই বলেছিলাম, সব এখন মনে নেই। তবে যা

যা বলেছি, তা ঠিকই। তোমার শরীর শোভুকে পাগল করেছিল। তোমাদের বিয়ে আমার ঘটকালিতেই হয়েছে। আমিই ওকে বুদ্ধিটা দিই, এমনি ন্যুড হতে বললে রাজী হবে না, কিন্তু স্বামীর কাছে আপত্তি করবে না। তুই মেয়েটাকে বিয়ে করে স্বামী হয়ে যা। কিন্তু আমি ভুল বলেছিলাম বা বুঝেছিলাম। এই মার্ডারের পিছনে আমিও তো অনেকটা দায়ী। বিয়েটা না ঘটালে এসব কিছুই হত না।"

গঙ্গাপ্রসাদের মৃদু শান্ত গলা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল। টেবিলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। চিবুকের নিচে চর্বির ভাঁজ ফেলে মুখটা নিচু করা।

"কিন্তু আমার তো মনে হয়, ছবি জাল করা নিয়েই এই খুন ঘটেছে। সিদ্ধার্থকে আপনি যা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে, বীণার স্বামী ব্ল্যাকমেইল করে ছবি আঁকিয়ে নিত।"

"কারেক্ট। শোভু নিজে আমায় বলেছে।"

" তখন মাঝে মাঝে ওর পাগলামি দেখা দিত।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমাকে সেদিনই আপনি বলেছেন, ওদের বংশে কেউ কখনো পাগল হয়নি। সুজাতা গুপ্ত সম্পর্কে বললেন, শী ইজ এ লায়ার, বললেন সুজাতার থেকেই এই মার্ডারের সূত্রপাত। আবার সিদ্ধার্থকে বলেছেন আমিই মার্ডারের জন্য দায়ী, এখন আবার বলছেন, আপনি নিজেও অনেকটা দায়ী। গঙ্গাদা, আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে। এত লোক দায়ী করলে তো শোভনেশকে আর মার্ডারার ভাবাই যায় না।"

"একদিক থেকে দেখলে তাই। সব কাজের পিছনেই কিছু কারণ থাকে। সুজাতা, তুমি, আমি—আরও কেউ কেউ হয়তো এই সব কারণ জুগিয়ে গেছি।"

"আরও কেউ কেউ মানে? ছবি জাল করার ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের কথা বলছেন কি?"

"হ্যাঁ। সিদ্ধার্থ সিংহি নিশ্চয় নামটা তোমায় বলেছে।"

"বলেছে। আমি তার সঙ্গে কথাও বলেছি।"

রোহিণীর চোখ ছুরির ফলার মত ধারালো হল। গঙ্গাপ্রসাদ অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন রোহিণী এবার কি বলবে।

"কি বলল সুভাষ গায়েন? আমি তার কাছে গেছিলাম ছবি জাল করার ব্যবসা খুলব বলে?"

রোহিণীর হঠাৎ নিজেকে নিরস্ত্র, অসহায় মনে হল। তার মুখের কথা গঙ্গাদার মুখ থেকেই বেরিয়ে আসবে, এটা সে ভাবতে পারছে না। সবই উনি জানেন তাহলে।

"কি ঠিক বলেছি?" গঙ্গাপ্রসাদ চোখ পিট পিট করলেন।

"হ্যাঁ। অস্ফুটে রোহিণী বলল।

"গায়েনও ঠিক বলেছে। হ্যাঁ, আমি গেছিলাম ওর কাছে। এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল, আর সেটা হল শোভুকে ভয় দেখিয়ে ও যেসব ছবি আঁকিয়ে নিচ্ছিল, তা বন্ধ করা। গায়েনের অভিধানে শুধু একটাই শব্দ আছে—টাকা। ওকে যদি টাকা কামাবার অন্য একটা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি, তা হলে হয়তো শোভুকে রেহাই দেবে। এই ভেবেই জাল করার পথটা ওকে চিনিয়ে দিয়ে আসি।"

"তার আগেই আপনি শোভনেশকে কলকাতা থেকে সরিয়ে বাসুদেবপুরে নিয়ে গেছিলেন। সেখানে সে মোটেই গ্রামজীবন আর প্রকৃতি নিয়ে ছবি আঁকেনি। সেখানে

উন্মাদের মত শুধু লাল আর কালো রঙ দিয়ে একটা মেয়েকে খুনের বীভৎস ছবি আঁকত। খুন করত সে বীণাকে। সুভাষ গায়েন সেখানে গেছিল, তাকেও শোভনেশ খুন করবে বলেছিল। গঙ্গাদা, আপনি আমাকে বলেছিলেন, ওদের নাকি পাগলের বংশ নয়। মিথ্যা কথা বলেছিলেন। ওদের প্রত্যেক জেনারেশনে একজন করে পাগল হয়েছে। এই জেনারেশনে সেটা শোভনেশ। ন্যুড সিটিং দিতে চাইনি বলে ও আমার গলা টিপে ধরেছিল, যা কোন প্রকৃতিস্থ লোক করবে না। আমার মনে হয়েছিল, আই রিয়্যালি ফেল্ট যে, আমাকে ও সেদিন মেরেই ফেলত যদি না—যদি না তখন পরমেশ এসে পড়ত।"

এক নিঃশ্বাসেই প্রায় জেট বিমানের টেক অফের মত রোহিণী তার ফুসফুসে চাপ দিয়ে মুখ থেকে কথা বার করাল। মুখে রক্ত ছুটে এসেছে। বুক ওঠানামা করছে।

'পরমেশ ? ওখানে ?" গঙ্গাপ্রসাদকে ঝুঁকিয়ে দিল তার বিস্ময়। "সে তো পাশের বাড়িতে থাকে। অবশ্য ছাদ দিয়ে আসতে পারে, যদি সিঁড়ির দরজা খোলা থাকে।"

"হ্যাঁ তাই এসেছিল। পরমেশের একটা বদ অভ্যাস ছিল। শোভনেশ যখন বীণাকে ন্যুড করিয়ে পোজ দেওয়াত, তখন পরমেশ চুপি চুপি এসে জানলার পাখি তুলে দেখত। আমার সম্পর্কেও এই রকম পারভারশন ওর ছিল। সেদিনও সে নিজেদের বাড়ির জানলা দিয়ে আমাকে স্টুডিয়োর ডিভানে বসে থাকতে দেখে ভেবে নেয় এবার বোধহয় আমি ন্যুড হব, তাই সে তাড়াতাড়ি ছাদ দিয়ে চলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে অন্য ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি ছুটে তিন তলার ঘরে চলে এসেছি। পিছু পিছু শোভনেশও তাড়া করে আসছিল। কিন্তু সিঁড়িতেই তার সঙ্গে পরমেশের দেখা হয়ে যায়। সেটা পরে আমি ঝিয়ের মুখ থেকে শুনি।"

"কি শোন ?" গঙ্গাপ্রসাদ কৌতূহল চাপতে পারলেন না। তাঁর মুখ ঈষৎ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। জল খাওয়া খালি গ্লাসটার দিকে একবার তাকালেন।

"পরমেশ বলল, 'কি রে, পেটে বাচ্চা এসেছে নাকি ? প্রথমটাকে তো নির্ঝঞ্ঝাটে পার করা গেছে, এটাকে কি অত সহজে পারবি ?' এই বলেই সে ছাদে উঠে যায়। শোভনেশ চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর নিচে নেমে আসে। ...গঙ্গাদা আমাকে আপনি বলেছেন, শোভনেশের প্রথম বৌ প্রেগনান্ট কমলা বাথরুমে পিছলে পড়ে মারা যায়। কিন্তু তা নয়। পরমেশের ওই 'পার করা গেছে'-র সাপোর্ট আমি সুজাতা গুপ্তর কাছেও পেয়েছি। সেও মার্ডারিড হয়েছে। আর একটা মিথ্যে কথা।"

রোহিণীর জ্বলজ্বলে উত্তেজিত চোখ থেকে গঙ্গাপ্রসাদ নিজের চোখ সরিয়ে নিলেন। বিড়বিড় করে কি যেন বললেনও। রোহিণীর মনে হল,সে বোধহয় ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছে। এটা আর একটু দেওয়া দরকার।

"সুভাষ গায়েনকে মার্ডার করার চেষ্টা হয়েছিল ? আর সেটা হয় আপনার জালিয়াতি ব্যবসার প্রোপোজাল রিফিউজ করার পরই।"

"হোয়াট ডু ইউ মীন ?" গঙ্গাপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন তাঁর ওজনের পক্ষে অবিশ্বাস্য গতিতে। কী ইঙ্গিত করছ তুমি ? আমি খুন করার চেষ্টা করেছি ? তোমার সাহস সীমা ছাড়িয়ে গেছে দেখছি। আমাকে তুমি খুনী বানাতে চাও ?"

"আমি নয়, সুভাষ গায়েনই এই রকম মনে করে। আর মীনা চ্যাটার্জি মনে করে, শোভনেশের অরিজিন্যাল বহু ছবি কোথাও লুকোনো আছে, এখন একটা-দুটো করে বিক্রির জন্য বাজারে আসছে, দশ-পনেরো হাজার দাম ছিল তিন বছর আগে, এখন আরো বেশি। কেউ একজন মনে হয়, ছবি বিক্রি করে লাভ করছে।"

রোহিণী দেখল গঙ্গাপ্রসাদ রাগে থরথর করে কাঁপছেন। কথা বলার চেষ্টা করেও কিছু আওয়াজ ছাড়া বোধগম্য কোন শব্দ মুখ থেকে বার করতে পারছেন না। রোহিণী অপেক্ষায় রইল ওঁর ব্লাডপ্রেশার নেমে আসার জন্য।

"আর কি তুমি বলবে আমার সম্পর্কে ?" গঙ্গাপ্রসাদ অবশেষে আস্ত একটা বাক্য বলার মত অবস্থায় ফিরে এলেন। ধীরে ধীরে আবার চেয়ারে বসলেন।

"দিগম্বর বর্ধন লেনের বাড়িটা বিক্রি হয় মামলা চলার সময়ই...না, টাকার কথা তুলব না। বাড়িটা কে কিনল শুধু সেটাই জানতে চাই, আর কত দামে অমন পজিশনের বাড়িটা বিক্রি হল ?"

"তুমি তো অনেক খবরই জোগাড় করেছ, এটাও করে নিও। শোভনেশ জানে কে কিনেছে, কত দামে কিনেছে।"

"আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কিভাবে করবে ?"

"আপনাকে ফোন করবে আবার। ওকে আমার ঠিকানা দিয়ে বলুন দেখা করতে।"

"ও তোমাকে বিশ্বাস করে না। তুমি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পার।"

"না, দেব না। আর যদি তাই মনে করে, তাহলে ফোনেই যোগাযোগ করুক। আমার উপর তলায় ফোন আছে, নম্বরটাও আপনি জানেন। থ্রি সেভেন টু ফাইভ...আচ্ছা, নয় আবার লিখেই দিচ্ছি।"

"থাক, নম্বর আমার কাছে আছে। কিন্তু এটা তোমার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। আমি চাই না, শোভু আবার একটা মার্ডারের আসামি হোক।"

"হবে না। বীণা আর আমি এক জিনিস নই।" বলার সঙ্গে রোহিণীব হাত আর মুঠি আপনা থেকেই শক্ত হয়ে গেল।

"ব্রাভাডো দেখবার চেষ্টা করো না রোহিণী, যেমন জীবন চলছে তেমনিভাবেই চালাও। চাকরি করছ, প্রেম করছ, হয়তো বিয়েও করবে। এই সবই করো, কেন একটা বাসি জিনিস ঘেঁটে ঝামেলায় জড়াবে ! তুমি বুদ্ধিমতী, সুতরাং বুঝতেই পারছ শেষ পর্যন্ত কোন লাভ তোমার হবে না, ক্ষতি ছাড়া।"

"লাভ-লোকসান না খতিয়েই তো জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে এলাম। আমি মনে করি না, তাতে ঠকেছি। লোকসানকেও আমি কাজে লাগিয়ে লাভে পরিণত করে নিয়েছি।"

বলতে বলতে রোহিণী উঠে দাঁড়াল। ঝোলাটা কাঁধে গুছিয়ে, হাঁটু দিয়ে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে সে আবার বলল, "বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, আমার পক্ষে আপনার কাছে কাজ করা আর সম্ভব নয়, উচিতও নয়। দুটো লেখার কাজ হাতে রয়েছে, ও দুটো শেষ করে আর আমি এখানে আসব না, আপনার ফ্ল্যাটও ছেড়ে দেব, কিন্তু যতক্ষণ না শোভনেশের সঙ্গে কথা বলছি, ফ্ল্যাট থেকে ততক্ষণ নড়ব না।"।

রোহিণী দরজার কাছে পৌঁছেছে, তখন গঙ্গাপ্রসাদ ডাকলেন।

"কাজ তুমি ছেড়ো না, আমারও তো কাজের লোক দরকার। তবে তুমি বিপদে পড়বে, এইটুকু শুধু বলে দিলাম, মারাত্মক বিপদে পড়বে।"

রোহিণী জবাব দিল না। একটা অদ্ভুত হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। গঙ্গাপ্রসাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার মনে হল, এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে দুজনের জন্য। শোভনেশের আর রাজেনের জন্য।

অফিসে কারুর সঙ্গে কথা না বলে রোহিণী তিন তলা থেকে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এখন সে কী করবে? ঘড়ি দেখল। বিবাদী বাগের দিকে মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে সময় কাটাবার উপায় খুঁজতে লাগল। সিনেমায় যেতে পারে, কিন্তু ম্যাটিনি শোয়ে ছবি দেখার বয়স আর নেই। কারুর বাড়ি? দুপুরে ছোটলোকরাই গল্প করতে লোকের বাড়ি যায়, তাছাড়া কার বাড়িতেই বা সে যাবে? এখন জাদুঘরে কি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কি চিড়িয়াখানাই হচ্ছে সময় কাটানর ভাল জায়গা। কিন্তু তার যাবার ইচ্ছে হল না।

মিনিবাস স্ট্যান্ডে দুটো সল্টলেকের বাস দাঁড়িয়ে। সে ফ্ল্যাটে ফিরে যাবার কথা ভাবল। অনেক দিন দুপুরে ঘুমোয়নি, আজ বরং ঘুমোবে। এই স্থির করে সে প্রথম বাসটায় উঠে একমাত্র খালি সিটটায় বসল, যেটায় জানালা পাওয়া যায়। খালি থাকার কারণ, পিছনের চাকার ঢাকাটা একটা চৌকো বাক্সর মত উঁচু হয়ে আছে পা রাখার জায়গাটায়। বসলে হাঁটু দুটো প্রায় বুকের কাছে এসে যায়। এই রকম বাসও কলকাতা মেনে নিয়েছে, পয়সা দিয়েও মুখ বুজে অস্বাচ্ছন্দ্য সংগ্রহ করে। কী সহ্যশক্তি এই শহরটার! রোহিণী ভাবল, নাকি সিদ্ধার্থ যা বলেছিল সেটাই ঠিক, গোটা কলকাতাটাই ঝিমোচ্ছে! ভাল কথা, সিদ্ধার্থের সঙ্গে এখন একবার তো দেখা করা যায়!

কিন্তু কি জন্য? রোহিণী ভাবতে শুরু করল। দেখা করে কি-ই বা আর সে জানবে? সেই তো একঘেয়ে কয়েকটা কথা। আর তার ভাল লাগছে না এই শোভনেশ আর শোভনেশ। বরং ও সশরীরে আসুক বা ফোনেই কথা বলুক। ওকে সে বলবে, খুন একটা করে ফেলেছ, ভালই করেছ, বেশ করেছ। প্রতিদিন কাগজ খুললেই গণ্ডা গণ্ডা খুন আর আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায়। এসব এখন জলভাত হয়ে গেছে। সুতরাং শোভনেশকে সে বলেই দেবে, তোমাকে নিয়ে কেউ মাথাব্যথা করছে না, পুলিশও বোধহয় করছে না। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। জেল ভেঙ্গে পালিয়েছ, ভাল কাজই করেছ। এখন নিজেই নিজেকে সামলাও, আমি কোন সাহায্য টাহায্য করতে পারব না। মীনার ঠিকানা দিচ্ছি, সেখানে চলে যাও। সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওখানে তোমার চেনা আর একটা লোককেও পাবে। যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে সুভাষ গায়েনের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দিয়ে বরং বলতে পার—তুই ব্যাটা আমাকে দিয়ে আজেবাজে ছবি আঁকাতিস, সেজন্য আমি নষ্ট হয়ে গেছি। অবশ্য পয়সা পেতাম ঠিকই, কিন্তু তোর বৌকে সিটিং দেবার জন্য আর তুই পাঠাতে রাজি হলি না কেন রে? জানিস না, ওকে আমি ভালবাসতাম?

অবশেষে বাসটা ছাড়ল। লালদিঘি চক্কর দিয়ে লালবাজার পর্যন্ত পৌঁছতে এটা এবার যে সময় নেবে, তার মধ্যে একটা ট্র্যাফিক জ্যাম বা একটা লোডশেডিং ভরে দেওয়া যাবে! রোহিণীর কাঁধে রোদ লাগছে। আজ একটা সিরসিরে শুকনো বাতাস বইছে। রোদটা তাই জ্বালাচ্ছে না। শূন্য দৃষ্টিতে সে জি.পি.ও., রাইটার্স বিল্ডিংস, চার্চ, কলকাতা পুলিশের সদর ইত্যাদিতে চোখই শুধু রাখল, দেখল না কিছুই। ইতোমধ্যে সে আবার নিজের ভাবনায় ডুবে গেছে।

এইটুকু শুধু বলে দিলাম, মারাত্মক বিপদে পড়বে—কথাটা বলে গঙ্গাদা কি মিন করতে চাইলেন? দৈহিক বিপদ ছাড়া তার আর কি বিপদ ঘটা সম্ভব! দৈহিক মানে, খুন! মার্ডার! মৃত্যু! কিভাবে তাকে খুন করতে পারে? তার থেকেও বড় কথা—খুন কে করবে, এবং কেন করবে?

গঙ্গাদা ? শোভনেশ ? কিংবা ধরা যাক, সুভাষ গায়েন ? এছাড়া আর কোন নাম তো তার মনে আসছে না। 'আমি চাই না, শোভু আর একটা মার্ডারের আসামি হোক,' অর্থাৎ গঙ্গাদার ধারণায় শোভনেশই কাজটা করবে। উনি তা আগাম জানলেন কি করে ? সুভাষ গায়েনকে বিষ খাইয়ে বা গাড়ি চাপা দিয়ে খুনের চেষ্টা তো অন্য কেউ করেছিল, শোভনেশ নয় !

রোহিণী একটু ফাঁপরেই পড়ল। এইভাবে খুন একা করা সম্ভব নয়, লোক লাগিয়ে করতে হয়। সেজন্য টাকাকড়ির দরকার, পেশাদার খুনীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা দরকার। শোভনেশের পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। সে হুট করে রাগের মাথায় কিছু একটা করে ফেলতে পারে কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় প্লট ভেঁজে কিছু করা অসম্ভব। তাহলে গঙ্গাদাই কি— !

"রাম মন্দির, গিরিশ পারক, মানিকতলা, কাঁকুড়গাছি..." কণ্ডাক্টরের হেল্পার এমন চিৎকার করে উঠল যে, রোহিণীর ভাবনাটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। সে দেখল, বৌবাজার-চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর মোড়ে বাস থেমে রয়েছে। রাস্তার ওপরে পাতাল রেলের কাজ চলছে। বিরাট একটা ডাম্পার আঁজলা ভরে রাবিশ তুলে লরিতে ফেলছে, আর তাই দেখতে ছোটখাট ভিড় জমে গেছে। রোহিণীও দেখতে লাগল। এই সময়ই চোখে পড়ল কুন্তীকে। হেঁটে চলেছে পুবদিকে ট্রাম রাস্তা ধরে।

কুন্তী এখানে ! এখন ! কোথায় চলেছে ? ওদিকে তো বৌবাজার কলেজ স্ট্রিট মোড, তারপরই দুধারে গহনার দোকান। টাকা জমিয়ে টুকটাক গহনা কেনার অভ্যাস হয়তো আছে। নেমে গিয়ে ওর সঙ্গী হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই বাস ছেড়ে দিল।

যাক গে, রোহিণী ভাবল, সিদ্ধার্থর লেখাটা পড়ে মিস্ট্রি বার করার মত ধৈর্য ওর নেই, মাথাও নেই। কিছুটা প্যাঁচালো বুদ্ধি না থাকলে ক্রাইম ডিটেক্ট করা সম্ভব নয়। মেয়েটা খুবই সরল, তাইই থাকুক বরং। স্বামী অফিসে গেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে টো টো কোম্পানি করে আবার বিকেলের মধ্যে ঘরে ফিরে যদি জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনতে পারে, তো আনুক।

রোহিণী ভার চিন্তা সরিয়ে নিল কুন্তির থেকে নিজের উপর। তাহলে গঙ্গাদাই কি টাকাকড়ি খরচ করে সুভাষ গায়েনকে মারার চেষ্টা করেছেন ? সন্দেহটা প্রকাশ করে সে কি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনল ? তাই নয়, ছবি জাল করার কথাও কি তোলা উচিত হয়েছে ? এতেও গঙ্গাদাকে খুব বিচলিত দেখাল, তার মানে জড়িত। খুনের থেকেও এটা তো কম অপরাধের কাজ নয়। শোভনেশের ছবি বাজারে আসছে কার কাছ থেকে ? নিশ্চয় গঙ্গাদার কাছে প্রচুর ছবি লুকোনো আছে। সে নিজেও তো দিগম্বর বর্ধন লেনের বাড়িতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা ছবি স্তূপ করে রাখা দেখেছিল। গঙ্গাদা বলেছেন, ওগুলো পোকায় কেটে, বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে গেছে ! সব বাজে কথা। বাসদেবপুরে শোভনেশকে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন, তখনকার আঁকা ছবিগুলোর কি হল ? খুন, রক্তপাত যাই আঁকুন না, ছবি তো বটে। দাম তো আছে। গঙ্গাদা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, এইবার প্রশ্ন উঠবে : জাল নয়, আসল ছবিগুলো কোথায়, কার কাছে ? প্রশ্নটা যে তুলতে পারে, তাকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কি হবে না ?

রোহিণী ধীরে ধীরে অবশ হয়ে ঝুঁকে পড়ল। মৃত্যুর কথা মনে আনতে সে চায় না, তবুও মনে এসে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা শক্ত একটা কী যেন ক্রমশ ঢুকছে। একে বোধহয় ভয় বলা হয়। অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য সে মনে মনে বলল, 'আমি একটা

ভোঁদা, আমার মাথায় গোবর, আমি মাথামোটা। কপালে হাত রেখে সে ভাবল, আমারই এখন কোথাও পালিয়ে যাওয়া উচিত, খুনিদের নাগাল এড়িয়ে। গঙ্গাদাকে মিথ্যাবাদী বলাটাও ঠিক কাজ হয়নি। সেনগুপ্তদের পাগলের বংশ নয়, এটা মেনে নিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত ? তা নয়, শোভনেশ গলা টিপে ধরেছিল, তখন ওকে দেখাচ্ছিল পাগলের মত, প্রত্যেক জেনারেশনে একজন পাগল হয় আর এই জেনারেশনে সেটা হয়েছে শোভনেশ—এইসব কথা বলে গঙ্গাদাকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দেওয়ার কী এমন দরকার ছিল ? মাথা গরম হয়ে গেলে যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, তারা বিপদে পড়বে না তো আর কে পড়বে ? এই ভাবেই তো—হ্যাঁ, এই কাণ্ডজ্ঞান লোপের জন্যই আজ শোভনেশের এই দশা !

বাস থেকে নেমে ফ্ল্যাটে ঢোকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই রোহিণী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, কেউ যদি মারাত্মক বিপদে তাকে ফেলতে চেষ্টা করে, তাহলে যথাসাধ্য বাধা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাতে মৃত্যু হয় যদি, হবে। কিন্তু এখন থেকে তাকে চোখ কান খুলে সাবধানে থাকতে হবে। কেন জানি তার মনে হচ্ছে, অশুভ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। রাজেন তাড়াতাড়ি ফিরে এলে সে মনে জোর পাবে। এখন এইটেই তার দরকার।

ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে সে ঝরঝরে তাজা বোধ করল চা তৈরি করে খেয়ে উপরে গেল সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে। দরজা খুললেন হৃদয়রঞ্জন।

"কেমন আছেন মাসিমা ?"

"একটু ভাল।" হৃদয়রঞ্জন সরে দাঁড়ালেন রোহিণীকে ভিতরে আসতে দেবার জন্য। খাটে শুয়ে সুজাতা। বাঁ চোখে তুলো আর স্টিকিং প্লাস্টার। হাত দিয়ে খাটের খালি জায়গাটা চাপড়ে বললেন, "বোসো।"

"কি করে পড়লেন ?"

"মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেছিল।" সুজাতা ধীর স্বরে বললেন। তাঁর ডান চোখটা স্থিরভাবে রোহিণীর মুখভাব লক্ষ করছে। যা দেখতে চেয়েছিলেন, সেটা দেখতে পেলেন বোধহয়। তাই কোন রকম ভনিতা না করেই বললেন, "তুমি মনে মনে যা ভেবেছ, তাই।"

রোহিণী তাড়াতাড়ি তার অপ্রতিভতা কাটাতে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। সুজাতা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন।

"তোমাকে কাল বাসে কয়েকটা কথা বলেছি।" সুজাতা এই বলে দাঁড়িয়ে থাকা হৃদয়রঞ্জনের দিকে তাকালেন। "রোহিণীকে একটু চা করে দাও। তুমি তো এখন অফিস থেকেই আসছ ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু মাসিমা—" সে থেমে গেল সুজাতার হাতের বারণ দেখে। চা করতে বলাটা আসলে তাঁর স্বামীকে ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই, এটা বুঝতে রোহিণীর অসুবিধে হল না। হৃদয়রঞ্জন ব্যগ্র হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

"আমি দিগম্বর বর্ধন লেনে গেছলাম। অনেক স্মৃতি রয়ে গেছে ওই বাড়িটাকে নিয়ে।" শান্ত অচঞ্চল, কোমল স্বরে সুজাতা বললেন চোখে হাসির ঝিলিক নিয়ে। "একাই গেছলাম। চুপিচুপি, কেউ জানে না। এত বছর পর, খুব অবাক লাগছিল। শোভনেশের অংশটা বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন মালিক মেরামত করে খালিই রেখেছে তালা দিয়ে। পাশে পরমেশদের অংশটা ভেঙেচুরে পড়ছে। বাড়ি সারাবার সামর্থ্য

নেই। আর সারাবেই বা কে, পরমেশ তো পাগলের মত অবস্থায়।"

"য়্যাঁ!" রোহিণীর মুখ থেকে বিস্ময়টা নির্গত হল স্বতঃস্ফূর্ত।

"হ্যাঁ, কঙ্কালের মত চেহারা হয়ে গেছে। মাথায় চুল নেই। ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড়, গায়ে দুর্গন্ধ আর চুলকুনি। মনে হল, ভাল দেখতেও পায় না। আমার সঙ্গে ও কথা বলল, খুবই এলোমেলোভাবে। আমাকে চিনতে পারেনি, পারা অবশ্য শক্তই। কিছু কিছু পুরোনো কথা বললাম স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য, হুঁ হাঁ করল। ওকে দেখাশোনা করছে পুরনো এক চাকর আর তার বৌ।"

"বিশ্বনাথ আর গীতা?"

"হ্যাঁ, এই নামই বলল। পরমেশের একতলায় ওরা নাকি পনেরো বছর ধরে একটা ঘরে রয়েছে। আমাকে আর চিনবে কি! বিশ্বনাথ তখন ছিল না, গীতার সঙ্গেই কথা বললাম।"

সুজাতা থেমে রইলেন। মনের মধ্যে কি একটা দ্বন্দ্ব যেন শুরু হয়েছে, সেটা সামলাবার চেষ্টা করছেন। রোহিণী ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

"জানো, গীতা একটা অদ্ভুত কথা বলল। এটা ওটা বলতে বলতে বীণার খুন হওয়ার কথাটা উঠেছিল। আমি বললাম, শোভনেশ যে এমন কাজ করবে, তা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। গীতা হঠাৎ বলল, 'উনি কেন খুন করতে যাবেন? দোতালা থেকে নেমে বড়দা উঠোন পেরিয়ে যখন গেটের কাছে, তখনই তো মেয়ে মানুষটা জানলা দিয়ে নিচে পড়ল। আওয়াজ পেয়ে বড়দা ছুটে গেল। আমি তো তখন উঠোনের একধারে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলুম।' রোহিণী, ওর এই কথাটা শুনে আমি তো অবাক! বললাম গীতাকে, তুমি তাহলে এ কথাটা পুলিশকে তখন বললে না কেন? দেখো তো, একটা লোক মিছিমিছি এখনও জেল খাটছে। ও বলল, 'আমি তো ভয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তখন কাঁপছি। অমন জিনিস দেখলে ভয় পাব না? কিছু পরে নারানের বাবা এল, তখনি ওকে সব বললুম। ও শুনেই বলল, চুপ চুপ, মুখে চাবি দিয়ে রাখ। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে আঠারো বছর কোর্টঘর থানা করিয়ে ছাড়বে। তুই বরং এখুনি বাপের বাড়ি চলে যা ছেলেকে নিয়ে, কাউকে মুখ ফসকে একটা কথা বলিসনি। ও বাড়ির ব্যাপারে আমাদের থাকার দরকার নেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নারানকে নিয়ে আমি তালতলায় বাপের বাড়ি চলে যাই। সাত দিন পরে ফিরে এসে শুনলাম, বড়দাকে পুলিশ ধরেছে। মনটা যে কি খারাপ হয়ে গেল সেই থেকে। বিশ্বাস করবে না রোহিণী, এই বলে সেই গরিব বৌটা কাঁদতে শুরু করল।"

একটা ট্রে-তে দু' কাপ চা নিয়ে ঢুকলেন হৃদয়রঞ্জন। ওরা দুজন কাপ তুলে নিল।

"তুমি একবার দারোয়ানকে বলে এস, কারেন্ট এলেই যেন আমাদের ট্যাঙ্কটায় আগে জল ভরে দেয়।" সুজাতা নম্রস্বরে স্বামীকে বললেন, ঘরে তার উপস্থিতিটাকে সরিয়ে দেবার জন্য।

"একবার বলে এসেছি।"

"আর একবার বলে এস।" সুজাতার কঠিন দৃঢ় স্বর দ্রুত ঘর থেকে বার করে দিল হৃদয়রঞ্জনকে। যেন এইভাবে আদেশ দেওয়াটা নিয়মিত ব্যাপার, এমন ভাবে সুজাতা হাসলেন। রোহিণীর মনে হল, চোখের কালশিরাটা বোধহয় স্বামীকে হুকুম দিয়েই উনি তৈরি করতে বাধ্য করিয়েছেন। নয়তো এমন মিনমিনে লোকের পক্ষে এত সাহস হয় কী করে? সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার মনে হল, মাথা গরম হয়ে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেলে মানুষ

অনেক কিছু করে ফেলে।

"কি বলছিলাম যেন ?...হ্যাঁ, গীতা তো কাঁদতে শুরু করল। আমি ওকে বললাম, তুমি বড়দার নতুন বৌকে গিয়ে চুপিচুপি বলে দিতে পারতে। গীতা বলল, 'নারানের বাপ চোখেচোখে রাখত আমায়, খালি শাসাত, খবরদার ওবাড়ির দিকে এক পা বাড়িয়েছিস কি এ বাড়িতে আবার একটা খুন হয়ে যাবে। বড় ঘরের ব্যাপারস্যাপারে নাক গলিয়ে লাভ কি ? তাছাড়া নতুন বৌও তো বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আমি আর বলব কাকে ? বড়দার এক বন্ধু আসত, মোটা, বেঁটে মতন। সে এসে নারানের বাপের সঙ্গে কথা বলত, আর গাড়িতে করে ছবি নিয়ে চলে যেত।"

"গঙ্গাদা !" রোহিণী অস্ফুটে বলল।

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে। এই ক'বছর গীতা কথাটা গোপন করে রাখার কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে আমার মত এক বাইরের লোককে পেয়ে বলে ফেলে বুক হাল্কা করে। তারপর আমি চলে আসি।"

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। রোহিণীও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল এলোমেলো ভাবনায়।

"আমি বিশ্বাস করিনি। শোভনেশের পক্ষে একাজ কখনোই সম্ভব নয়। এখন দেখছি আমার বিশ্বাসে ভুল হয়নি।"

সুজাতা জানালার বাইরে চোখ রেখেই কথাগুলো বললেন। রোহিণী ফিসফিস স্বরে বলল, "এখন আর জেনে কোন লাভ হল না। ও তো পালিয়ে রয়েছে।"

"থাকুক, কিন্তু ওর এই খুনী অপবাদটা মুছে দেওয়া দরকার।"

"তাহলে বীণা জানলা দিয়ে নিচে পড়ল কী করে ?"

"আত্মহত্যা করতে পারে : অন্য কেউ ওকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে।"

"অন্য কেউ !" রোহিণী ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে, "অন্য আর কে আছে ওই বাড়িতে, যে ঠেলে ফেলে দেবে ? একটা তো ঝি, তাও সেদিন সে সকালে ছুটি নিয়েছিল। সবথেকে বড় কথা, কোর্টে শোভনেশ নিজে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছে, সে খুন করেছে। বলেছিল, যা শাস্তি দেবার, দিয়ে দিন।"

"যা খুশি ও বলুক, খুন করেছি বললেই সে খুনী হয়ে যায় না। চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার মত লোক পাওয়া গেছে।"

সুজাতা উঠে বসে হঠাৎই রোহিণীর দুটি হাত দু হাতে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন, "রোহিণী একবার চেষ্টা করে দেখ না, পুলিশ আবার তদন্ত করে, নতুন করে মামলাটা তুলুক। যা খরচ হয়, আমি সাধ্যমত দেব। তুমি ভাল একজন উকিল ঠিক করে তাকে সব কথা বলো। হাজার হোক, তোমার স্বামী তো ! তুমি কি চাও না, ও ফিরে আসুক ?"

রোহিণী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাবে। ফ্যালফ্যালে ভাবটা তার চোখ থেকে সরে যাবার পর কঠিন চাহনি ফুটে উঠল। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

"শোভনেশের সম্পর্কে তার প্রেমিকা মোহাচ্ছন্ন থাকতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাকে ফিরিয়ে আনার। মাফ করবেন, আমার জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে লোকটিকে আপনি কখনো দেখেননি। বহুদূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় অপরূপ দেখায়, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করুন, দেখবেন কি কর্কশ বিশ্রী পাথর দিয়ে সেটা তৈরি। আমি চললাম।"

রোহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই শুনতে পেল সুজাতার চিৎকার।

"আমি যাব ? উকিলের কাছে, পুলিশের কাছে। আমার দুটো চোখও যদি নষ্ট হয়, তবু কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না, পারবে না...।"

সুজাতার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে রোহিণী সিঁড়িতেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্রী লাগছে তার নিজেকে। আজ দু'-দুটো ঝগড়া সে করে ফেলল অল্প সময়ের মধ্যে। গঙ্গাদার সঙ্গে যা হল, সেটা অবশ্য ঠিক ঝগড়ার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু কিসের পর্যায়ে যে পড়ে, সেটাও সে ঠিক করতে পারছে না। চরিত্র হনন করার মত কয়েকটা অভিযোগ সে করেছে, তাকে ঝগড়া বলা যায় না। গঙ্গাদা কিছু কিছু উত্তর দিয়েছেন আর প্রচ্ছন্ন ভয় দেখিয়েছেন, 'মারাত্মক বিপদে পড়বে।' তাইতে সে হেসেছে। হাসিটা গঙ্গাদা দেখেছেন কি না, তা সে লক্ষ করেনি। চ্যালেঞ্জ নিলাম, এই রকম একটা ঔদ্ধত্য তখন রক্তে টগবগিয়ে উঠেছিল।

এই টগবগানি সব সময়, সর্বত্র দেখানোটা ভাল নয়। একটু ট্যাক্‌টিকাল হওয়া ভাল। জীবন নিয়ে টানাটানির মত ব্যাপারে খুব ঠাণ্ডা মাথায়, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে পা ফেলতে হয়, কথা বলতে হয়। সিঁড়ি দিয়ে এক পা, এক পা করে নামতে নামতে রোহিণী ভাবল, গঙ্গাদাকে খোঁচানোটা উচিত হয়নি, অন্তত এই মুহূর্তে। শোভনেশ ওঁকে ফোন করেছিল শোনামাত্রই বীরত্ব দেখিয়ে, 'রোহিণী তাব সঙ্গে দেখা করতে চায়' বলাটাও তার হাঁদামো হয়েছে।

চাবি দিয়ে দরজা খুলতে খুলতে পায়ের আওয়াজ পেল রোহিণী। তুষার দত্তর ছোট ছেলে উঠে আসছে লাফাতে লাফাতে।

"অ্যাই শোনো, আমার একটা ফোন আসার কথা আছে, এলেই ডেকে দিও, কেমন ?"

"কখন আসবে ?"

কি মুশকিল ! এটা তো সে শোভনেশকে জানাবাব জন্য গঙ্গাদাকে বলে দেয়নি ! করে যদি, তাহলে নিশ্চয় লুকিয়ে চুরিয়ে রাত্রিবেলাতেই কববে। গঙ্গাদা হয়তো তাই বলে দেবেন।

"রাতের দিকে আসবে। এলেই কিন্তু-- ।"

ছেলেটি মাথা নেড়ে ব্যস্ত হয়ে উপরে উঠে গেল। সিঁড়িতে ধাপে ধাপে হৃদয়রঞ্জনের মাথাটা জেগে উঠছে। রোহিণী দাঁড়িয়ে থাকল।

"আপনি একটু পরে যাবেন, মাসিমা এখন—"

"কি হয়েছে ?" উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালেন হৃদয়রঞ্জন।" চোখে কি আবার কিছু হল নাকি ?"

"চোখে নয়।" রোহিণী গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বলল, "আমার সঙ্গে একটু মতান্তর ঘটেছে, তাইতে আপসেট হয়ে গেছেন।"

"কেন ?"

পলকের জন্য রোহিণীর চাহনি কঠিন হয়েই আবার মৃদু হল। "উনি যা চাইছেন, আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। বোধহয় কেউই তা করতে চাইবেন না। উনি চাইছেন—"

"আমি জানি।"

হৃদয়রঞ্জন চশমার পুরু কাচের আড়ালেও তাঁর চোখের জ্বলে ওঠা ঝলকানি গোপন

করতে পারলেন না। দুজনে দুজনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। তারই মধ্যে রোহিণীর জানা হয়ে গেল পুরুষ ও নারীর মধ্যে লক্ষ বছরের টানাপোড়েনের বার্তা। হৃদয়রঞ্জন নিঃশব্দে নীচে নেমে গেলেন।

এখন বিকেল। এই সময় ঘরে থাকা রোহিণীর জীবনে খুব কমই ঘটেছে। কিন্তু সে যাবেই বা কোথায়, করবেই বা কি? মন এলোমেলো হয়ে গেছে, একটা ব্যাপারেও স্থিরভাবে নিবদ্ধ হতে পারছে না। তার ফলে এক ধরনের অনিশ্চয়তাবোধ ছায়ার মত তার সঙ্গী হয়ে রয়েছে। অস্বস্তি আর অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। সবার আগে এই ছায়াটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দরকার। ছড়িয়ে যাওয়া, অগোছাল, মনটাকে সংহত করে আনতে হবে একটা বিন্দুতে।

কি আশ্চর্য, রাজেন তো এই কথাগুলোই একদিন তাকে বলেছিল! একটা সিজন সে রানই পেল না। ক্লাব ক্রিকেটে একটার পর একটা ইনিংস ফেইল করেছে। তারপর রঞ্জি ট্রফির প্রথম খেলা অসমের সঙ্গে। অফ ফর্মে থাকা প্লেয়ারদের ফর্ম ফিরিয়ে দেওয়ার টিম হল অসম। কিন্তু রাজেনকে ব্যাটিং ফর্ম ফিরিয়ে দিতে পারল না। দু' ইনিংসে তার রান হল, তিন আর এগারো। এই সময় কে যেন রাজেনকে প্রোগ্রেসিভ রিল্যাকসেসন পদ্ধতির কথা বলেছিল।

'সেটা আবার কি জিনিস?' রোহিণী জিজ্ঞাসা করেছিল রাজেনকে। সন্ধ্যাবেলায় ওরা তখন বুড়ো হিলম্যানে চেপে বাবুঘাট থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল গঙ্গার ধার দিয়ে। 'বলছি, আগে গাড়িটা পার্ক করার একটা জায়গা বার করি।'

গাড়ি রেখে দুজনে, খোঁজাখুঁজি করে একটা বেঞ্চ পায়, যার কাছাকাছি লম্বা গাছ থাকায় জায়গাটা আলো আঁধারির মধ্যে পড়ে গেছে। বেঞ্চে অল্পবয়সী দুটি ছেলেমেয়ে বসেছিল। রোহিণী বসল বেঞ্চের মাঝখানে, ছেলেটিকে ডাইনে আর রাজেনকে বাঁদিকে রেখে। ছেলেটি তখন অস্বস্তি ভরে আর একটু সরে গেল মেয়েটির দিকে। সরে গিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলা চালিয়ে যেতে থাকে। রাজেন কানের কাছে মুখে এনে বলে, 'খবরদার কানটা যেন ওদিকে না যায়।'

'কেন, অন্যের কথা শোনাই কি আমার অভ্যাস?'

'তা নয়। ওদের দ্বারা প্রভাবিত হলে নিজের ওরিজিন্যালিটি নষ্ট হবে। আমি তো ওইজন্য ভয়ে বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়িই না। প্রেমের ডায়লগগুলো এত ডাল, একঘেয়ে!'

'আর সেইজন্যই বাংলা গল্প উপন্যাসের এই দুর্দশা। ভাল করে প্রেম করবার মত নায়কই আর খুঁজে পাচ্ছে না বাঙালি লেখকরা।'

'তার জন্য কি আমি দায়ী নাকি?'

'তোমার মত রসকষহীন ওরিজিন্যাল লোকের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, সুন্দর সুন্দর মিথ্যে কথাও আর এখন ছেলেরা বলতে পারে না। আমার পাশে এখন কি কথা চলছে, জান?' রোহিণী ঝুঁকে রাজেনের কাঁধে মুখ ঠেকিয়ে বলেছিল।

'আস্তে বলো, আস্তে, মুখটা আর একটু তোল, হ্যাঁ...কি কথা বলছে?'

'এত কম স্যালারিতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বাচ্চাকে পড়ানোর প্রেশার নিতে পারবে না।...রাজেন এটা পাবলিক প্লেস, মুখ সরাও...হ্যাঁ, তাহলে বোঝো কাণ্ড। বিয়েই হলো না এখনো, আর কিনা তর্ক জুড়ে দিয়েছে। আরে বাবা, এখন গঙ্গার ধারে বসে বলবি তো—নিশ্চয় পড়াব, পরো মাইনেটাই স্কুলে দেব। সাখাওয়াতে পড়াব, সাউথ পয়েন্টে

পড়াব, প্র্যাট মেমোরিয়াল, ক্যালকাটা গার্লস, বয়েজ, শ্রী শিক্ষা, হিন্দি হাই, লা মার্ট, সেন্ট জেভিয়ার্স, দার্জিলিং যেখানে তোমার ইচ্ছে—বাচ্চাকে সেখানেই পড়াব, বাচ্চা গড়গড়িয়ে ইংরিজি না বলা পর্যন্ত আমাদের এই ভালবাসা পূর্ণতাই পাবে না। এই সব এখন বলে যাবে। তা নয়, বলছে কিনা প্রেশার নিতে পারব না !'

'প্রেশার ! প্রেশারের কথা বলল ?' রাজেন নড়ে চড়ে বসে। 'আমার দশায় পড়েছে তাহলে। জানো, আমার এক সাইকোলজিস্ট বন্ধুর কাছে গত বছর গেছিলাম। একদমই তখন রান পাচ্ছিলাম না। লীগ ম্যাচে, একটা মাত্র ফিফটি, বাকি সব দশ, পনেরো, তিরিশ। ভয়, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, কনফিডেন্সের অভাব, এই সব থেকে শরীরে আর মনে যে স্ট্রেস তৈরি হয়, তার খানিকটা দূর করার জন্য বন্ধুটি আমাকে প্রোগ্রেসিভ রিল্যাকসেসনের কথা বলল। ব্যাপারটা হল, প্রথমে একটা নির্জন শান্ত জায়গা বেছে নাও, যেখানে অন্তত পনেরো কুড়ি মিনিট কেউ আসবে না। ভাল হয় নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে দাও। হাত, পা, ঘাড় একটু ছাড়িয়ে নাও ব্যায়াম করে। তারপর বাবু হয়ে বসো কি চিৎ হয়ে শোও। চোখ বন্ধ করো। গভীর ভাবে আস্তে আস্তে শ্বাস টানো আর ছাড়ো। রিল্যাক্স। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ভেবে যাও শরীর থেকে সব টেনশন, উদ্বেগ দুশ্চিন্তা তুমি বার করে দিচ্ছ। এই সময় বিশেষ কোন কিছু নিয়ে একদম চিন্তা করবে না যা মনে আসছে আসুক আবার চলেও যাক, ভাবনা চিন্তা আঁকড়ে থাকবে না। এভাবে দশ-পনেরো মিনিট শরীরটা আলগা করে ছেড়ে দিয়ে, শরীর শক্ত করো, পাঁচ সেকেন্ড, টানটান করো। ব্যাস। দিনে দুবার, পারলে তিনবার এটা করা দরকার। এতে শরীর রিল্যাকসড হয়, টেনশন কমায়।'

'এই করেই তুমি ফর্ম ফিরে পেলে ?' রোহিণীর কাছে ব্যাপাটা হেঁয়ালি মনে হয়। এত সহজেই কি স্ট্রেস কাটিয়ে রাজেন রানে ফিরে এল ?

'আরে না না, শুধু কি এই ? নিজের সঙ্গে অনবরত কথা বলতে হয়েছে, অনবরত বলতে হয়েছে আমি রান পাব, পাবই ; জিতব, জিতবই। এটা হল, পজিটিভ অ্যাফারমেশন। সজ্ঞানে ক্রমাগত অবচেতনে ইতিমূলক এই রকম ধারণা ঢুকিয়ে দিলে, আচরণে এর প্রভাব পড়বেই। সেজন্য অবচেতনকে এমন ভাবে তৈরি করা, যাতে মোটিভেশনের আর কনসেনট্রেশনের জন্য হারার ভয়, নার্ভাসনেস, উদ্বেগ, ইনজুরির ভয়, নিজের উপর রেগে যাওয়া এইসব নেগেটিভ ব্যাপার দূর করতে এই পজিটিভ অ্যাফারমেশনকে দরকারের সময় কাজে লাগানো যায়। প্রোগ্রেসিভ রিল্যাকসেসনের সময় সাহস আর কনফিডেনস তৈরি করার মতন কিছু কথা বার বার মন্ত্রের মত আউড়ে অবচেতনে গেঁথে দিতে হয়।'

'রাজেন, তোমার কথাগুলো খুবই উপকারী। কিন্তু এখন এইখানে বসে এগুলো মাথায় ঢোকানো মত অবস্থা আমার অবচেতনে নেই। তার কারণ কোন রকম ভয়, উদ্বেগ, কনফিডেন্সের অভাব আমি আপাতত পাচ্ছি না।'

'এত নিশ্চিতভাবে বলছ কি করে ? ভয়টয় তো একদিন পেতেও পার। এই যে আমি ফর্ম হারিয়ে ছিলাম, সেটা এমন এক ভয় থেকেই যা আমি কল্পনাও করিনি কখনো।'

'কি ভয় থেকে ?'

'রোহিণী নামে এক ভদ্রমহিলার হৃদয় জয় করতে পারব কি পারব না ! ভাবতে ভাবতে ব্যাটিং কনসেনট্রেশন নষ্ট হল, টেনশন শুরু হল, ভয় ধরতে লাগল, ক্যাচ ফেলতে লাগলাম, রান আউট হলাম, রাণ আউট করালামও...'

'হুম্‌ম। আর কি কি হল ?'

'সে বিরাট লিস্টি, সব এখন অবচেতন থেকে তুলে আনতে হবে, আমার অত সময় নেই।'

'হাত ছাড়ো। পাশে লোক, অসভ্যতা কোর না।'

'সাইকোলজিস্ট বলল, পজিটিভ অ্যাফারমেশন চাই। দিনরাত শুধু বলে যাও, রোহিণী, রোহিণী, আই মাস্ট উইন হার হার্ট, আই মাস্ট...আই মাস্ট...'

'তা উইন হয়েছে কি ?'

'না। কারণ, হার হার্ট ইজ মাচ মাচ টাফার দ্যান গাওসকরস ডিফেন্সিভ ব্যাট, মাচ মাচ ক্রুয়েলার দ্যান ভিভ রিচার্ডসেস অ্যাগ্রেসিভ ব্যাট, মাচ মাচ কি বলব সোনিয়া গান্ধীর মুখেও হাসি দেখেছি কল্পনা করতে পারি, শাবানা আজমি পেটে বাচ্চা নিয়ে শাড়ি পরে শুওর তাড়াতে তাড়াতে সাঁতরে গঙ্গা পার হচ্ছে দেখেও হাসি চাপতে পারি, কিন্তু এই ভদ্রমহিলার হৃদয় যে কি বস্তুতে গড়া, তা আজও বুঝতে পারলাম না।'

'তার মানে পজিটিভ অ্যাফারমেশন তোমার ওপর কাজ করল না, তার মানে ফর্মও ফিরে পেলে না তাহলে বেঙ্গল টিমে চান্স পাও কি করে ?'

'রাণ করে।'

'রান পাচ্ছ তাহলে ?'

'পাচ্ছি, কিন্তু ওগুলো কি রান ? ওকে কি রান বলা উচিত ? একটা রানের পিছনে হৃদয় নেই, একটাও অন্তর দিয়ে পাওয়া নয়।'

'রিল্যাক্স, রিল্যাক্স রাজেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, আর এক মিলিমিটার এগিয়েছ কি আমার পাশের দু'জন প্রতিবাদ জানাতে উঠে পড়বে, তখন কিন্তু বিপদ আসবে।'

'কি ভাবে আসবে।'

'ওই জায়গায় দুটো খিটখিটে বুড়োবুড়ি এসে যদি বসে !'

রোহিণী হাসতে শুরু করল। রাজেনের কথা ভাবতে ভাবতে সে ভুলে গেছিল তার চারপাশের জগতকে। ঘটে যাওয়া এত রকম ঘটনা, তাই থেকে বেরিয়ে আসা নানা রকম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, সবগুলো জড়ো হয়ে মনের উপর একটা চাপ, কালো ছায়ার মত অনবরত তার সঙ্গী হয়ে ঘুরছে—সব সে ভুলে গেছিল কিছুক্ষণের জন্য রাজেনের পাশে বসে।

একথা ঠিক, রাজেন একবার সাইকোলজিস্টের কাছে গেছিল, যখন হঠাৎই ফর্ম হারিয়ে রান পাচ্ছিল না। রোহিণী ভেবে দেখল, এখন তার মানসিক অবস্থাটা ঠিক তখনকার রাজেনের মত হয়ে উঠেছে, ভয় ধরছে, প্রত্যয় নেই নিজের উপর, কি হয় কি হয় একটা উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মনের মধ্যে একটা আলোড়ন, রাজেন বলেছিল, একে নেগেটিভ ইমোশন বলে, এটা মন থেকে বার করে দিতে হয়। সেজন্য কারুর কাছে ভয়ের কথা, উদ্বেগের কথা স্বীকার করতে পারলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু এখন সে কার কাছে মন খুলে কথা বলবে ? তার একান্ত হিতার্থী, শুভার্থী, বন্ধু বলতে তো একজনও নেই, রাজেন ছাড়া !

নেগেটিভ ইমোশনের খর্পরটা আলগা করার জন্য রাজেন অবচেতনাকে তৈরি করত ইতিবাচক কথা অবিরত আউড়ে, আর তার নিজের সফল ব্যাটিংয়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়ে তুলে। রোহিণীকে সে বলেছিল, 'চোখ বুঁজে দেখতাম, ইডেনে খেলা হচ্ছে ভারত বনাম বিশ্ব একাদশ। গাওস্করের আর আমি ভারতের হয়ে ওপেন করতে নেমেছি।

বল করবে লিলি আর অ্যান্ডি রবার্টস। গাওস্কর রবার্টসের বল ফস্কাচ্ছে, প্যাডে লাগাচ্ছে, ক্যাচ তুলে বেঁচে যাচ্ছে। আঁকুপাকু করে কোন রকমে টিকে রইল। আর আমি লিলিকে পরপর দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ করে একটা হুক, একটা কাট করলাম। প্রথম ওভারেই ষোল রাণ নিলাম। এইভাবে কল্পনায় হ্যাডলি, ইমরানকেও খেলতাম। সবাই তুচ্ছ আমার কাছে। তারপর মনে মনে বলতাম, সব বোলার আমার চাকর, পিটিয়ে সব বোলারের চামড়া তুলব। আমি ধীর, স্থির, শান্ত মনে ক্রিজে থাকব। কনসেনট্রেশনে আমার কোন খুঁত নেই—।'

রোহিণী ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে, সায়ার দড়ি খুলে দিয়ে চোখ বুজল। শরীর আলগা, শ্বাস-প্রশ্বাস গভীরভাবে ধীরে ধীরে। এই পর্যন্ত তার ঠিকই হয়েছে, এবার পজিটিভ কথা অবচেতনে নামিয়ে গেঁথে দিতে হবে। কি বলবে সে ? একটু নার্ভাস হয়েই সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য ফিসফিস করে বলল : শোভনেশকে ভয় করি না। কে শোভনেশ ?

গঙ্গাদাকে ভয় করি না। কে গঙ্গাদা ?

সুভাষ গায়েন ফের মিথ্যা কথা বললে ধরে ফেলব। বোকা ভেবেছে নাকি ?

শোভনেশ ফোন করলে কড়া জবাব দেব। বলব, আমার দুটো অ্যালসেশিয়ান, একটা ডোবারম্যান আছে, কামড়ে দিলে আমি কিন্তু দায়ী হব না।

কিন্তু অবচেতনে মিথ্যে কথা জমানোটা কি উচিত হবে ? রোহিণী মনে মনে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কুকুর বাতিল করল। রিভলভার আছে, ছোরা আছে, এসবও বলবে না ঠিক করল। তাহলে পজিটিভ স্টেটমেন্ট আর কি হতে পারে ?

সে চোখ খুলল। অনুভব করল, মোটেই নিজেকে রিল্যাকসড মনে হচ্ছে না, মনের মধ্যে সাহস, ভরসা কিছুমাত্র জমেছে বলেও মনে হচ্ছে না। হঠাৎই এইভাবে নিজেকে বদলে নেওয়া যে যায় না, দিনের পর দিন অভ্যাসের মধ্যে থেকে অবচেতনকে গড়ে তুলতে হয়, রোহিণী তা বুঝতে পারল। এখন পুরো নগ্ন হয়ে আধ ঘণ্টা মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে হয়তো হালকা স্বচ্ছন্দ হতে পারবে।

যেমনই ভাবা, সঙ্গে সঙ্গে সে তাই করল। মেঝেয় শুয়ে সে ঘাড় থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কঠিন শীতল স্পর্শটা সইয়ে নিয়ে দুই মুঠি বুকে জড়ো করে রাখল। এবার নেগেটিভ ইমোশনগুলো বার করে দিতে হবে।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘরের আসবাব আবছা দেখাচ্ছে। হাতে লেখার কাজ রয়েছে, সেজন্য কিছু ভাবা, কয়েকটা মহারানীর সংখ্যা দেখা আর দু-তিনজন লোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু কিছুতেই এখন সে এসবে মন বসাতে পারবে না। একটা টেলিফোন কলের জন্য তাকে এই অন্ধকার ঘরে চুপচাপ অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

শোভনেশ কেন তার সঙ্গে কথা বলতে চায় ? রোহিণী চেষ্টা করল কারণটা খুঁজে বার করতে। তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা শেষদিকে এমনই বিষিয়ে উঠেছিল যে, শোভনেশ পুলিস হাজতেও তার সঙ্গে দেখা করেনি। কাগজে কাগজে ফলাও করে তখন এই খুন নিয়ে সত্যি-মিথ্যে গল্প ছাপা হচ্ছিল। তাই পড়ে মরমে মরে যাচ্ছিল রোহিণী আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছিল। যাই হোক, একসময় সেসবও ধুলোচাপা পড়ে গেল। ফিসফাস, কানাকানি বন্ধ হল, তারপর সেও বোম্বাই চলে গেল। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে ভালই দিন কাটছিল, কিন্তু হঠাৎ আবার শোভনেশ রাহুর মত তার জীবনে ফিরে এল কেন ?

ভাবনার জাল বুনতে বুনতে রোহিনী অন্ধকার ঘরে কতক্ষণ সময় যে, অতিবাহিত করল তা সে জানে না। দরজার বেল বেজে উঠতে তার জালবোনা থেমে গেল। ধুত্তোর ছাই! এইসব চিন্তা করে কি নেগেটিভ ইমোশন মন থেকে বার করা যায়? ধড়মড়িয়ে উঠে ম্যাক্সিটা মাথা দিয়ে গলাতে গলাতে সে ভাবল, কে এল এখন? হৃদয়রঞ্জন? সুজাতা? কুন্তী? শোভনেশ যে নয়, এটা সে ধরে নিতে পারে। আলো জ্বেলে সে দরজার আই হোল দিয়ে দেখল, তুষার দত্তর ছোট ছেলে।

"আন্টি, আপনার ফোন।"

ধড়াস করে উঠল রোহিণীর বুক, শোভনেশের ফোন? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি গঙ্গাদা ওকে খবর দিলেন কি করে? মাত্র তো আজ দুপুরেই সে বলেছে শোভনেশের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ইতিমধ্যেই কি আবার গঙ্গাদাকে ফোন করে তার ফোন নাম্বারটা পেয়ে এখন তাকে ফোন করছে?

"কে ফোন করছে? নাম বলল কি?"

"না। শুধু বলল নিচের তলায় রোহিনী সেনগুপ্তকে দয়া করে একবার ডেকে দেবেন? খুব জরুরী দরকার।"

"পুরুষ না মেয়ে?"

"পুরুষ।"

"আচ্ছা যাচ্ছি। কে কে আছে তোমাদের ঘরে?"

"বাবা ছাড়া সবাই আছি।"

ছেলেটি ছুটে উপরে উঠে গেল। দরজার চাবিটা হাতে নিয়ে একপা একপা করে রোহিণী সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিজেকে বলল, 'স্টেডি রোহিণী, স্টেডি...বী কাম, ভয় পেও না। লোকটা অনেক দূরে, তোমায় সে দেখতে পাচ্ছে না, হাত বাড়িয়ে তোমার গলাও ধরতে পারবে না।...ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলবে, আগে বুঝতে চেষ্টা করো ও কি করতে চায়, তারপর সেইমত জবাব দেবে। দরকার হলে কঠিন হবে, কর্কশ গলায় নিজেকে প্রকাশ করবে, ভয়ও দেখাবে।

"হ্যালো।" রোহিণীর স্বর কেঁপে গেল এইটুকু শব্দ বার করতেই। ওপারে ঘরঘর শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন লং ডিস্টান্স কল। আবার সে বলল, "হ্যালো।"

হঠাৎ ঘরঘরানিটা থেমেগেল। ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ পরিষ্কার ভাবে ভেসে এল, হ্যালো, কে বলছেন?"

"আমি রোহিণী, আমি রোহিণী।" রোহিণী ফোনটা কানে চেপে ঝুঁকে পড়ল। স্বরটা তার খুব চেনা।

"আমি রাজেন।" একটা ইঙ্গিতময় নীরবতা রিসিভারে বিরাজ করল। বক্তা যেন আশা করছে বিস্মিত অভিব্যক্তির ও উচ্ছ্বাসের একটা প্রকাশ।

"গলা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি তুমি। ওহ্‌হ্‌—কি ভীষণভাবে যে আমি চাইছিলাম একটা ফোন কল!"

"কার কাছ থেকে?" চিমটি কাটা প্রশ্ন এল।

"তোমার কাছ থেকে। না না, অন্য কারুর কাছ থেকে।" রোহিণী চিমটির জবাব দিল আর সঙ্গে সঙ্গে শোভনেশের মুখটা তার মনে পড়ল।

"কে সেই পাপিষ্ঠ নরাধম ভাগ্যবান, যার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আকুল অপেক্ষায় ছিলে?"

"রাজেন কালীঘাট কি দর্জিপাড়া থেকে নয়, জয়পুর থেকে বোধহয় ফোন করছ, তাই নয় ?"

"অবশ্যই। তোমার কি ধারণা, জয়পুর যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি জয়নগরে গিয়ে বসে বসে মোয়া খাচ্ছি ?"

"না, তা খাচ্ছ না। জয়পুরেই সম্ভবত গেছ। কিন্তু টেলিফোন চার্জ কত পড়বে, সেটা জেনে নিয়েছ কি ? টাকাটা কি সি এ বি দেবে, না নিজের পকেট থেকে দিতে হবে !'

"এ প্রশ্ন কেন ? টাকা তো আমিই দেব ?"

"তাহলে চটপট কাজের কথাটা বলে নাও। আমাদের দেশে টেলিফোন ব্যবস্থাটা এমনই, যে কোন সময় লাইন কেটে যেতে পারে। সুতরাং দরকারী কথাটা আগে সেবে নাও।"

"রোহিণী..."। নীরবতা।

"বলো।"

ওধার থেকে কোন সাড়া এল না। রোহিণী রিসিভার কানে চেপে ব্যগ্র স্বরে বলল, "রাজেন, কি হল ? বলো ?"

"তোমায় ভালবাসি।"

রোহিণীর সারা দেহ অবশ হয়ে এল। বুকের মাঝখান থেকে তুবড়ির রঙিন ঝাড়ের মত একটা আলোর উচ্ছ্বাস তার দেহের প্রতিটি কোষে আনন্দের খবর পৌঁছে দিচ্ছে। এখন সে কথা বলবে কী করে ?

"রোহিণী, কি হল ? কথা বলো ?" উৎকণ্ঠিত স্বর ভেসে এল।

"রাজেন, আবার বলো।' আবেশ জড়ানো বিহ্বল গলা উত্তর দিল।

"তোমায় ভালবাসি।"

"আবার বলো। ... বার বার বলো।"

"বলার জন্যই তো সোজা মাঠ থেকে ছুটে এসেছি টেলিফোন অফিসে। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় লাইন পেলাম। আজ প্রথম দিনে আমরা চার উইকেটে দুশো একাত্তর। তাব মধ্যে আমার..."।

"আহ্ থামলে কেন ?"

টেলিফোন অপারেটর মেয়েটি গড়গড় করে কী যেন হিন্দুস্থানী-ইংরিজিতে বলে উঠল। রাজেন তাকে "প্লিজ কন্টিনিউ" বলল।

"হ্যালো রাজেন...তোমার রান কত ? এই এক বদ্ অভ্যেস তোমার, আসল কথাটা না বলে যত্ত সব আগড়ুম বাগড়ুম শুরু করবে।"

"তোমাকে কি বলে এসেছিলাম ?"

"কি আবার বলেছ !...ওহ্, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কৈলাস মাট্টুর প্রথম ওভারের প্রথম বলেই, ব্যাট নামাবার আগেই...তারপর বোকার মত মুখ করে ফিরে আসছ...তা ফিরে এসেছ তো ? জানি আমি প্রথম বলেই তুমি... ফিরে আসার সময়কার মুখটা দেখতে পেলাম না এই আফশোসটা সারা জীবনের জন্য রয়ে গেল। সারাক্ষণ শুধু অসভ্যতা করার চিন্তা যারা করে, এক মুহূর্তের জন্য যারা সিরিয়াস হতে পারে না, তারা কনসেনট্রেট করবে কি করে ? প্রোগ্রেসিভ রিল্যাকসেসন, পজিটিভ অ্যাফারমেশন—শুধু বড় বড় কথা। সাব কনসাসে ঢুকে আছে তো একটা জিনিসই, রোহিণীর সঙ্গে বাঁদরামো কি করে করব, তারই প্ল্যান।"

"টেলিফোন চার্জ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে।'

"বাড়ুক, আমি দিয়ে দেব। তা প্রথম বলেই না দ্বিতীয় বলে ?"

"শেষ বলে।"

"ওহ্, প্রথম পাঁচটা বল তাহলে মাট্টুকে করতে হয়েছে। একটা দুটো রান করেছ তো, নাকি গোল্লা ?"

"গোল্লা, দুটো গোল্লা।"

"দুটো কেন ? একটা তোমার আর একটা আমার জন্য ?"

"ঠিক একশো করলে, একের পর দুটো গোল্লাই তো বসে !"

"তার মানে !"

"মানে, দিনের শেষ বলে মাট্টুকে স্কোয়ার লেগে ফ্লিক করে, ঠিক গাওস্করের মত, একটা রান নিয়ে নিরানব্বুই থেকে একশোয় পৌঁছে, ড্রেসিং রুমে ফিরে এসে প্যাড খুলে, স্টেডিয়ামের অফিস থেকে ফোন করার চেষ্টা করে, লাইন না পেয়ে, এখানকার একজনকে সঙ্গে নিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে চলে এসেছি শুধু একটা কথাই কলকাতার একজনকে বোঝাতে : রুনি, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"ইউ গট আ সেঞ্চুরি! তুমি, তুমি...রাজেন, রাজেন !"

"অ্যান্ড ইট্‌স ফর ইউ। আমি বলেছিলাম পারব, দ্যাখো পারলাম। ক্লিন অ্যান্ড অনেস্ট, আনব্লেমিশ, স্পটলেস... আমার ভালবাসার মত। দুশো ছত্রিশ বল খেলে মাত্র তিনটে চার, বুঝতে পারছ কি ভাবে নিজেকে অ্যাপ্লাই করেছি। বলেছিলাম, বাজি ধরো, আমি করবই। তুমি ভয় পেয়ে রাজি হলে না বাজী ধরতে, আমাকে তো বিশ্বাসই কর না... এ কি রুনি কাঁদছ, রুনি তুমি কাঁদছ !"

"না কাঁদিনি। আমি ভীষণ শক্ত মেয়ে রাজেন।" চোখ থেকে নেমে আসা জলের ধারা বাঁ হাতে মুছে নিয়ে রোহিণী বলল। "সামান্য তো একটা সেঞ্চুরি, এতেই আমি কাঁদব নাকি ? কত কঠিন পরিস্থিতি আমি ফেস করেছি, আমার জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে, যাচ্ছেও, এক ফোঁটা চোখের জলও আমার পড়েনি। আজই বা পড়বে কেন ?"

"তুমি কি সুখী হয়েছ ? রুনি, শুধু এইটুকুই জানতে চাই। ...কথা বলো, উত্তর দাও।"

গলা থেকে চিবুক হয়ে টপটপ ঝরে পড়ছে চোখের জল। কথা বলার মত অবস্থা রোহিণীর আর নেই। দুটি কাঁধ আবেগ চাপার চেষ্টায় থরথর কাঁপছে।

"সারা দিনে প্রথম কখন তোমাকে মনে পড়ল জান ? শেষ রানটা কমপ্লিট করে স্কোরবোর্ডের দিকে তাকিয়েই দেখি ওখানে তোমার মুখ। তার আগে পর্যন্ত ডেলিবারেটলি তোমাকে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিলাম। শুধু একলব্যর মত আমি কনসেনট্রেট করে গেছি আমার গোলের দিকে। ভাগ্যিস ওটা ছিল দিনের শেষ বল। আর একটা বল খেলতে হলেই আমি অবধারিত বোল্ড হতাম।"

"কেন ?"

"তখন আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারতাম না। পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছিল, কমপ্লিট পাগল।"

"না না।" হঠাৎ রোহিণীর কান্না বন্ধ হয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে এল আতঙ্কমাখা দুটো শব্দ।

"একদম এসব কথা এখন আর ভাববে না। একদম আর ফোন করবে না। কথা দাও।"

"সে কি ! এখনই তো বেশি করে ফোন করব।"

"না রাজেন, না। আমি আর পাগল নিয়ে ঘর করতে চাই না। ওই শব্দটা তুমি আমার কাছে আর উচ্চারণ করবে না। ম্যাচ শেষ হলেই প্রথম যে ফ্লাইট পাবে, তাইতে চলে আসবে।"

"কোথায় আসব ?"

"আমার কাছে।"

"অসম্ভব, এখানে প্রচুর সুন্দরী মেয়ে খেলা দেখছে। গলিতে রাবারের বলের ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করলেই মেয়েরা অটোগ্রাফ চায়, আর আমি তো ফুল সেঞ্চুরি করেছি, অটোগ্রাফ দেবার জন্য ভাবছি দুটো দিন থেকে যাব।"

"এখানে এসে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের রেজিস্ট্রি বুকে আগে অটোগ্রাফ দিয়ে তারপর পৃথিবীর যাবৎ সুন্দরীদের প্রাণভরে অটোগ্রাফ দিয়ো...কন্টিনিউ প্লিজ অপারেটর, কন্টিনিউ...দমদমে নেমেই সোজা আমার কাছে চলে আসবে। এখন ফ্ল্যাটেই সারাক্ষণ আছি, কেননা চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যে ফ্ল্যাটটাও ছাড়ব। তুমি এসো, তখন সব বলব।"

"চাকরি ছেড়েছ ? মনে হচ্ছে গুরুতর কিছু ঘটেছে ?"

রাজেনের কণ্ঠে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। রোহিণীর মনে হল, চাকরি ছাড়ার খবরটা রাজেনকে দিয়ে সে ভুল করল। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের মাঝখানে এটা শুনে, ওর পক্ষে মন লাগিয়ে খেলা আর সম্ভব হবে না। নিশ্চয় নানান রকম আজেবাজে অনুমান শুরু করে সেঞ্চুরি পাওয়ার আনন্দটা নষ্ট করবে। যা সিরিয়াস ছেলে !

"রাজেন, এখনো চাকরিটা ঠিক ছাড়িনি, কিন্তু ছাড়ব ছাড়ব অবস্থায় এসেছি। ঠিক করেছি আর চাকরি নয়, বিজনেস করব। আমি আর কুন্তী...ওহ্‌হ্‌ কুন্তী হল নীচেব সেই ইয়ুপ্পির বৌ, খুব ভাল মেয়ে। প্রস্তাবটা কাল ওই দিল, সল্ট লেকে মেয়েদের জন্য একটা হেল্‌থ ক্লাব খোলার।"

"আমি কি সেখানে ইনস্ট্রাকটারের কাজটা পাব ?"

"না। মেয়েদের জন্য ক্লাব, সেখানে দারোয়ানের চাকরিও তুমি পাবে না।"

"তাহলে নট ইন্টারেস্টেড্ ইন ইওর বিজনেস ভেঞ্চার।"

"তা হবে কেন, তোমার ইন্টারেস্ট তো শুধু—" কথার মাঝে থমকে কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে গলা নামিয়ে রোহিণী বলল, "রাজেন, আমি গভীর সুখে এখন আচ্ছন্ন, আজ আর ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না। তুমি আমাকে আর উসকানি দিয়ো না।"

"তুমি যে সত্যিই সুখী হয়েছ, এইবার সেটা বুঝতে পারলাম, আমাকে ধাতাবার এমন সুযোগ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছ দেখে।"

"দিচ্ছি, তার কারণ তোমার মত মনের উপর এমন কমান্ড, এত ভয়ঙ্কর ইচ্ছাশক্তি আমার নেই। ঝগড়া করে এমন মানুষের সঙ্গে পারা যায় না।"

"রুনি, আজ প্রত্যেকটা রান আমি হৃদয় দিয়ে কালেক্ট করেছি, প্রতিটি স্ট্রোক আমার অন্তর সুখে ভরিয়ে দিয়েছে, এসবই তোমাকে দেব বলে।"

"ওই রানগুলো এনে আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দাও, আমি শরীরে মাখব।"

"বেচারা শোভনেশ সেনগুপ্ত ! তার ব্রাশ যা পেল না, আমার ব্যাট তা পাবে !"

গলা খাঁকারির শব্দে সচকিতে রোহিণী পিছনে তাকাল। তুষার দত্তের পুরো পরিবার তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপ্রতিভ হয়ে সে দ্রুত রিসিভারে বলল, "রাজেন আর নয়, ফোনটা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, এরপর কথা বলব কলকাতায় তুমি ফিরে এলে।

রাখছি, অ্যাঁ, কি বললে ?”

“লোক রয়েছে তোমার পাশে ?”

“হ্যাঁ”

“কত দূরে ? চুমুর আওয়াজ পৌঁছবে ?”

“হ্যাঁ... মানে, না পৌঁছবে না।”

আলতো বুজে এল রোহিণীর চোখের পাতা। সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উষ্ণ আবেশ। এক মিনিট পর “হয়েছে, আজ এই পর্যন্ত থাক্।” বলে রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দিয়ে সে লাজুক মুখে বোকার মত হাসল।

“আপনাদের অনেক অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু কলটা জয়পুর থেকে এসেছে খুব দরকারী একটা ব্যাপারে, তাই একটু সময় লাগল।”

“আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি তো।” নন্দা কথাটা বলেই তার মায়ের দিকে তাকাল। আরতি মাথা নাড়ল। “বুবুল বলল, আন্টি ফোনে কথা বলতে বলতে কাঁদছেন। তাই ভাবলাম, কোন খারাপ খবর হয়তো পেয়েছেন।”

“উল্টো, খুব ভাল খবরই পেয়েছি।” রোহিণী আরও কৌতূহল মেটাবার দায় থেকে রেহাই পেতে দরজার দিকে এগোল। নন্দা তার সঙ্গ নিয়ে দরজার এসে গলা নামিয়ে বলল, “আঙ্কলকে বলেছেন সেইটে আনতে ?”

“ম্যাক্সি ? ঠিক আনবে, ও কথা দিলে কথা রাখবেই।”

“আপনাদের হেলথ ক্লাবে আমি কিন্তু ভর্তি হব।”

“হয়ো।”

“আঙ্কল কি পাগল হয়ে গেছলেন ?”

“হয়নি, তবে ফিরে এসে হবে।”

রোহিণী মিষ্টি করে হেসে নন্দার চুল আঙুল দিয়ে এলোমেলো করে, সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল। নন্দা দরজা বন্ধ করার আগে কান খাড়া করে রইল। ‘ধপাস্’ একটা লাফ দেবার শব্দ পেয়েই, তার মুখে হাসি খেলে গেল।

রাজেনের জয়পুর রওনা হবার আগে তার সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল, রোহিণী তার রোমন্থন করছিল ঘুমের আগে। কথার পর কথা সার দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ সারিটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। কি আশ্চর্য, এটা তো আগেই তার মনে পড়ার কথা। রাজেন বলল ‘সেঞ্চুরি করতে পারব, বাজি ! তাইতে বললাম, বাজি-টাজি নয়, তবে এটা হবে আমার জন্য লটারি। যদি সেঞ্চুরি করো, তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাব, হাসপাতাল থেকে শোভনেশ পালায়নি, ওটা অন্য কেউ।

লটারির ফল কী দাঁড়াল ? রাজেন সেঞ্চুরি করেছে, তাহলে তো শোভনেশ পালায়নি। ওটা অন্য কেউ। এ রকম কি হতে পারে ? বহু সময় তো অদ্ভুত সব কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। ভাগ্য সে মানে না, কোনদিন লটারির টিকিট কেনেনি, জ্যোতিষীকে হাত দেখায়নি, কিন্তু আজব জিনিস তো ঘটতেই পারে। কিছু না ভেবেই সে কথাটা বলেছিল, কারণ অবচেতনে তার এটাই ধারণা ছিল : রাজেন সেঞ্চুরি করতে পারবে না আর হাসপাতাল থেকে পালানো লোকটা শোভনেশই।

অবিশ্বাসের বীজ রোহিণীর মনে পুঁতে দিয়েছে গত কয়েক দিনের ঘটনা। এখন অন্ধকার ঘরে, ঘুম-না-আসা রাতে একমনে ভাবতে ভাবতে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে এল। সেটা ক্রমশ বেড়ে উঠে চারায় পরিণত হল। যতই রাত গভীর হচ্ছে, ততই সে

সন্দেহের সার, যুক্তির জল ঢেলে চারাটাকে বাড়িয়ে তুলল। তার মনে হতে লাগল, খবরের কাগজের ওই কয়েক লাইনের খবরটায় তার ভয় পাওয়া দেখেই গঙ্গাদা সেটাকে কাজে লাগাবার জন্য,' শোভনেশ আসবে, শোভনেশ আসছে, শোভনেশ এসে পড়ল' আব এখন, 'শোভনেশ এসে গেছে' যেন বাচ্চাদের কাছে জুজুর ভয় দেখাবার মতই, মিথ্যেমিথ্যেই এই সব বলে তাকে আতঙ্কের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছেন ? ভয়ের চাপে কোণঠাসা করে সম্পূর্ণতই তাকে গঙ্গাদা-নির্ভর করে তোলার একটা চেষ্টা যেন হয়ে আসছে।

কিন্তু যেই ওঁকে বললাম, শোভনেশ এখন কলকাতায়, কাল দুপুরে আমায় খুঁজতে ফ্ল্যাটে গেছিল, অমনি গঙ্গাদা কেমন করে যেন চমকে উঠলেন। গঙ্গাদা প্রতিটি কথায় অদ্ভুতভাবে রিয়্যাক্ট করেছিলেন। মনে হয়েছিল, রোহিণীকে যেন তিনি টাইম বোমার মত বিপজ্জনক জিনিস বলে ধরে নিয়েছেন। কখন কোথায় কি ভাবে ফাটবে, সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না।

শোভনেশ কলকাতায় এসে গেছে শোনাব পরই গঙ্গাদাকে খুব চিন্তিত দেখিযেছিল। বলেছিলেন, 'এখন তোমার সেফটির কথা ভাবতে হবে।' কেন বললেন ? বোহিণী, তুমি একা থাকো, তুমি বিপন্ন, আনসেফ, অতএব আমার কব্জার মধ্যে এসো ? কোন প্রশ্ন কোর না শোভনেশের আঁকা ছবি, বাড়ি ইত্যাদি সম্পর্কে। টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপাবে খুব সেনসিটিভ মনে হয়েছিল। মাথায় যেন এই চিন্তাই ওঁর ঘুরছিল। চাকরি দিয়েছি কবো, থাকার জায়গা দিয়েছি থাকো, বিয়ে করতে চাও কবো, কিন্তু অন্যরকম কিছু ভাবতে বা করতে চাও যদি, তাহলেই ওই শোভনেশ জুজুকে ধরিয়ে দেব। প্রাণেব ভয় করে না, এমন মানুষ অবশ্যই আছে, গঙ্গাদা আমাকে তাদের মধ্যে রাখার যোগ্য মনে কবেনি। রোহিণী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েও হেসে ফেলল। গঙ্গাদার ভুলটা ভেঙে দেওয়া দরকার। কিন্তু কিভাবে ?

রোহিণী মাথা থেকে একটা বালিশ টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে কাত হয়ে শুলো। এখন এসব ভাবনা তোলা থাক। রাজেন তার জন্য সেঞ্চুরি করেছে, এটা মিথ্যে নয়। কাল সকালেই খবরের কাগজে ছাপা অক্ষরে প্রমাণটা সে পেয়ে যাবে। নিশ্চয় প্রথম পাতাব খবর হবে না, তবে খেলার পাতায় কলকাতার কাগজগুলো নিশ্চয় ফার্স্ট লীড করবে। চব্বিশ পয়েন্ট টাইপটা রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালের পক্ষে খুব ছোটই হবে, অন্তত ছত্রিশ পয়েন্টে ডাবল কলাম...ডাবল কেন তিন কলামই হওয়া উচিত ! জিতলে তো বাংলা সেমি ফাইনালে যাবে। ওখানে কি বছর বছর বাংলা উঠতে পারে ? বাংলা কি বোম্বাই ? রাজেনের ছবি তো নিশ্চয়ই থাকবে। বোকার মত হাসা মুখওয়ালা ছবিটা হয়তো আবার ছাপবে। রোহিণী ভগবানকে ডাকল, রাজেনের অন্য রকম ছবি কালকের কাগজে দেখার আশায়। তার কাছে রাজেনের ভাল কোন ছবি নেই। লাল নিউজপ্রিন্টে ছাপা হলে যাচ্ছেতাই দেখাবে রাজেনকে। কুন্তীরা ইংরিজি কাগজ রাখে, হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা। কাগজটা চেয়ে আনতে হবে ওদের কাছ থেকে। ছবিটা কেটে নিলে ওরা বোধহয় কিছু মনে করবে না। কুন্তীর ক্রাইম ডিটেকশন কতদূর এগোল, সেটা ও জানায়নি এখনো। চটপটে, বুদ্ধিমতী আর উদ্যোগী মেয়ে। নিশ্চয় ভেবে ভেবে একটা কিছু সল্ভ করবে।

সকালে কাগজ পেয়েই রোহিণী খেলার পাতা খুলে খুশি হল। লাল নিউজপ্রিন্ট নয়, বোকার মত হাসা ছবিটাও নয়, ছত্রিশ পয়েন্টের টাইপে তিন কলাম হেডিংয়েই খবরটা রয়েছে। রাজেনের ধৈর্যশীল ব্যাটিং বাংলার ইনিংসকে একদিক থেকে ধরে রেখে যে কি

অসাধারণ উপকার করেছে, তারই ব্যাখ্যানে ভরা রয়েছে লেখাটা। রোহিণী চারবার সেটা পড়ে অন্য পাতায় নজর দিল।

প্রথম পাতায় রাজনীতির কোস্তাকুস্তি, নেতাদের ভাঁড়ামোর আর মিথ্যে কথার জঞ্জাল টপকে ভিতরের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ রোহিণী "একি!" বলে সিধে হয়ে বসল। ডাবল কলাম হেডিংয়ে দুর্ঘটনার খবর: বাড়িওলা-ভাড়াটে সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু। খবরের তলায় ছোট ছোট সাব হেডিংয়ে তিন-চার লাইনে আরও চারটি দুর্ঘটনা আর মৃত্যুর খবর। তারই একটা—অ্যান্টেনা সারাতে গিয়ে মত্যু: পার্কসার্কাস অঞ্চলে বহুতল এক বাড়ির ছাদে টিভি অ্যান্টেনা ঠিক করার সময় সুভাষ গায়েন নামে (৪৯) এক ব্যক্তি পাঁচতলার ছাদ থেকে বাড়ির উঠোনে পড়ে যান। নীলরতন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

॥ আট ॥

খববের কাগজে সুভাষ গায়েনের মৃত্যু-সংবাদ চোখে পড়ার দুদিন পর রোহিণী মিনিবাস থেকে পার্কসার্কাসে যখন নামল, তখন আকাশ থেকে সূর্যালোকের অবশিষ্ট দাগটুকু মুছে নিয়েছে সন্ধ্যা।

এই দুদিন সে ফ্ল্যাট থেকে বেরোয়নি। অপেক্ষা করেছে শোভনেশের কাছ থেকে টেলিফোনের জন্য। আসেনি। ভেবেছে, সুভাষ গায়েনের অপঘাত মৃত্যুটা নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি আর কিছু? সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তবে লোকটিকে যতদূর সে বুঝেছে, তাতে মনে হয়েছে খুবই হুঁশিয়ার। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কোন কাজে হাত দেয় না। নিজেকে ও বাঁচিয়ে চলার কথাটা সবাব আগে ভাবে। টিভি অ্যান্টেনা নিয়ে কাজ করতে হলে, নিরাপদে দাঁড়িয়ে কাজটা করা যাবে কিনা নিশ্চয় সেটা দেখে নিয়েছিল। অবশ্য হুঁশিয়ার লোকেরাও দুর্ঘটনায় পড়ে। কিন্তু এটা যদি দুর্ঘটনা না হয়, তাহলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হল আত্মহত্যা।

রোহিণীর হাসি পেয়ে গেছিল সুভাষের আত্মহত্যার সম্ভাবনার কথাটা ভেবেই। যে লোক টাকার জন্য বৌকে ঠেলে পাঠাতো শোভনেশের কাছে নগ্ন হবার জন্য, ছবি জালিয়াতি করত, সে অন্যকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে, কিন্তু নিজেকে নয়। এরা নিজের জীবন সম্পর্কে খুব ভীরু হয়, নিজেকে নিরাপদ করার জন্য টাকা সংগ্রহের কাজে নির্মম হয়। আত্মহত্যা করার মত কোন কারণ এরা জীবনেও খুঁজে পায় না, যুক্তি দিয়ে আত্মহত্যাকে অনিবার্য করে তোলার মত মানসিক কাজেও এরা অপটু। সুতরাং দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেও রোহিণী বাতিল করেছে।

তাহলে যেটা বাকি থাকে, তাই নিয়েই সে দুদিন খাপছাড়া ভাবে ভেবেছে। খবরের কাগজে জয়পুরের খবর তাকে বিষণ্ণ করেছে কেননা বাংলার ক্রিকেটাররা তাদের চরিত্র বজায় রেখে প্রথম দিনের চার উইকেটে ২৭১-কে দ্বিতীয় দিন সকালে এক ঘণ্টার মধ্যেই দশ উইকেটে ৩২৩ করে ফেলে। রাজেন প্রথম ওভারেই বোল্ড হয় মাট্টুর বলে। রাজস্থান তারপর সাড়ে নয় ঘণ্টা খেলে তৃতীয় দিন চা-এর আধ ঘণ্টা পর নয় উইকেটে ৫৪০ রান তুলে প্রথম ইনিংস ছেড়ে দেয়। ২১৭ রানে পিছিয়ে পড়লে সেই ম্যাচ শেষ দিনে যে জেতা দুঃসাধ্য প্রায়, অন্তত বাংলার পক্ষে, সেটা রোহিণীর মত ক্রিকেট-আনাড়িও বোঝে। খবরের কাগজটা তালগোল পাকিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে সে বিছানায় শুয়ে

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল।

গৌরীর মা কাজ সেরে যাবার সময় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "শরীর খারাপ ?"

"না।"

"তবে শুয়ে আছ যে ?"

"মন খারাপ।"

রোহিণী উঠে বসল। আড়মোড়া ভেঙে চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে চুল খামচে ধরে বলল, "খুব চেনা একজন লোক ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে।"

"সে কি গো ! ছাতে পাঁচিল ছিল না ?"

রোহিণী জানে না পাঁচিল আছে কি না। মনে হয় আছে। এত বড় বাড়িতে কি লোকেরা ছাদে ওঠে না ? ছাদে ওঠার ব্যবস্থা থাকলে পাঁচিলও নিশ্চয় থাকবে।

"পাঁচিল আছে। পাঁচিলে উঠে টিভি-র অ্যান্টেনা ঠিক করছিল, তখন পড়ে যায়।"

"আহা রে ! দ্যাকো তো, কার মরণ যে কখন কি ভাবে হয়, কেউ তা জানে না। আমাদের বস্তির একটা বৌ নারকেলডাঙ্গার কাছে রেল লাইনে কাটা পড়ে মরল রাত্তিব বেলায়। সবাই বলল অ্যাসকিডেন্ট। তার স্বামী এক মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করল। এই বৌটাও রেলে কাটা পড়ল ওই একই জায়গায়। একই রকম অ্যাকসিডেন্ট কি দুবার হয় ?"

"স্বামীটা কেমন ?"

"স্বামী নয়, স্বামী নয় গো, ননদ আছে একটা, খাণ্ডারনী। ভাইয়ের বৌদের সে সহ্য করতে পারে না। তুমি যা ভাবছ, আমরাও তাই ভেবেছিলুম। বোধহয় স্বামীটাই এ সব করেছে। একদিন ভাই-বোনে তুমুল ঝগড়া। আব ঝগড়ার মুখে ভাইটা চেঁচিয়ে বলে ফেলল, 'তুই তো বৌ-দুটোকে মেরেছিস ট্রেনের সামনে ঠেলে দিয়ে, আমি নিজেব চক্ষে দেখেছি। পুলিসকে বললে তোর ফাঁসি হয়ে যাবে বলে আমি বলিনি।' বোঝো কাণ্ড দিদি, বোনকে বাঁচাতে দাদা দু-দুটো বৌয়ের খুনের কথা চেপে গেছে !"

"থার্ড বিয়েটা কবে করল ?"

"জানি না বাপু। ওরা তারপরই বস্তি ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল, সে আজ দু বছর তো হয়ে গেছে।"

গৌরীর মা চলে যাবার পর রোহিণীর চিন্তা অন্য পথে চলতে শুরু করে। খুনেব উদ্দেশ্য এবং কারণ যে কত বিচিত্র আর অদ্ভুত রকমের হতে পারে, মানুষের মন যে কত জটিল, তার খেই পাওয়া শক্ত। এই যে ওপরের সুজাতা গুপ্ত আর হৃদয়রঞ্জন, এরাও একটা জটিল ব্যাপার। গঙ্গাদাও একটা জট পাকানো কাণ্ড হয়ে রয়েছেন। মীনা চ্যাটার্জি তো রীতিমত...রোহিণীর চিন্তা এইখানে এসেই থমকে দাঁড়াল।

সুভাষ গায়েন পড়েছে মীনা চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে। এর মধ্যে সন্দেহ করার কিছু কি থাকতে পারে ? রোহিণী ভেবে দেখল, গঙ্গাদার পাঠানো লোক তাদের ছাদে অ্যান্টেনা লাগাতে এসে যদি নীচে পড়ে যায়, তাহলে কি সে তার জন্য দায়ী হবে ? কেউ কি বলবে, সে লোকটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ? লাখখানেক গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ে মাথা নষ্ট করা লোকও তা বলবে না। সুভাষ গায়েনের পড়াটা তো একটা স্বাভাবিক দুর্ঘটনাই।

এই রকম ভেবেও কিন্তু গৌরীর মা'র বলা একটা কথা তার মনে মাঝে মাঝেই ট্রেনের

হুইশলের মত বেজে উঠছিল : 'ঝগড়ার মুখে ভাইটা বলে ফেলল, তুই তো বৌ-দুটোকে মেরেছিস ট্রেনের সামনে ঠেলে দিয়ে।' রোহিণীর চিন্তা একের পর এক লাইন বদল করে করে এমন একটা জংশনে এসে দাঁড়াল, যেখানে তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। শোভনেশের টেলিফোন না পাওয়া পর্যন্ত সে লাইন-ক্লিয়ার সিগন্যাল পেয়ে এগোতে পারবে না। কিন্তু সেই টেলিফোন কি সত্যি সত্যিই বেজে উঠবে ? অপেক্ষা করে করে টেনশান বাড়িয়ে তোলার থেকে বরং একটু ঘুরে আসা যাক—এই ভেবেই সন্ধ্যার মুখোমুখি সে ফ্ল্যাট থেকে বেরোয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কুন্তীদের দরজার সামনে সে দাঁড়াল। ইতস্তত করে বেল বাজাল।

দরজা খুলে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়া এক বিধবা। কুন্তীর মাস্‌শাশুড়ি, এই ফ্ল্যাটের মালিক।

"মাসিমা, কুন্তী আছে নাকি ?"

"নেই। তিন-চারদিন ধরে সে সকাল নেই, দুপুর নেই বাড়ির বাইরে হুটহুট করে বেরোচ্ছে, যখন খুশি ফিরছে। পল্টু অফিসের কাজে গৌহাটি গেছে আর বৌও এদিকে পল্টুর ক্যামেরা নিয়ে, টেপ রেকর্ডার নিয়ে...কি যে তার কাজ জানি না বাপু। কাঁধে একটা ঝোলা ঝুলিয়ে, এই তোমার মত, হ্যাঁ গো এটা কি এখন ফ্যাশান হয়েছে নাকি ?"

"না না মাসিমা, এতে কাজের জিনিসপত্রই থাকে। কিন্তু হাতে নিয়ে এই ভিড় বাসে চলাফেরাব এত অসুবিধে হয়, তাই এটা... ।"

"তুমি কি এখন বেরোচ্ছ, এই সন্ধ্যেবেলায় ?" মাসিমার চোখেমুখে অনুমোদনের অভাবটা খুবই প্রকট। রোহিণীর মনে হল, তাকে বোধ হয় খুব একটা পছন্দ করছেন না।

"আমার পিসিমা কাল কাশী থেকে ফিরেছেন। খবর পাঠিয়েছেন বিশ্বনাথের প্রসাদী ফুল এনেছেন, তাই মাথায় ঠেকাতে যাচ্ছি।"

প্রৌঢ়া ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড রোহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার বুকের মধ্যে গুবগুব করে উঠল। মিথ্যে কথাগুলো ছাপা অক্ষর হয়ে মুখে ভেসে ওঠে না তো ! তারপরই সে হাঁফ ছাড়ল ওঁর স্মিত প্রসন্ন মুখ দেখে।

"ঠাকুরদেবতায় ভক্তি থাকা ভাল। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে... ।"

"না না মাসিমা, দেরি হয়ে যাবে। সেই পার্কসার্কাসে যেতে হবে।"

হঠাৎই মুখ থেকে পার্কসার্কাস শব্দটা তখন বেরিয়ে এসেছিল. আর সেই মুহূর্তেই রোহিণী স্থির করে, সে মীনার সঙ্গে একবার দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে আসবে।

মিনিবাস থেকে নেমে কয়েক গজ এগিয়ে সে রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়াল। এখান থেকে মীনাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার সদর দেখা যায়। বাড়িটা থেকে এই সময় একটা সাদা অ্যামবাসাডার বেরোতে দেখে সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। গাড়িটা বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে বাঁ দিকে ঘুরল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে, তার সামনে দিয়েই যাবে উত্তরে কিংবা চক্করটা ঘুরে আমির আলি অ্যাভিন্যু দিয়ে যাবে দক্ষিণে, কিংবা সোজা পূবেও যেতে পারে ইস্টার্ন বাইপাস ধরার জন্য।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সারা শরীর শক্ত করে রোহিণী দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার ধারের গাছটায় নিজেকে আড়াল করে। সাদা অ্যামবাসাডারটা দক্ষিণেই যাচ্ছে। চোখের নজরে যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে প্রথমে সে গাড়ির নম্বরটা পড়ে নিয়েই পিছনের সিটে বসা লোকটিকে রাস্তার আলোয় যতটা বোঝা যায়, বোঝার চেষ্টা করে অস্ফুটে বলল, "আশ্চর্য। গঙ্গাদা ওই

বাড়িতে ?”

লিফটের দরজা বন্ধ। দরজার মাথায় লাল অক্ষরে ‘তিন’ সংখ্যাটা জ্বলছে। রোহিণী অপেক্ষা করতে লাগল। পুরুলেন্সের চশমা পরা এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল লিফটে ওঠার জন্য। চোখে প্রায় দেখতেই পায় না, হাতে একটা লাঠি। মুখ তুলে রোহিণীর দিকে তাকিয়ে পরিচিত কেউ কিনা, সেটাই বোধহয় চেনার চেষ্টা করল। দেখে রোহিণীর মায়া হল। সে হাসল বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে।

“আমাকে একটু পৌঁছে দেবে, মা। সিঁড়িতে বাল্‌বটা ভেঙে গেছে, বড্ড অন্ধকার।”

“নিশ্চয় নিশ্চয়, ক’তলায় যাবেন ?”

“চারতলায়, থার্ড ফ্লোর। তুমি কোন্ ফ্লোরে ?”

“সেকেন্ড, তিনতলায়।”

“অহ্‌হ্, সেদিন যিনি মারা গেলেন, সেই ফ্লোব ?”

“হ্যাঁ। আমি ওঁরই ফ্ল্যাটে যাব।”

“ওহ্‌হ্। বড়ো দুঃখের ব্যাপার, স্যাড, ভেবি স্যাড।” বৃদ্ধ মাথা নাড়ল। “বেশ ভাল লোক ছিলেন। কেন যে রাত্রে ছাদে গিয়ে অ্যান্টেনাব লুজ তার ঠিক কবতে গেলেন ! আমি বললুম একটা রাত নয় একটু খারাপ পিকচারই দেখলেন, কাল সকালে বরং ঠিক করবেন। তা উনি শুনলেন না। বললেন, অসুবিধে হবে না, পারব, আগেও কবেছি। তারপর খবরটা শুনে এত খারাপ লাগছে। যদি জোব কবে আটকাতে পাবতাম ওঁকে

রোহিণী সন্ত্রস্ত এবং গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তার হাতেব বোঁযা খাড়া হয়ে উঠেছে।

“আপনার সঙ্গে ঘটনার আগে ওঁর দেখা হয়েছিল ?”

লিফট নেমে এসেছে। দরজা খুলে গেল। বাচ্চা কোলে একটি লোক বেবিয়ে এল। বৃদ্ধ লাঠি ঠুকঠুক করে লিফটে ঢুকল। রোহিণী ভিতরে ঢুকেই তিন নম্বর বোতামটা টিপল।

“আপনি ওঁকে বারণ করেছিলেন ?”

“করবই তো। ওঁদের অ্যান্টেনার রড পাঁচিলেব সঙে লাগানো, আমাদেরটাব পাশেই। তারটা যেখানে লাগানো, সেখানে হাত পৌঁছতে হলে একটা টুলের ওপব দাঁডাতে হবে। উনি তো আর টুলফুল কিছু সঙ্গে নেননি, শুধুই যাচ্ছিলেন। তা হলে তার ঠিক করতে ওঁকে পাঁচিলে উঠতেই হবে। আর পাঁচিলেই উনি ..”

লিফট চারতলায় থেমেছে। দরজা খুলল। বাইরে ল্যান্ডিংটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। রোহিণী হাত ধরে বৃদ্ধকে বাইরে আনল। দরজা বন্ধ হয়ে লিফট নিচে নেমে গেল। এত অন্ধকার যে, চোখ সইয়ে নেবার জন্য রোহিণীকে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল।

“ডানদিকের ফ্ল্যাট। দরজার ডানদিকে কলিং বেলের বাটন।”

বৃদ্ধের কথামত রোহিণী হাতড়ে হাতড়ে কলিং বেলের বোতামটা পেয়ে টিপল।

“তা হলে উনি পাঁচিলে উঠে তার আঁটছিলেন ?”

‘বোধ হয়। আমি তো আর দেখিনি উনি উঠেছিলেন কিনা। এই ঠিক এই জায়গটায় দাঁড়িয়েই কথা বলেছিলাম। কথা বলে আমি ভিতরে চলে যাই।”

“তখন আলো ছিল এখানে ?”

“হ্যাঁ।”

ফ্ল্যাটের দরজা খুলল ফুটফুটে একটি পাঁচ-ছ’ বছর বয়সী মেয়ে। ভিতরের আলো এসে ল্যান্ডিংয়ে একটা চৌকো সাদা কাগজ পেতে দিয়েছে।

"খুব তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল দেবেন ?" একটু শুকনো স্বরে রোহিণী বলল।

"নিশ্চয়। ভেতরে আসুন।"

বলামাত্র রোহিণী ভিতরে ঢুকে এল। বৃদ্ধের কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য সে জেনে নিতে চায়।

"ঠাণ্ডা না গরম জল ?"

"গরম।"

"মিঠু এক গ্লাস জল ফিল্টার থেকে এনে দাও, তোমার ঠাকুমা কোথায় ? টিভি দেখছে ? আচ্ছা তুমি জল এনে দাও...পড়তে বসেছিলে তো ? আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।"

রোহিণী ঘরের আসবাব দেখে বুঝল, বৃদ্ধের প্রথম জীবনে যা কেনা হয়েছে, তারপর আর বিশেষ কিছু সংযোজিত হয়নি। এই বাড়ির পুরনো বাসিন্দা। বোধ হয় বড় সরকারী চাকুরে ছিল।

"বাইরের বাল্‌বটা কখন কেটে গেছে ?"

"কাল, তখনই প্রায়।"

"তখনই মানে ?"

"সুভাষবাবুর সঙ্গে কথা বলে আমি ভিতরে চলে এলাম, আর উনিও উপরে গেলেন। তারপর বোধ হয় দু মিনিট হবে, আমার এই নাতনির প্রাইভেট টিউটর ওকে পড়িয়ে চলে গেলেন। ঠিক সাড়ে সাতটায় উনি ওঠেন। আমি দরজা বন্ধ করতে এসে দেখি ল্যান্ডিং অন্ধকার। রাতে ঝাপসাই দেখি, তার ওপর আলো নেই। দরজা বন্ধ করার সময় মনে হল, ছাদ থেকে কেউ খুব তাড়াতাড়ি নেমে চলে গেল নিচে। আমি ভাবলাম, বোধ হয় সুভাষবাবুই নেমে গেলেন।"

মিঠু জল এনে দিল। এক চুমুকে শেষ করে রোহিণী প্রমাণ দিল, সে সত্যিই তৃষ্ণার্ত ছিল।

"ওঁর নিচে পড়ার আওয়াজ পাননি ?"

"না। পড়েছেন তো বাড়ির পিছন দিকের একটা খোলা জায়গায়। দারোয়ানদের কয়লা-টয়লা থাকে। ওদিকটা এমনিতেই অন্ধকার, কেউ যায়টায়ও না বিশেষ। অন্তত আধঘণ্টা পরে ওঁকে দেখতে পায় আমাদের দারোয়ানের বৌ।"

"তখন সুভাষবাবুর ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না ?"

"মিস চ্যাটার্জি ছিলেন। কেননা দারোয়ান প্রথমে ওঁর ফ্ল্যাটেই ছুটে আসে, আর শোনামাত্র উনি চেঁচিয়ে উঠে নিচে নেমে যান।"

"আধঘণ্টা একটা লোক ফিরছে না ছাদ থেকে, অতক্ষণ তো অ্যান্টেনার তার ঠিক করতে লাগে না।"

"হ্যাঁ, তা লাগে না।"

"তা হলে তো একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। তাই তো কী হল লোকটার ?"

বৃদ্ধ বোধ হয় এত সব আগে ভাবেনি। রোহিণীর কথা শুনে যেন ধাঁধায় পড়ল।

"বাল্‌বটার কি ফিলামেন্ট কেটে গেছে ?"

"না, না, একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। আজও রিপ্লেস করেনি। আমরা পুরনো ভাড়াটে আছি তো, তাই গ্রাহ্যই করে না বাড়িওয়ালা।"

"পুলিস তো এসেছিল, তা আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করল ?"

"আমাকে ?" বৃদ্ধ আকাশ থেকে যেন পড়ল। "শুনেছি এসেছিল। ছাদে গেল, নিচে যেখানে পড়েছিল, সেখানে গেল। যাকে সামনে পেল জিজ্ঞাসা করল। মিস চ্যাটার্জির সঙ্গে বহুক্ষণ নাকি কথা বলল, তারপর চলে গেল। আমার সঙ্গে তাদের দেখাই হয়নি বা তারা কথা বলার কোন আগ্রহই দেখায়নি।"

রোহিণী চেয়ার থেকে উঠল। মীনাকে এখন পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। আর গঙ্গাদা এই বাড়ি থেকে গাড়িতে বেরোলেন, ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন! কার কাছে এসেছিলেন ? মীনার কাছে কি ?

"অনেকক্ষণ আপনাকে বকালাম। এইবার তা হলে আসি।"

রোহিণী নমস্কার করে বেরিয়ে আসার সময়ই ভিতর থেকে একটি তার বয়সী বৌ বেরিয়ে এল। বোধ হয় বৃদ্ধের পুত্রবধূ। অবাক হয়ে সে রোহিণীর দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্ধকার সিঁড়িতে পা টিপে টিপে নামার সময় রোহিণীর মনে হল, বৌটিকে কোথায় যেন সে দেখেছে। মহারানীর অফিসে ? নাকি ইডেন গার্ডেনসের ক্লাব হাউসে ? ভাবতে ভাবতে তিনতলার ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছাল। আলো জ্বলছে।

সে মীনার ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতাম টিপল।

দরজা খুলতে একটু দেরিই হচ্ছে। হবারই কথা, কেননা, রোহিণী ধরেই নিল, প্রথমে আই হোল দিয়ে দেখে নিয়ে কাজের মেয়েটি ভিতরের ঘরে গিয়ে মীনাকে সেটা জানাবে। মীনা ভেবে দেখবে, এখন তার সঙ্গে সে দেখা করবে, না দরজা থেকেই বিদেয় হতে বলবে। তারপর তো মেয়েটি এসে দরজা খুলবে।

দরজা খুলল এবং মীনা দাঁড়িয়ে।

রোহিণীকে অবাক হবার অবকাশ না দিয়েই মীনা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েই দরজা বন্ধ করে দিল।

"কি ব্যাপার !"

"কিছু না, এমনিই।" মীনা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "কোন লোককে দেখলেন ?"

"কোথায় ?"

"লিফটে, সিঁড়িতে, দরজার কাছাকাছি ?"

"না, তো ! কিরকম লোক ?"

"তাহলে দেখেননি।" এক লহমা কি ভেবে নিয়ে মীনা হালকা স্বরে বলল, 'যাকগে, এ সব কথা, বসুন।"

রোহিণী সোফায় বসল। সে ভেবেছিল, মীনাকে মুহ্যমান, বিষণ্ণ বা ওইরকম ধরনের মুখ নিয়ে উদাস চোখে দেয়াল বা মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে দেখবে। অর্থাৎ শোকার্তের ভূমিকায় অভিনয়ের রিহার্সালে মগ্ন থাকবে। সুভাষ গায়েন তার প্রাইভেট সেক্রেটারিই তো শুধু নয়, দিদির স্বামীও। কিন্তু তার বদলে এইরকম ভীত, অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে কেন ?

"খবরটা কাগজে দেখেই মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল।" রোহিণী ধীর, বিষাদমাখা স্বরে শুরু করল। "কয়েক দিন আগে অনিমন্ত্রিত হয়েই অদ্ভুতভাবে এক বিয়েবাড়িতে গিয়ে পড়ি। দেখি, সেখানে উনি রয়েছেন। বললেন তার ভাগ্নির বিয়ে হচ্ছে। জোর করে আমার হাতে খাবার ধরিয়ে দিলেন, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাবার জন্য। মানুষটার মধ্যে ভালবাসা পাবার ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি হয়তো, কিন্তু স্নেহ দেবার জন্য ব্যগ্রতাটা ছিল।

সেদিন ওঁকে খুব তৃপ্ত মনে হল, যখন আমি খাবারগুলো অ্যাকসেপ্ট করলাম।"

মীনা ভাবলেশহীন মুখে কথাগুলো শুনছিল। এইবার বলল, "আপনি বোধহয় সমবেদনা বা ওইরকম কিছু জানাতে এসেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তা শোনার মত মানসিক অবস্থায় আমি নেই। আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার...মাই লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার...কে একজন আমায় থ্রেট্ করছে। মারবে, খুন করবে বলছে।"

"কে ?" রোহিণী টানটান হয়ে ঝুঁকে পড়ল।

"জানি না।"

"কেন ? কি জন্য ?"

"তাও জানি না।"

"কিভাবে থ্রেট্ করছে, ফোনে ? পারভারটেড, ডার্টি মাইন্ডেড লোকের তো অভাব নেই। ফোনে তারা অনেক কিছুই এভাবে বলে।"

"ফোনে নয়, চিঠি দিয়েছে। কাল আর আজ দু-দুটো চিঠি দিয়েছে, দেখবেন ?"

"দেখি।"

মীনা উঠে শোবার ঘরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল দু'টো সাদা কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে। রোহিণী হাত বাড়াল নেবার জন্য। তার হাতে দেবার আগে মীনা বলল, "দরজায় সেলোটেপ দিয়ে আটকে বেল বাজিয়েই পালিয়েছে। আমি দরজা খুলে পেয়েছি।"

"আপনার কাজের মেয়েটিই তো দরজা খোলে।"

"চার দিন আগে বাড়িতে একবেলার জন্য যাবে বলে সেই যে গেছে আজও আসেনি।"

মীনার কথাগুলো ভালভাবে রোহিণীর কানে ঢুকল না কাগজের লেখার উপর মগ্ন থাকায়। একটা কাগজে লেখা : "সুভাষ গায়েনের যে দশা হল, তোমারও তাই হবে। সাবধান। অনেক পাপ জমে উঠেছে।"

অন্য কাগজে লেখা : "এই তো সবে শুরু। একে একে সবাই যাবে। তুমি আছ তালিকার তিন নম্বরে। অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো। আমি আসছি।"

হতভম্ব চোখ তুলে মীনার দিকে তাকানো ছাড়া রোহিণীর এখন আর কিছু করার নেই। সে আর একবার লেখার উপর চোখ রাখল। কাগজ দুটোই রুল-টানা। এক্সারসাইজ খাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া, বল পয়েন্ট রিফিল কলমের কালি। অক্ষরের ধাঁচ থেকে বোঝা যায়, খুব অশিক্ষিত নয় এবং মেয়েলি হাতের লেখা। শুরুতে কোন সম্বোধন নেই, তলায় লেখকের নামও নেই।

"কি বুঝছেন ?" মীনা উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল রোহিণী। "আপনার উপর কেউ ভয়ঙ্কর রেগে আছে, যে মনে করে : অনেক পাপ জমার একটা কারণ আপনি।"

"কি পাপ ?"

"বলা মুশকিল। পৃথিবীতে কোন্ কাজটা যে পাপমুক্ত, সেটা এখনো ভালভাবে জানি না। এক্ষেত্রে আপনি নিজেই খুঁজে বার করুন জীবনে কখন, কোথায়, কি কাজ করেছেন, যেটা পাপ বলে গণ্য হতে পারে। তবে একটাই সান্ত্বনা, আপনি একা নন, আপনার আগে একজন আছে দু'নম্বর। আর এক-নম্বরটা ছিলেন বোধহয় সুভাষবাবু। দু নম্বর যাবে, তারপর তো তিন নম্বর ! হাতে কিছু সময় পাচ্ছেনই। আপনি পুলিশের কাছে যাননি ?"

"না।"

"সে কি? প্রথমেই তো সেখানে যাওয়া উচিত। এইরকম থ্রেটনিং লেটার পেয়ে—।"

"গিয়ে কি লাভ!" মীনার হালছাড়া, ভাঙা গলা অকূল হতাশায় ভেসে গেল। "এই তো সে দিন একটা বাচ্চা মেয়েকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে চিঠি দিল বাবাকে। বাবা লালবাজারে গিয়ে চিঠিটা দিল। ফাঁদটাদ পেতে কিডন্যাপারদের দু'জনকে ধরল বটে, কিন্তু মেয়েটাকে কি পুলিশ বাঁচাতে পারল! অন্যরা খবর পেয়েই মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দিল। না, না, পুলিশে গেলে বিপদ আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে।" চিঠি দু'টো ভাঁজ করে সে সোফার একধারে রাখল।

"আপনি কাকে সন্দেহ করছেন?"

"কাকে যে করব।" মীনা অসহায়ভাবে দু'হাত মুঠো করে কাঠ হয়ে বসে রইল।

"নিশ্চয় কিছু কিছু লোকের মুখ মনে ভেসে উঠছে। ধরুন, আমি যদি আজ এইরকম চিঠি পেতাম—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ যদি পেতেন?"

"প্রথমেই মনে হত 'শোভনেশ', আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নাকচও করে দিতাম। কেন না এইভাবে চিঠিফিটি লিখে ও মানুষ মারবে না।"

"কে বলল, মারবে না? দিদিকে চিঠি লিখে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল! চিঠিটা আগের দিন দিদি আমাকে দেখিয়েছিল।"

"খুন করবে বলেই চিঠি দিয়ে বাড়িতে ডেকে আনার কথাটা মামলার সময় কোর্টে উঠেছিল। এটা আমি জানি। কিন্তু এখন এই দু'টো চিঠিতে আপনাকে ডাকা হয়নি।"

মীনা তর্কের দিকে আর গেল না। ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, "প্রথমেই আপনার মনে হত শোভনেশ? তারপর কার মুখ?"

"সুজাতা গুপ্তের। এঁকে আপনি দেখেছেন কিনা জানি না। বিবাহিত, এক সময় শোভনেশের বাড়িতে নীচের তলায় ভাড়া থাকতেন আর ইনিই ওর প্রথম মডেল। পেশাদার নন, আর্টিস্টকে ভালবেসে ন্যুড হয়ে পোজ দিয়েছিলেন। এখন বয়স ষাটের মত,আমার উপর তলায় থাকেন, শোভনেশের স্মৃতি ভুলতে পাবেননি, এখনো বিশ্বাস করেন, সে নির্দোষ, আর তার বৌকে তিনি এখন ঘৃণা করেন। সুজাতা গুপ্ত আমাকে মুহুর্মুহু খুন করে যাচ্ছেন, যে জন্য চিঠি লেখার সময় করে ওঠা ওঁর পক্ষে খুবই শক্ত।"

"এর পর কার মুখ মনে আসবে?" মীনার প্রশ্নটায় এবার কৌতূহলীর সারল্য নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে যেন রোহিণীর মগজের কাজকর্ম দেখতে চাইছে। তাহলে দেখুক, মনে মনে রোহিণী এই সিদ্ধান্তটা নিল শুধু এটাই বোঝাতে, তার মগজে কিছু দুষ্টু বুদ্ধিও আছে।

"তারপর তিন নম্বরে মনে ভেসে উঠবে আপনার মুখ।"

মুখটা সারল্যে ভরিয়ে রোহিণী কথাটা বলল। প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য চোখে আগ্রহ ফোটাল না। আসলে মনে মনে সে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। মাত্র দু'দিন আগেই একটা লোক বিশ্রীভাবে মারা গেল, যে লোক বছরের পর বছর পাশাপাশি থেকেছে, যে লোক সম্পর্কে বলেছে 'আমার ভালর জন্য সব করতে পারে। বিশ্বস্ত।' সেই লোকটি তার আত্মীয় এবং অভিভাবকও বটে, অথচ সেই লোকের মৃত্যুতে চোখে জল নেই, কোন শোক নেই, দুঃখও নেই। ভয় দেখানো চিঠি পেলে রোহিণীর মনে কী হতে পারে, তাই

জানার জন্যই এখন ব্যস্ত। মীনা চ্যাটার্জি সম্পর্কে সে রূঢ় হয়ে পড়ছে অনেকটা নিজের অজান্তেই।

"ভেসে ওঠার কারণটা জানতে পারি কি ?" অনুত্তেজিত স্বরে মীনা জানতে চাইল। মীনার এই শীতল সংযত ভাবটাই নিমেষে রোহিণীর মাথা গরম করে দিল।

"এর কোন কারণ নেই, এটা নিছকই ইনস্টিংক্ট। যেমন সুভাষবাবুর ছাদ থেকে পড়ে যাওয়াটাকেও আমার ইনস্টিংক্ট বলছে মোটেই দুর্ঘটনা নয়।" কথাটা বলে সে চ্যালেঞ্জের চাহনি পাঠাল মীনার দিকে। দপ করে একবার শুধু জ্বলে উঠল মীনার চোখ। তারপরই শব্দ করে হেসে উঠল মীনা।

"আপনাকে যতটা কাঠখোট্টা মনে হয়, ততটা কিন্তু নন, দেখছি সেন্স অব হিউমার যথেষ্টই আছে। তিন নম্বরে কিনা আমাকেই বেছে নিলেন ?" মীনা আবার হেসে উঠল।

বিলো দ্য বেল্ট হিট করেছে। কাঠখোট্টা শব্দটা যখন অপমান করার জন্য বেছে নিয়েছে, তাহলে তাই হওয়া যাক্। রোহিণী রাগটা চাপতে চাপতে বলল, "শোভনেশ কিন্তু যেচে বাড়ি বয়ে এসে এই কাঠখোট্টাকেই প্রেম নিবেদন করেছিল মিস চ্যাটার্জি। তার রুচির বা সৌন্দর্যবোধের অভাব ছিল, আপনি কি তাই মনে করেন ?"

রাগে থমথমে হয়ে উঠল মীনার মুখ। রোহিণী শ্লথ ভঙ্গিতে বসে, হাতের নখের গড়ন পরীক্ষায় মগ্ন। দুনিয়ায় এখন যেন এইটেই তার কাছে সব থেকে বড় কাজ।

'আপনি চার বা পাঁচ নম্বরের খোঁজ নেবেন না ?"

"তার দরকার নেই। আমার যা জানার, তা জেনে গেছি।"

"কি জানলেন ?"

"আপনি এবার আসতে পারেন মিসেস সেনগুপ্ত।"

কিন্তু গাত্রোত্থানের কোন লক্ষণ রোহিণীর মধ্যে ফুটল না। হাতের নখ দেখার কাজ সেরে সে ঘড়ির ব্যান্ডে নজর দিল।

"আপনার কাছে একটু আগে কেউ এসেছিল ?"

কথাটা শুনে মীনা চমকাল কিনা রোহিণী বুঝতে পারল না। চমকালেই সে আশ্বস্ত হত। তাহলে বুঝতে পারত মীনার মানসিক গড়ন দুর্বল।

"এসেছিল, আর কে যে এসেছিল, মনে হয় সেটা জানেন। কেন এসেছিল, সেটা কিন্তু জানেন না।"

মাথা নেড়ে রোহিণী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল। ভাবখানা, যদি ইচ্ছে হয় তো বলতে পার, তবে জানার জন্যে আমার কোন আগ্রহ নেই।

"খোঁজ নিতে এসেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদবাবু।"

"শোভনেশের ? সে এখানে এসে লুকিয়ে আছে কিনা জানতে ? সুভাষবাবুর ছাদ থেকে পড়ার পিছনে তাঁর কোন হাত আছে কিনা, সেটা বুঝে নিতে ?"

"হ্যাঁ। আপনার অনুমানশক্তি তো দেখছি খুবই প্রখর।"

"এতে শক্তি-টক্তির কোন দরকার হয় না। ব্যাপারটা প্রথম থেকে যেভাবে চলে আসছে তাতে এই অনুমানে যে কেউই চলে আসবে, এমনকি আপনার কাজের মেয়েটিও এইরকম কনক্লুশনে পৌঁছবে যদি তার ঘটে এক ছটাকও বুদ্ধি থাকে।"

"হঠাৎ ওকে কেন এর মধ্যে টানলেন ?"

"ওর বাড়ি চলে যাওয়ার টাইমিংটা একটু অদ্ভুত কিনা। ঠিক তারপরই ওই দুর্ঘটনাটা ঘটল, শোভনেশও টেলিফোন করেছে গঙ্গাদাকে। সে যে কোথা থেকে ফোন করছে,

গঙ্গাদাকে তা বলেনি। আবার আপনি এইরকম দু'টো চিঠিও পেলেন এরই মধ্যে। সবই ঘটেছে মেয়েটি বাড়ি যাবার পর ফ্ল্যাটে যখন আপনি একা রয়েছেন।"

"আমি একাই রয়েছি।" মীনাকে এই প্রথম বিচলিত দেখাল। "আমি সত্যিই একা।"

"সুভাষবাবু ছাদে যাওয়ার সময় চার তলার ল্যান্ডিংয়ে আলো জ্বলছিল। কিন্তু তারপরই কেউ বাল্‌বটা ভেঙে দেয়, আর অন্ধকারের মধ্যে কেউ ছাদ থেকে দ্রুত নেমে এসেছিল।"

"এ সবের কিছুই তো আমি জানি না! আপনি এত কথা জানলেন কি করে?"

"ইচ্ছে থাকলে, চেষ্টা করলে অনেক কিছুই জানা যায় মিস চ্যাটার্জি। আবার কিছুটা ভাগ্যের সহায়তাও পাওয়া চাই। আপনি সেদিন খোঁজ করলেন না কেন সুভাষবাবুর ছাদ থেকে নামতে দেরি হচ্ছে দেখে?"

"আপনি তো দেখছি পুলিশের মত জেরা করতে শুরু করেছেন। আপনাকে কিন্তু আমি চলে যেতে বলেছিলাম। আমার আর একটুও ভাল লাগছে না আপনার সঙ্গে কথা বলতে।"

"চিঠি দু'টো সম্পর্কে কি করবেন? গঙ্গাদাকে এই বিষয়ে কিছু বলেছেন?"

"হ্যাঁ ওঁকে দেখিয়েছি। উনি বললেন, এটা শোভনেশের কাজ।"

"শোভনেশ, যার বয়স এখন ষাট, সে চুপি চুপি তিনতলায় এসে আপনার দরজায় চিঠিটা এঁটে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল বেল বাজিয়েই?"

"অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারে।"

"একজন ফেরারি আসামী, যার হাতে পয়সা নেই, বন্ধুদের কাছে যাবার উপায় নেই, যে লুকিয়ে থাকছে পুলিশের ভয়ে, সে লোক পাবে কোথায় এই কাজ করাবার জন্য?"

"তাহলে কি শোভনকাকা নয়?"

"গঙ্গাদাকে আপনি কতটা চেনেন?"

মীনা ইতস্তত করে বলল, "সামান্যই, তাই দিয়ে একটা লোকের চরিত্র বোঝা সম্ভব নয়। ওঁর আসাটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিতই।"

"সিঁড়ির বাল্‌বটা কি আপনিই ভেঙেছিলেন?"

"এ সব কি বলছেন?"

দু'জনে একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল। মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে তারা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কে আগে চোখ সরায়।

"এই চিঠি দুটো কাকে দিয়ে আপনি লিখিয়েছেন?"

জবাব দেবার বদলে মীনা সজোরে রোহিণীর বাম গালে একটা চড় কষাল। থরথর করে তার শরীর কাঁপছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। রোহিণীর মাথাটা ডানদিকে সামান্য ঘুরে গেছিল চড়ের ধাক্কায়, তবে দেহ একচুলও নড়েনি, গালে বুলোবার জন্য হাতও সে তোলেনি। বার কয়েক শুধু গালের পেশি কুঞ্চিত হল। শান্ত চোখে তাকিয়ে সে বলল, "এতটা কিন্তু আশা করিনি।"

"গেট আউট। দু' হাত তুলে দরজা দেখিয়ে মীনা হিসহিসে গলায় আরও দুবার বলল কথাটা।

"কে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল সুভাষবাবুকে? মিস চ্যাটার্জি গায়ের জোর আর দেখাবেন না, প্লিজ...আমার এই সহজ, সরল প্রশ্নটায় আবার যদি রাগ দেখান, তাহলে কিন্তু কাঠখোট্টা শরীর তাতে ঘোরতর আপত্তি জানাবে। বলুন, কে সুভাষবাবুকে..."

মীনা ছুটে পর্দা সরিয়ে ভিতরে গিয়ে দু'তিন সেকেন্ডের মধ্যেই ফিরে এল ফুট-চারেক লম্বা একটা ছড়ি নিয়ে।

"মেরে বার করব...বেরোবে কিনা বলো, নইলে...।" মীনা ছড়িটা দুহাতে ধরে মাথার উপর তুলল। রোহিণী এক পা পিছিয়ে এধার ওধার তাকাল। চোখে পড়ল হাতের কাছেই দেয়ালে কাঠের ব্র্যাকেটে রাখা পিতলের একটা বুদ্ধের মাথা। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে সে ছোঁড়ার জন্য তৈরি হল।

"যদি আমার গায়ে ছড়ির একটু আঁচড়ও লাগে, তাহলে কিন্তু আপনার মুখ এই বুদ্ধের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হবে। ফিল্ম কেরিয়ারও নির্বাণ লাভ করবে। জেনে রাখুন, আশীর্বাদের ওজন প্রায় এক কিলো হবে।"

মীনা ফ্যাল ফ্যাল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ছড়িটা নামাল। মুখটা ফ্যাকাসে। দ্রুত শ্বাস পড়ছে। চোখে ভয়।

"আপনার হাতটা নামান। এই দেখুন আমারটা ফেলে দিলাম।" মীনা সোফার উপর ছুঁড়ে দিল ছড়িটা। হাসি পাচ্ছে রোহিণীর। মুখ থেঁতলে গেলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার জন্য কেউ আর কনট্রাক্ট নিয়ে সই করাতে আসবে না। মুখসর্বস্ব অভিনেত্রীদের এটাই বোধহয় জীবনের একমাত্র প্রধান সমস্যা—মুখ রক্ষা করা।

রোহিণী বুদ্ধের মাথাটা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রাখল। এগিয়ে এসে মীনার দুই কাঁধ দুই হাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল। লটপট করে উঠল মীনার দেহ। অস্ফুটে তার মুখ থেকে যন্ত্রণায় "আহহ্"-এর মত একটা শব্দ বেরোল।

"কাজের মেয়েটা মোটেই ছুটি নেয়নি, তাকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছেন, যাতে এই ফ্ল্যাটে আপনি ছাড়া আর কেউ না থাকে। কেন?"

"বলব না।"

রোহিণীর দশ আঙুল বাঁকা হয়ে মীনার দুই কাঁধে কুঁকড়ে চেপে বসল। মীনা কাতরে উঠল।

"কাঁধের হাড় দুটো আমি ভেঙে দেব যদি প্রশ্নের জবাব না পাই। কেন একা থাকতে চাইছেন?"

"গঙ্গাপ্রসাদবাবু গত বুধবার টেলিফোন করে বললেন, শোভনকাকা এখন কলকাতায়। কোথা থেকে যেন তাঁকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন সুভাষদা এখন কোথায় আছেন? তখন গঙ্গাপ্রসাদবাবু আমার নাম করে বলেন, মীনার কাছে তার গার্জেনের মত থাকেন। শুনে শোভনকাকা নাকি ওঁকে বলেন, সুভাষদার কাছে ওঁর অনেক নকল ছবি রয়ে গেছে। ওগুলো ডেস্ট্রয় করতে হবে, না করলে তাঁর আঁকা আসল ছবিগুলোকেও লোকে সন্দেহ করবে। ভবিষ্যৎ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা তাহলে দেবে না। আমি গঙ্গাপ্রসাদবাবুকে বললাম, শোভনকাকাকে আমার কাছে আসতে বলুন। আমি ওঁকে লুকিয়ে রাখব, আমি ওঁর নকলছবিগুলো যেভাবেই হোক উদ্ধার করে ওঁর সামনেই পোড়াব। আমি ওঁকে দিয়ে আবার ছবি আঁকাব, যেভাবে উনি আঁকতে চান···নতুন করে যেভাবে আবার শুরু করতে চান··· চার বছর আগে বহরমপুর জেলে আমাকে যা বলেছিলেন, স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, প্রকৃতির ছবি আঁকতে চাই...।"

মীনা শেষ দিকে ফুঁপিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে অবশ হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ছিল, রোহিণী দু'হাতে তাকে জড়িয়ে টেনে সোফায় এনে বসাল।

"তারপর ?"

"গঙ্গাপ্রসাদবাবু বললেন, শোভনকাকা আমার এখানে কিছুতেই আসবেন না, এলেই তো সুভাষদা তাঁকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন। আমি বললাম সে ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি শোভনকাকাকে আমার কাছে আসতে বলুন।"

"সুভাষবাবুর সঙ্গে তারপর আপনি কথা বললেন ?"

"হ্যাঁ। নকল ছবির কথা তুললাম। সুভাষদা বললেন তাঁর কাছে একটাও নেই। দিদি মারা যাবার পরই তিনি এই ব্যবসা তুলে দেন। কিন্তু আমার মনে হল, কথাটা পুরো সত্যি নয়। ব্যবসাটা তুলে দেন ঠিকই, কিন্তু কিছু ছবি রয়েও যায় তাঁর হাতে, সেগুলো কোথায় ? ওঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি শেষে ঝগড়াও হল। আমি সুভাষদাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে বললাম। উনি জেদ ধরলেন, যাবেন না। তারপর..."

"তারপর ?" রোহিণী দমচাপা স্বরে বলল। এতক্ষণে তার যাবতীয় আন্দাজ আর অন্ধকার হাতড়ানো বোধহয় শেষ হতে চলেছে। "তারপর ওঁকে অ্যান্টেনার তার ঠিক করতে পাঠালেন ?"

মীনা একদৃষ্টে বুদ্ধের মাথাটার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বসে রইল। চোখের পাতা পড়ছে না, শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যেন অন্য কোন জগতে তাব মন। রোহিণী অপেক্ষা করতে লাগল পারিপার্শ্বিকের প্রতি ওর সচেতনতা ফিরে আসার জন্য।

"কিন্তু আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন, আমিই ওঁকে *ঠেলে* দিয়েছি ? এটা তো দুর্ঘটনাই। পুলিসও ইনভেস্টিগেট করে তাই বলেছে। সুভাষদা এখন পঞ্চভূতে বিলীন, তাঁর পক্ষেও আর বলা সম্ভব নয় এটা দুর্ঘটনা না অন্য কিছু।"

পৃথিবীতে বহু খুন কাগজে কলমে আনসল্ভড্ থেকে গেছে। এটাও তাই হবে। খুনী কে জেনেও, রোহিণী কিছু করতে পারবে না। করার জন্য কোনরকম উৎসাহ, ইচ্ছা বা তাগিদও আর তার মধ্যে নেই। সে নিজেকে আর এর মধ্যে জড়াতে রাজী নয়।

মীনা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আবেগের একটি ফোঁটাও আর কণ্ঠস্বর থেকে ঝরে পড়ল না। ধীরেধীরে কুটিল ভাঁজ কপালের চামড়ায় জেগে উঠেছে। চাহনিতে আবার পুনর্বাসন পেয়েছে সতর্কতা। মেঝেয় পড়ে গেছিল চিঠি দুটো, মীনা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল।

"এই দু'টো কার লেখা ?"

"আমার নয়।"

"ঠিক বলছেন ?"

মীনা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। "মিথ্যে কথা বলার কোন দরকার আব আছে বলে মনে করি না।"

রোহিণী দরজার দিকে এগোল। এই ফ্ল্যাটে এক মিনিটও আর সে থাকতে চায় না। তার মনে হচ্ছে, আজকালের মধ্যেই সে একটা ফোন পাবে। না, রাজেন নয়। অন্য কেউ। কিন্তু কার কাছ থেকে !

ফ্ল্যাটের দরজাটা টেনে বন্ধ করার সময় রোহিণী ভিতরে একবার চোখ রাখল। মীনা বসে রয়েছে তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে। চিঠি হাতের মুঠোয় দলা পাকাচ্ছে। দরজাটা আবার খুলে রোহিণী ভিতরে একপা ঢুকে বলল, "শোভনেশ আমায় টেলিফোন করতে পারে। ওকে কি এখানে আপনার কাছে আসতে বলব ?...না না, আমি পুলিশ-টুলিসে খবর দেব না।"

রোহিণী কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল উত্তর পাবার জন্য। আড়চোখে দেখল, চারতলা থেকে লিফ্‌টটা নীচে নেমে যাচ্ছে। যাক্, সে সিঁড়ি ভেঙেই একতলায় নামবে। পায়ের ব্যায়ামটা তাতেই যতটুকু হবার হয়ে যাবে।

মীনা একই ভাবে নির্নিমেষে তাকিয়ে।

"বলুন ? ওকে কি তা হলে— ।"

"না। বলবেন না।...ওনাকে আসতে বলবেন না, তাহলে হয়তো উনি মাডারর্ড হতে পারেন।"

"সে কি !" রোহিণী দরজা বন্ধ করে পায়ে পায়ে মীনার সামনে এসে আবার বলল, "এ তো বড় অদ্ভুত কথা। শোভনেশ কেন খুন হতে যাবে ? কে ওকে খুন করতে পারে ? কি উদ্দেশ্য, কোন্ কারণে ?"

মীনা মাথা নাড়ল, সে বলবে না।

"আরে, কথা বলুন।" রোহিণী অধৈর্য, বিরক্ত হয়ে উঠল। "আমার তো ধারণা, ও-ই খুন করতে চায়—আমাকে।"

"উনি আপনার গায়ে আঁচড়টিও দেবেন না।"

"আপনি জানলেন কি করে ?"

মীনা চুপ রইল, অর্থাৎ উত্তর দেবে না।

"ঠিক আছে, নয় নাই বললেন। কিন্তু আমি নিরাপদ নই কেন, সেটা তো বলতে পারেন ?"

"আপনি শুধু শরীরের দিক থেকেই নয়, মেজাজেও আমার দিদির মত। তবে অনেক বেশি স্টার্ডি, স্ট্রং।"

"এইটেই কারণ ? একটা চড় মেরেই বুঝে গেলেন আমি স্ট্রং ? ভাল। আমি যাচ্ছি।"

"শুনুন।"

রোহিণী ফিরে দাঁড়াল। মীনা ইতস্তত করছে, যেন কথাটা বলা উচিত হবে কিনা ঠিক করতে পারছে না।

"আপনি এবার নিঃশব্দে লোকের ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যান। বিয়ে করুন, ঘর-সংসার করুন। ভুলে যান আপনার একটা বিয়ে হয়েছিল, কিছু ঘটনা ঘটেছিল। একটা ফ্রেশ জীবন শুরু করে দিন, এখনো তো তার বয়স আছে !"

শুনতে শুনতে রোহিণীর মনে হল, যেন গঙ্গাদার কণ্ঠই শুনছে।

দুজনের কথার মধ্যে আশ্চর্য একটা মিল, যেন দু'জনে আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছে, রোহিণীকে সরে যেতে বলবে শোভনেশ সংক্রান্ত সব ব্যাপার থেকে। তাকে যেন এরা উটকো, অবাঞ্ছিত একটা উৎপাত বা পথের কাঁটা হিসেবে ভাবছে।

"মিস চ্যাটার্জি, আপনার এই উপদেশটা খুবই উপকারী। শুধু আমার নয়, প্রত্যেক মেয়েকেই এটা প্রেসক্রাইব করা উচিত। আমি আপনার উপদেশ অনুযায়ীই চলব, চলতে চাইও। বিয়ে, ঘরসংসার, ছেলেপুলে—এসবে আমার লোভও খুব। তাই আপনাকে অনুরোধ, আমার হবু মার্ডারারকে একবার যদি বলে দেন, আমার একটুও ইচ্ছে নেই মরার।"

"বিপদ নিয়ে রসিকতা করবেন না মিসেস সেনগুপ্ত।"

"আবার মূল্যবান উপদেশ !"

"ঠিক আছে, আপনি আসুন।"

রোহিণী দরজা খুলে ল্যান্ডিংয়ে বেরিয়েই দেখল লিফ্‌টটা আবার চারতলায় উঠে যাচ্ছে। এখুনি নেমে আসবে। তাহলে দাঁড়ানোই যাক। পায়ের ব্যায়াম নয় হেঁটেই করে নেবে। সে লিফটের বোতাম টিপল।

বিপদ আসছে। রোহিণী ভাবতে শুরু করল, কিভাবে কোথা দিয়ে আসতে পারে। সুভাষ গায়েন তো খারিজ হয়ে গেছে, তা হলে বাকি থাকল—গঙ্গাদা আর মীনা। এই দু'জন একই ধরনের কথা তাকে বলল, এটাই অবাক লাগছে।

মীনার পক্ষে কি সম্ভব সুভাষ গায়েনকে ঠেলে ফেলে দেওয়া ? অত গায়ের জোর কি ওর আছে ? কিন্তু পাঁচিলে দাঁড়ানো ভারী লোককেও হাঁটুর কাছে সামান্য ঠেলা দিলেই ব্যালান্স হারাবে আর সুভাষ গায়েন তো রোগাই ছিল। কেন জানি, এই মেয়েটিকে অবিশ্বাস করতে রোহিণীর মন সায় দিচ্ছে না। কোথায় যেন ওর একটা চারিত্রিক সততা, গভীরতা আছে। নইলে এখনো পর্যন্ত শোভনেশের জন্য—। তার চিন্তার গতি বন্ধ হল নেমে আসা লিফ্‌ট থেমে যাওয়ায়।

লিফ্‌টের ভিতরে সেই চারতলার বৌটি, যাকে দেখে রোহিণীর মনে হয়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি একে। আর এ-ও অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। হয়তো ওরও ঠিক এইরকমই মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন দেখেছি।

লিফ্‌টের কোলাপসিবল দরজাটা বন্ধ করে রোহিণী বলল, "গ্রাউন্ড ফ্লোর ?"

"হ্যাঁ।"

দু'জনে পাশাপাশি চুপচাপ। দোতলা পার হল।

"আপনাকে মনে হচ্ছে যেন চেনা চেনা !"

"আমারও তাই লাগছে।" রোহিণী মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল। লিফ্‌ট গ্রাউন্ড ফ্লোরে থেমেছে। দু'জনে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল।

"আমার নাম রোহিণী সেনগুপ্ত, আমি—।"

"আ-আ-আ, এইবার মনে পড়েছে। আপনাদের বাড়িতে গেছিলাম একটা ছবি কেনার ব্যাপারে। সে প্রায় ছয় কি সাত বছর আগের কথা। দোতলার বড় ঘরটায় আমি, আমার স্বামী আর শোভনেশবাবু কথা বলছিলাম, তখন তিনতলা থেকে নেমে এসে আপনি কী একটা কথা জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন।"

মনে পড়েছে রোহিণীর। স্বামী-স্ত্রী এসেছিল বটে ছবি দেখতে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে তাকিয়ে ওদের দেখেছিল। ছবি কিনেছিল কিনা সে জানে না। শোভনেশ তাকে কিছু বলেনি, সেও আর জিজ্ঞাসা করেনি।

"ছবি কিনেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। ফটকের দিকে এগোতে এগোতে বৌটি বলল, "আমাদের প্রথম ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ছিল। উনি বললেন, তোমাকে ছবি প্রেজেন্ট করব। চলো, পছন্দ করবে। কম দামে বড় আর্টিস্টের ছবি কেনার একটা সুযোগ এসে গেছে, ছাড়া উচিত নয়। শোভনেশ সেনগুপ্ত থ্রো অ্যাওয়ে প্রাইসে ওঁর পেইন্টিংস বিক্রি করছেন খবর পেয়েছি।"

"কোথা থেকে খবর পেয়েছেন ?"

"আমার ঠিক মনে নেই, উনি হয়তো বলতে পারবেন।"

"আপনার স্বামীকে কোথায় পাওয়া যাবে ?"

"বাড়িতে। গড়িয়াহাট রোডে আমরা থাকি। এখানে আমার জ্যাঠামশাইরা থাকেন।

আমার ছেলের অন্নপ্রাশন, তাই বলতে এসেছিলাম। এটি দ্বিতীয় পুত্র। ওহো, এখনো আমি আমার নামটাই বলিনি, আমার নাম পূর্বা ঘোষাল, স্বামীর ছোটখাট একটা লোহালক্কড়ের ব্যবসা আছে, ওঁর নাম চণ্ডীদাস। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন ? তা হলে চলুন না, গাড়ি রয়েছে।"

"আমি থাকি সল্টলেকে। এত রাতে গড়িয়াহাট থেকে ফেরার ট্রান্সপোর্ট পাওয়া শক্ত। সল্টলেক যাব বললেই ট্যাক্সিওলারা মাথা নেড়ে দেয়।"

"ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না, পৌঁছে দেবার ভার আমার।"

"ছবিটা এখন কোথায় ?" রোহিণী জানতে চাইল, চোখেমুখে কৌতূহল মাখিয়ে।

"আমাদের বসার ঘরে। উনি তো বলেন, শোভনেশবাবুর মাস্টারপিসগুলোর মধ্যে এটা পড়ে।"

"ন্যুড ?"

"হ্যাঁ।"

রোহিণী হঠাৎই স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ২৫ দিগম্বর বর্ধন লেনের বাড়িটা চোখের সামনে পলকের জন্য ভেসে উঠল। তুলি হাতে ক্যানভ্যাসের সামনে দাঁড়ানো, শোভনেশের চেহারাটাও মনে পড়ল। সেই ডিভানটা, চৌকো সাদা-কালো মার্বেল টালির মেঝে, গরাদহীন বিরাট বিরাট জানালা, নিমগাছ, ঘরের উঁচু সিলিং, কাঠের কড়ি-বরগা, পর-পর সার বেঁধে চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

"ছবিটা দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"দেখে আসবেন চলুন।" পূর্বা ঘোষাল হাত ধরে রোহিণীকে টানল।

পেভমেন্টের ধারে, একটা জলপাইরঙের, মারুতি অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়াল।

দশ মিনিটের মধ্যে গড়িয়াহাট রোড ছেড়ে বাঁ দিকের একটা রাস্তায় ঢুকে, দু-তিনটে বাঁক নিয়ে ছোট একটা দোতলা বাড়ির সামনে মারুতি থামল। একতলায় বসার ঘরে দু'জন লোক কথা বলছিল। তাদের একজনকে পূর্বা বলল, "দ্যাখো, কাকে ধরে এনেছি। মনে করতে পারবে কি ? অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্য, আধ মিনিট বড়ো জোর, দেখেছিলে।"

লোকটি অবাক মুখে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভ্রূ দুটি একবারই শুধু ওঠানামা করল।

"এনাকে তুমি পেলে কোথায় ! মনে করতে পারব না মানে ?"

লোকটির চোখ, রোহিণীর মুখ থেকে নীচের দিকে নামতে গিয়ে শালীনতার বেড়ায় আটকে গেল। রোহিণীর মনে হল, লোকটি বুদ্ধিমানই, বৌয়ের সামনে কি কি কাজ করতে নেই, সেটা জানে। পরিচয় করিয়ে না দিলেও সে বুঝে গেছে ইনিই গৃহস্বামী চণ্ডীদাস, ছবিটির বর্তমান মালিক। বছর চল্লিশ বয়স, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, খাটিয়ে স্বাস্থ্য।

"উনি ছবিটা দেখতে এসেছেন। জ্যাঠামশায়ের ওখানে, লিফ্‌টে আলাপ হল। আমরা ছবিটা কিনেছি শুনে বললেন, একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"ইচ্ছে হওয়াই স্বাভাবিক। ছবি যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কাছে শোভনেশবাবুর এই ছবিটা বার-বার দেখতে ইচ্ছে করবে।" কথাটা বলে, চণ্ডীদাস চাপা গর্বে উদ্‌ভাসিত মুখটা ফিরিয়ে, বাঁ হাতটা ঘরের একটা কোণের দিকে তুলল। আকারে ঘরটি চৌকো নয়, লম্বাটে। দুধারের দেয়াল ঘেঁসে সোফা, মাঝে কার্পেট, কোন টেবিল নেই। দেয়ালে

আলোর ব্র্যাকেট। রোহিণী ঘরে ঢুকে বাঁ দিকটা লক্ষ করেনি। প্রায় তিরিশ ফুট দূরের কাঁঠালিচাঁপা রঙের দেয়ালে, যে-একটা ছবি সাঁটা রয়েছে, আলোর ব্যবস্থার কারসাজিতে, সেটা এতক্ষণ তার নজরে আসেনি।

রোহিণী পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল ছবিটার দিকে। ওদিকটায় আলো কম। চণ্ডীদাস ব্যস্ত হয়ে সুইচ বোর্ডের দিকে প্রায় ছুটে গেল। সিলিং থেকে জোরালো স্পটলাইট পড়ল, ছবির উপর। রোহিণী থমকে গিয়ে স্তম্ভিত স্বরে বলে উঠল, "একি !"

সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে সম্বৃত করে, ছবির কাছে গিয়ে চোখ সরু করে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে স্বামী-স্ত্রী। ঘরের অন্য লোকটি, সম্ভবত ব্যবসা সংক্রান্ত কাজেই এসেছিল, ইতিমধ্যে বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

"খুব সস্তায়. মাত্র দেড় হাজার টাকায় পেয়েছি। ভাবলে অবাক লাগে !"

রোহিণী পিছনে না তাকিয়েই বলল, "এটা কি আমাদের বাড়িতেই ছিল, নাকি অন্য কোথায় ?"

"আপনাদের বাড়িতে কিছু ছবি দেখিয়েছিলেন শোভনেশবাবু। তারপর বললেন, আরো যদি দেখতে চান, তা হলে অন্য জায়গায় রাখা আছে, সেখানে গিয়েও দেখতে পারেন।"

"গোয়াবাগানে ?" রোহিণী অস্ফুটে বলল। তার প্রথমেই মনে এসেছে সুভাষ গায়েনের কথা।

জবাব না পেয়ে রোহিণী মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। স্বামী-স্ত্রী মুগ্ধ চোখে ছবিব দিকে তাকিয়ে। দেখে তার মায়া হল। নিজেদের বিদগ্ধ, রুচিবান, শিল্পবোদ্ধা, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি বোঝাবার জন্য নামী চিত্রকরের আঁকা ছবি কিনে এনে ঘরে বেখেছে। কিন্তু ছবিটা যে জাল, সেটা আর জানে না। রোহিণীও জানত না, যদি না সে ঠিক এই ছবিটাই কয়েকদিন আগে মীনা চ্যাটার্জীর ঘরে দেখত।

ছবির আসল-নকল বোঝার মত শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তার নেই। কিন্তু সুভাষ গায়েন জানত কোন্‌টে তার কারখানার প্রোডাক্ট আর কোন্‌টে ওরিজিন্যাল। যেখানে বাস করছে, সেখানে কোনমতেই সে লোককে দেখাবার জন্য জাল ছবি রাখবে না। অন্তত নিজের শালী, মীনার ঘরে তো নয়ই।

"গোয়াবাগানে সুভাষ গায়েন নামে একটি লোকের কাছে ওঁব বহু ছবি ছিল। টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনিই কথা বলতেন। কিন্তু এত কম দামে যে দিয়েছিলেন, এটা ভেবে আশ্চর্য লাগছে। সুভাষবাবু তো খদ্দেরদের গলা কাটতে ওস্তাদ ছিলেন।"

"আমি তো গোয়াবাগানে গিয়ে ছবি কিনিনি।"

শুনেই ভ্রূকুটি করল রোহিণী। বলে কি ! নকল ছবি সুভাষ গায়েন ছাড়া আর কার কাছ থেকে তাহলে কেনা সম্ভব। শোভনেশ এদের কোথায় তাহলে পাঠিয়েছিল ?

"তাহলে কার কাছ থেকে কিনেছিলেন ?" খুব স্বাভাবিক গলায় রোহিণী জানতে চাইল।

চণ্ডীদাস কিছু বলার আগেই পূর্বা বলল, "শোভনেশবাবু ওঁর এক বন্ধুর কাছে আমাদের যেতে বললেন। এই যে মহারানী নামে ম্যাগাজিনটা, তারই মালিক। আমরা ফোন করলাম তাঁকে। তিনি আমাদের যেতে বললেন সল্টলেকের একটা বাড়িতে, তিনতলার ফ্ল্যাটে।"

"ম্যা !" রোহিণী নিজের কানকে এমন অবিশ্বাস জীবনে কখনো করেনি, এবং এমন

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এভারেস্টচুম্বী বিস্ময়কে শহিদ মিনারের মাথায় নামিয়ে আনতে তার অসুবিধে হচ্ছে বইকি। "সল্টলেকে ? সি ডি ব্লক ? সেকেন্ড অ্যাভিনুয়ে ? তিন নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে ?"

"বোধ হয়। এখন আর ঠিক মনে করতে পারছি না। আমরা তো ওঁর গাড়িতেই গেছিলাম। সেখানে প্রচুর ছবি ছিল। দুটো ঘরে।"

"কোন লোকজন ছিল না ? মানে সেই ফ্ল্যাটে কেউ বাস করত না ?"

"বয়স্ক একজনকে দেখেছি, কেয়ারটেকারই হবে। বেল বাজাতে সে ভিতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছিল।" পূর্বা বলল।

হঠাৎই রোহিণীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "কমলবাবু বোধ হয়।"

"কমলবাবু। তাই কি ?" চণ্ডীদাস গভীর চিন্তায় ডুব দিল নামটা কুড়িয়ে আনতে। "হতে পারে।"

"হতে পারে কি ?" পূর্বা তার স্বামীকে বিস্মৃতির তলদেশ থেকে টেনে তোলার জন্য বলল, "ওই নামেই তো উনি লোকটাকে ডেকে বললেন, ছবিগুলো দেয়ালের গায়ে সাজিয়ে দাও, এঁরা দেখবেন। তোমার মনে পড়ছে না ?"

কমলদা ' বোহিণী ঢোঁক গিলল। আর কিনা গঙ্গাদার ওই ফ্ল্যাটেই জমা করা ছিল জাল ছবিগুলো ! শো.ভনেশ নিশ্চয় তা জানত। এখন সে ছবিগুলো ধ্বংস করার জন্য এই ফ্ল্যাটে আসতে চাইবে। সে তো আর জানে না, গত ছ' বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। ছবিগুলোর বদলে এখন সেখানে বসবাস করছে কে, সে কথাটা ওকে গঙ্গাদা বলেছেন কি ?

"আপনি বসুন, চা না সফট ড্রিঙ্কস ?"

"শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। মাথাটা কেমন যেন টিপটিপ কবছে। শরীরটা ভাল লাগছে না। আমি কিন্তু এখনি যাব।"

রোহিণী এমন কাতর স্বরে বহু বছর কথা বলেনি। বহু বছর তার নিজের শরীরকে এত অপটু কখনো মনে হয়নি।

এই সরল, যথেষ্ট সচ্ছল, শিল্পপ্রেমী দম্পতিকে রোহিণীর বলতে ইচ্ছে করল না, যে-ছবিটা অত যত্নে, শ্রদ্ধায় শোভনেশের একটা মাস্টারপিস ভেবে ঘরে রেখেছেন, আসলে সেটা জাল। মূল ছবিটা রয়েছে মীনা চ্যাটার্জির ঘরে, যেটা সে রোজ রাতে চোখের সামনে রেখে ঘুমের দেশে পা বাড়ায়।

বড় শিল্পীর স্ত্রীকে বাড়িতে এনেছে, তাকে কিভাবে যে আপ্যায়িত করবে, ঠিক করতে পারছে না ঘোষালরা।

"শুধু জল কি দেওয়া যায়," পূর্বা ঘোষাল দ্রুত বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রোহিণী বুঝতে পারছে তার ভাগ্যে এবার কী আসছে। প্লেট-ভর্তি একগাদা মিষ্টি এবং সেই প্লেট সাফ করে তাকে অন্তত এক কিলো চর্বি সংগ্রহ করতে হবে। করতে হয় হোক, এখানে যদি পূর্বা ঘোষাল তাকে টেনে না আনত, তাহলে অনেক ব্যাপারেই সে অন্ধ থেকে যেত। চোখ খুলে যাওয়ার সাহায্য করার ঋণ শুধতে এক কিলো চর্বি বাড়িয়ে ফেলাটা কোন ব্যাপারই নয়।

কিন্তু মাথাটা সত্যিই টিপ্‌টিপ্‌ করছে। সন্দেহ, শঠতা, ভয়, অবিশ্বাস, চমক ইত্যাদি ব্লাডপ্রেশার ও পাল্‌স রেট বাড়াবার যত রকম উপায় আছে, তার প্রত্যেকটা এখন রোহিণীর সহনক্ষমতা পরীক্ষায় নেমে পড়েছে।

সোফায় দুহাতে কপাল চেপে ধরে রোহিণীকে বসে থাকতে দেখে চণ্ডীদাস বলল, "এতদিন পর ছবিটা হঠাৎ দেখার জন্যই বোধহয়... একটা ইমপ্যাক্ট হয় তো !"

"তাই হবে বোধ হয় ।"

"ওনার তো অনেকগুলো ছবিই তখন দেখেছিলাম, সবই কি বিক্রি হয়ে গেছে ?"

"বলতে পারব না । ছবির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, খবরও রাখি না ।"

"সে কি ! ছবির মালিক তো এখন আপনি ।"

"কিন্তু ছবিগুলো নাকি নষ্ট হয়ে গেছে । যার কাছ থেকে আপনি এই ছবিটা কিনেছেন তিনি ওঁর বন্ধু, নাম গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি । তিনি আমাকে বলেছেন, শোভনেশের সব ছবিই অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে ।

"ইসস্, এখন তো কয়েক লক্ষ টাকা দাম হত ।"

হঠাৎ রোহিণীর মনে হল, এই লোকটির কাছে তার মনের সন্দেহের কথা বোধহয় বলা যায় । বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং সহৃদয়, সব থেকে বড় কথা, শোভনেশের গুণগ্রাহী । একে কোন কাজ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলে সম্ভবত চেষ্টা করবে ।

পূর্বা ঘরে ঢুকল, পিছনে ঝি-এর হাতে ট্রে ।

"না বলবেন না । খুব সামান্যই ।"

রোহিণী প্লেটের দিকে তাকিয়েই বলল, "হ্যাঁ, আমি 'না' বলব না । তবে আমারও একটা অনুরোধ আছে, সেটা রাখতে হবে ।"

স্বামী-স্ত্রী তাকিয়ে রইল । ক্রিকেট-বল সাইজের দুটো মোয়ার একটা প্লেট থেকে তুলে নিয়ে রোহিণী বলল, "শোভনেশের ছবিগুলো আমার মনে হয়, নষ্ট হয়নি । সেগুলো কোথাও, কারুর কাছে রয়েছে ।"

"বলেন কি ?"

"আপনি যেখানে গিয়ে ছবি কিনেছেন, সেই ফ্ল্যাটেই আমি এখন থাকি । আপনি তো অনেকগুলো ছবিই সেখানে দেখেছেন ।"

"নিশ্চয়ই ।" চণ্ডীদাস বলল ।

"আপনি কিন্তু খাচ্ছেন না ।" পূর্বা বলল ।

রোহিণীর মুহূর্তের জন্য সুভাষ গায়েনকে মনে পড়ল । এদের বদলে ওই লোকটা এখন থাকলে স্বচ্ছন্দে সে বলতে পারত, একটা ঠোঙায় ভরে দিন, বাড়িতে গিয়ে সকালে খাব ।

"হ্যাঁ খাচ্ছি ।" রোহিণী কামড় বসাল । অনবদ্য, মনে মনে বলল, নলেন গুড় ব্যাপারটাই অন্যরকম ।

"আমার ছবি আনার কিছুদিন পরই ওই মিসহ্যাপটা ঘটল । তার মধ্যে কি আর উনি অতগুলি ছবি বিক্রি করতে পেরেছিলেন ? মনে হয় না ।" চণ্ডীদাস কথাগুলো বলল ভেবেচিন্তে ।

"আমারও তাই ধারণা । তাহলে ছবিগুলো গেল কোথায়, সেটাই খুঁজে বার করতে হবে ।"

"ওই লোকটার কাছে থাকতে পারে ।" পূর্বা বলল । "তখনই আমার যেন কেমন কেমন মনে হয়েছিল ।"

"তোমার আবার কী মনে হয়েছিল ? কই কিছু তো তখন আমায় বলোনি ।"

"বলার মত মনে হয়নি বলেই বলিনি । আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত যে ছবি, এ

সবই কি ওঁর রিসেন্ট কাজ ? তাইতে লোকটা বলল, প্রত্যেকটাই টাটকা। শোভনেশবাবুর ধারণা, তিনি নাকি শিগগিরই পাগল হয়ে যাবেন। তাই যা কিছু আঁকছেন, সবই তাঁর ওই বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। পাগল হয়ে গেলে খাবেন কি ? সংসার চলবে কি করে ? বন্ধুই তখন ছবি বিক্রি করে ওনার খরচ চালাবে। এই রকম ঘটবেই ভেবে নিয়ে নাকি সারাদিন ধরে উনি ছবি আঁকছেন আর সেগুলো জমা করে যাচ্ছেন। তার দরুনই এত ছবি জড়ো হয়েছে।"

"এত কথা কখন তোমাদের মধ্যে হল ?" চণ্ডীদাস জানতে চাইল।

"তুমি তখন অন্য ঘরে কমল বলে লোকটার সঙ্গে ছবি দেখছিলে। শোন না, তারপর আমি বললাম, শোভনেশবাবুর এমন ধারণা হল কেন যে, তিনি পাগল হয়ে যাবেন ? তাইতে ওই মোটা লোকটা বলল, ওদেব বংশে পাগল হয় প্রতি পুরুষে একজন করে। শোভনেশবাবুর মনে হয়েছে, তিনিও হবেন। অদ্ভুত !"

"কথাটা হয়তো ঠিকই।" চণ্ডীদাস ছবির দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু আবেগ মাখিয়ে বলল, "পাগলামির ছোঁয়া না থাকলে জিনিয়াসদের ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা...মানে সৃজনের, কী বলব... ?

স্বামীকে অসহায় ভাবে কথা হাতড়াতে দেখে পূর্বা বলল, "পাগলরাই ভাল ছবি আঁকে।"

"না, না, তা ঠিক বলছি না। পুরো পাগলরা আঁচড়ানো কামড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। আমি বলছি জিনিয়াসরা এক ধরনের পাগলই হয়।"

"চণ্ডীদাসবাবু", আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্য রোহিণী দ্বিতীয় মোয়াটা তুলে নিল। তাই দেখে খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল পূর্বার চোখ। "শোভনেশের সেই বন্ধুটি খুব বাজে কথা বোধহয় বলেনি। সত্যিই ওদেব বংশে এই রকম একটা ব্যাপার আছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, প্রতি পুরুষে একজন করে পাগল সত্যিই হয়েছে। কিন্তু আমাদের জানার বিষয়, ছবিগুলো এখন কোথায়, কার কাছে। আর সেটা খুঁজে বার করার জন্য আপনাদেব একটু সাহায্য চাইব।"

"আমাদের ! কিরকম ?" চণ্ডীদাস বলল।

"ভাল নয় মোয়াগুলো ? জয়নগরে আমার বাপের বাড়ি থেকে আজ পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"দারুণ, বহু বছর পর এমন জিনিস খেলাম।...না, না, আর পারব না—একটা সূত্র তো পাওয়া গেছে, আপনারা গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জির কাছে প্রচুর ছবি জমা করা আছে দেখেছেন। আচ্ছা, আপনারা যদি ওঁকে বলেন, আবার ছবি কিনতে চান। তা হলে তো আপনাদের নিয়ে যাবেন ছবি দেখাতে ?"

রোহিণী তাকিয়ে রইল দুজনের মুখের দিকে। তার মনে হচ্ছে, ওদের কিছুটা উত্তেজিত করা গেছে।

"আইডিয়াটা মন্দ নয়।"

"যদি আবার কমসমে মাস্টারপিস পাওয়া যায় !" পূর্বা সত্যিই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। "তাহলে আর একটা এনে দিই ?"

"না না, একদম নয়। কি বড় বড় সাইজ ! আবার খেলে রাতে আর কিছু খেতে পারব না।" রোহিণী আঁতকে উঠল।

"তাহলে রাতে আর আজ খেয়ে দরকার নেই।" পূর্বা মোয়া আনতে চলে গেল।

রোহিণী আশ্বস্ত হল। ফিরে গিয়ে আজ আর সেদ্ধ ডিম চিবোতে হবে না।

"ফোন নাম্বারটা জানা থাকলে এখুনিই ওঁকে ফোন করতাম।"

রোহিণীর মুখস্থই আছে গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ির নাম্বার। কিন্তু এঁর কাছে এখন সেটা মুখ থেকে বার করা মানেই বুঝিয়ে দেওয়া : গঙ্গাপ্রসাদকে সে খুব ভাল করেই চেনে, ফোন নাম্বারটা পর্যন্ত মনে করে রেখে দিয়েছে।

"আচ্ছা, ফোন ডাইরেক্টরিতে তো পাব। এক মিনিট।" চণ্ডীদাস ঘরের একধারে ব্র্যাকেটে রাখা টেলিফোনের কাছে গিয়ে তার তলার খোপ থেকে জাবদা বইটা বার করল।

"আগে 'বি'-টা দেখি তারপর 'জি' দেখব।" পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চণ্ডীদাস নাম খোঁজায় মগ্ন হল। রোহিণী আর একবার ছবিটার দিকে তাকাল। সাদা কালো বরফি কাটা পাথরের মেঝেয় উবু হয়ে, দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে, স্তন দুটি উরুতে চেপে নগ্ন মডেলটি বসে রয়েছে। তার দেহের গড়ন নাকি হুবহু তার মতই।

অবাক হয়ে রোহিণী তাকিয়ে থাকল। এই ছবি দেখা মানে তো তার নিজেকেই দেখা। আমি কি এইরকমই ? রোহিণী নগ্ন নারীর প্রতিটি অংশে চোখ বোলাল। নট ব্যাড ! মনে মনে তারিফ করল। মোয়া-টোয়া খেয়ে এমন একটা ফিগারকে নষ্ট করা একদমই উচিত নয়। তবে মোয়া গুড়ের তৈরি, চিনিতেই তো ওজন বাড়ায়।

চণ্ডীদাস ডায়াল করছে। নম্বর তাহলে পেয়েছে। রোহিণীর চোখ-কান সজাগ হল।

"এটা কি গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জির বাড়ি ?...আমার নাম চণ্ডীদাস ঘোষাল। উনি বাড়ি আছেন কি ?...আচ্ছা আমি ধরছি।" মাউথপিসে তালুচাপা দিয়ে চণ্ডীদাস নিচুগলায় রোহিণীকে বলল, "আছে। চাকর ধরেছিল, ডেকে দিচ্ছে।"

রোহিণী উঠে গিয়ে চণ্ডীদাসের পাশে দাঁড়াল। প্লেট হাতে পূর্বা ঢুকল। তাতে মাছ ভাজা।

"আগে এগুলো খান, তারপর..." চুপ করে গেল, রোহিণী তার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে "স স্ স্ স্" শব্দ করায়।

"হ্যালো, নমস্কার, আমার নাম চণ্ডীদাস ঘোষাল,...আমাকে আপনার হয়তো মনে নেই, বছর সাতেক আগে আমি আর আমার স্ত্রী ছবি কিনতে গেছিলাম আপনার কাছে, শোভনেশ সেনগুপ্তর ছবি...অ্যাঁ আপনার মনে আছে ? হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ন্যুড কিনেছিলাম। তা, আমরা ওনার আর একটা ছবি রাখব ঠিক করেছি। হাজার চার-পাঁচের মধ্যে হলে পারব।" চণ্ডীদাস আড়চোখে রোহিণীর দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করল। রোহিণীও মাথা নেড়ে অনুমোদন জানাল।

"বলুন কবে যাব ছবি দেখতে ?"

সারা ঘরে এখন হিচকক ফিল্মের ক্লাইম্যাক্স। পূর্বা আর রোহিণী টানটান হয়ে তাকিয়ে চণ্ডীদাসের মুখের দিকে। সেখানে অভিব্যক্তি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ বদলাচ্ছে।

"তাহলে কি করা যায় ?" চণ্ডীদাস জানতে চাইছে।

ক্লাইম্যাক্সটা আর একটু উপরে উঠল।

"পরশু আবার ফোন করব ? বাড়িতে, এই সময়ে ?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, নমস্কার।"

ফোন রেখে চণ্ডীদাস হাসল এবং গম্ভীর হল।

"কি করা যায় মানে ? ছবি কি আর নেই ?" পূর্বা উদ্বেগ প্রকাশ করল।

"কি করা যায় মানে হল, ছবিটবি আর ওনার কাছে নেই। শোভনেশবাবু সব ছবি নাকি দিয়ে গেছেন একজনকে। তার নাম উনি বলতে রাজি নন। তবে তাকে উনি জিজ্ঞাসা করবেন, ছবি বিক্রি করতে রাজি আছে কি না। আমাকে বললেন, পরশু ফোন করে জেনে নিতে।"

"তার মানে ছবি তাহলে রয়েছে। কিন্তু কার কাছে, কোথায় রয়েছে, সেটা জানার জন্য পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাই তো?" রোহিণী কথা বলতে বলতে পূর্বার হাত থেকে প্লেটটা নিল। বড় আকারের চারটে পার্শে মাছ ভাজা।

"এ কিন্তু খুব অন্যায়, এতগুলো ভাজা কি খাওয়া যায়?" মিষ্টির পর এই তেলে ভাজা মাছ। তেলও তো চর্বি তৈরি করে। কি যে মুশকিলে পড়া গেল। রোহিণী বিরক্ত হল নিজের উপর। এইসব খাবার জিনিস তার চোখের সামনে ধরে দেওয়া কেন! জিনিয়াসের স্ত্রীকে খাতির করা?

"বসুন তো, আপনি বাচ্চাও নন, বুড়িও নন। মোটে তো চারটে!" পূর্বা হাত ধরে তাকে সোফায় বসিয়ে দিল।

"যদি মিস্টার ব্যানার্জি বলেন, হ্যাঁ ছবি আছে বিক্রির জন্য, দেখতে আসুন, তাহলে?"

"তাহলে দেখতে যাব, পছন্দ হলে কিনেও নেব। তুমি তো চার-পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম দিতে রাজি হলে।"

"ওটা তো একটা টোপ দিলাম।"

"সত্যি সত্যি নয়!" পূর্বা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে, ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠল। রোহিণী অস্বস্তি বোধ করে ভাবল, বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করবে। পূর্বা তাহলে ব্যস্ত হয়ে জল আনতে ছুটবে। সে বার দুই খুক খুক্ করেছে মাত্র, তখনই চণ্ডীদাস বলল, "চার পাঁচ কি, দশ পর্যন্ত দেব যদি এইরকম পছন্দের একখানা পেয়ে যাই।"

পূর্বার মুখ দেখে রোহিণী বুঝল, আর তার বিষম খাবার দরকার নেই। চণ্ডীদাস সত্যিই বুদ্ধিমান লোক। পছন্দ হওয়া বা না হওয়া পর্যন্ত তার দশ হাজার টাকার অফারটাকে সে টিকিয়ে রেখে যাবে।

"যদি ছবি দেখতে যেতে বলেন, তাহলে আপনারা অবশ্যই যাবেন। জায়গাটা কোথায় সেটা জেনে নেওয়া দরকার। তার থেকেও বড় কথা, ছবিগুলো এখন কার হেফাজতে রয়েছে?" রোহিণী দ্বিতীয় ভাজাটা মুখের কাছে থামিয়ে, কথাটা বলেই, কামড় দিল।

"আপনি কি মনে করেন ছবিগুলো কেউ চুরি করেছে?"

"আমি কিছুই মনে করি না। তবে নানান ধরনের কথাবার্তা কানে আসছে, ঘটনাও কিছু ঘটছে। আপনারা তো জানেনই শোভনেশের কেন যাবজ্জীবন হয়েছে। ওর বহু ছবিই—"রোহিণী থেমে গেল। জাল হয়েছে বলে ফেলেছিল আর কি! "কে যে নিয়ে গেল সেই সময়।"

আর খেতে ইচ্ছে করছে না। রোহিণী উঠে দাঁড়াল। "পারছি না আর। শরীরটা সত্যিই ভাল নেই। বেসিনটা কোথায়?"

"না না, ভাল না লাগলে দরকার নেই খাওয়ার। এদিকে বেসিনটা।" চণ্ডীদাস ব্যস্ত হয়ে ঘরের পিছনের দরজায় এগিয়ে গেল।

গাড়িতে ওঠার সময় রোহিণী বলল, "আমি পরশু রাতে এই সময় ফোন করে জেনে নেব, মিঃ ব্যানার্জি আপনাকে কী জানালেন।"

"হ্যাঁ, তাই করবেন।" চণ্ডীদাসের সঙ্গে পূর্বাও নমস্কার জানাল।

পার্কসার্কাস থেকে ডান দিকে ঘুরে মোটর ইস্টার্ন বাইপাস ধরে যখন সল্ট লেকের দিকে যাচ্ছিল, তখন রোহিণী চিন্তায় ডুবে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। তার কাছে সব থেকে অবাক লাগছে, শোভনেশের ছবিগুলো কিনা এই ফ্ল্যাটেই ছিল আর সেখান থেকে বিক্রিও হত।

এর পর সে মীনা চ্যাটার্জির কথা ভাবল। বাঁ হাতটা আপনা থেকেই গালের দিকে উঠে গেল। বেশ জোরেই মেরেছে। বড়োই আচমকা চড়টা এল, একটু আগে আন্দাজ পেয়ে গালের মাস্‌ল শক্ত করে ফেললে এতটা লাগত না। রোহিণীর এখন মায়া হচ্ছে মীনার জন্য। ওকেই সুভাষ গায়েনের খুনী প্রতিপন্ন করার জন্য সে যা কিছু বলেছে, সবই তো আন্দাজে। আসলে ওকে চটিয়ে দিয়ে কিছু কথা বেরোয় কিনা সেটাই দেখতে চেয়েছিল। চিঠি দুটোর হাতের লেখা ওর কাজের মেয়েটির নাও হতে পারে, সিঁড়ির বাল্‌বটা মীনা নাও ভাঙতে পারে, সুভাষ গায়েনকে সে পাঁচিল থেকে নাও ঠেলতে পারে—রোহিণী মাথা নাড়ল। আন্দাজগুলোকে সে টেনে লম্বা করার কাজটা একটু বেশিই করে ফেলেছিল, যে জন্য—সে গালে হাত বুলোল।

মীনার সন্দেহ, সুভাষ গায়েন ছবি জাল করার কারবার তুলে দিয়েছে বললেও, হাতে কিছু ছবি রেখে দিয়েছিল। সেই ছবিগুলো, এখন কোথায়? ওগুলোর খবর কি গঙ্গাদা জানেন না? হয়তো জানেন না, তাই হয়তো আজ মীনার কাছে এসেছিলেন খোঁজ করতে।

আর ওই চিঠি দুটো! কে এভাবে ভয় দেখাল মীনাকে? শোভনেশ নয়। যদিও বয়ান থেকে মনে হবে, সেই। মৃত্যু তালিকার তিন নম্বরে মীনা। এক নম্বর ছিল সুভাষ গায়েন। তাহলে দু নম্বরে কে? এভাবে চিঠিফিঠির কথা চিপ ডিটেকটিভ গল্পেই পাওয়া যায়। কিন্তু মীনাকে সত্যিই কেউ দিয়েছে। নইলে সে বলল কেন, কেউ ভয় দেখাতে চেয়েছে। ভাল। দেখাক। আমিও তা হলে দেখে নেব।

গাড়ি স্টেডিয়াম পেরিয়ে গেল। রোহিণী সোজা হয়ে বসল। এবার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাড়ি পর্যন্ত। রাস্তার আলোয় সে হাতঘড়িতে সময় দেখল, পৌনে দশটা।

বাড়ির গেটের সামনে তুষার দত্তর গাড়িটা দাঁড়িয়ে। তার পিছনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রোহিণী নামল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তুষার দত্ত, সঙ্গে এক বৃদ্ধ দম্পতি।

"এখন ফিরছেন বুঝি! আমার কাকা আর কাকিমা, পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।"

"অ।"

"আপনার একটা ফোন এসেছিল।"

"ফোন? কে করেছে?"

"নাম বলল না। আপনি নেই শুনে বলল, পরে আবার করবে।"

"পরে মানে আজকেই কি?"

"তাও কিছু বলল না, ঝপাত করে রেখে দিল। এই লোকগুলোকে নিয়েই হয় মুশকিল, এমন আধাখ্যাঁচড়া করে রাখবে ব্যাপার, এখন আপনি বসে থাকুন ফোনের জন্য। তবে যত রাতেই আসুক, আমি আপনাকে ডেকে আনব।"

"ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন।"

"ওহ্‌, হ্যাঁ...কাকা গাড়িতে উঠুন, দাঁড়িয়ে কেন?"

"আপনিও উঠুন, নইলে চালাবে কে ?"

"হ্যাঁ উঠছি। আপনার বাঁ গালে একটা লালচে ভাব দেখছি, ধাক্কা-টাক্কা লেগেছিল নাকি ?"

"হ্যাঁ, একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল। ইয়া চেহারা ! কি শক্ত মাসল ! বোধহয় বডিবিল্ডার।"

"আপনি সঙ্গে সঙ্গে চড় কষালেন তো ?"

"পাগল, তাহলে আমার হাতটা ভেঙে যেত।"

"না না, আপনার এটা ভুল ধারণা। আপনি আমাকে মেরে দেখুন। শরীরটা ফুলের মত নরম করে চড়টা অ্যাবসর্ব করে নেব।"

"আচ্ছা, পরে এটা করে দেখব। ওনারা গাড়িতে বসে আছেন।"

রোহিণী হাসি চেপে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে, তখন দোতলার অন্ধকার বারান্দা থেকে কুন্তী ডাকল, "রুনিদি।"

মুখ তুলে সে তাকাল। "খবর কি তোমার ?"

"একবার আসুন না।"

এক সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে রোহিণী দোতলায় উঠে এল। বেল বাজাবার আগেই দরজা খুলল কুন্তী।

"এই কদিন তোমার তো টিকিটিও দেখতে পেলাম না। করো কি সারা দিন ? কর্তা নেই বলে—"

কুন্তী ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চোখ বিস্ফারিত করল। "মাসিমার কাছে ঝাড় খেয়েছি, আবার আপনিও।"

"বলবেনই তো। বাড়ির বৌ, স্বামী এখন বাইরে, আর তুমিও সারা দিন বাইরে যদি ঘুরে বেড়াও তাহলে কি শাশুড়িরা বরণডালা নিয়ে অপেক্ষা করবে ? এই সেদিন বাস থেকে দেখলাম তুমি বৌবাজারের দিকে হেঁটে চলেছ। যাচ্ছিলে কোথায়, গহনা কিনতে ?"

"যাচ্ছিলাম মিস্ট্রি সলভ করতে দিগম্বর বর্ধন লেনে।"

"অ্যাঁ !" রোহিণী বোকার মত তাকিয়ে রইল।

"যা একখানা জিনিস আমায় গছিয়েছেন। ওসব কি বাড়িতে বসে ভেবে ভেবে সল্‌ভ করা সম্ভব ? আপনার কাছে যতটুকু শুনেছি আর লেখাটা থেকে যতটুকু পেয়েছি, তাতে মনে হল ব্যাপারটা শুধুই মাথার নয়, গতরেরও। তাই চলে গেলাম বাড়িটা দেখতে।"

"বলো কি ! তুমি ওই বাড়িতে গ্যাছো ?

"আস্তে, আস্তে।" ভিতরের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে কুন্তী বলল, "এখন টিভি দেখছেন। ওহ্ আপনার কি প্রশংসা আজ। ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি তো দেশ থেকে উঠেই গেছে। তবু দু একজনের মধ্যে এখনো আছে, তার মধ্যে আপনি একজন। প্রথমে আপনাকে দেখে যা ভেবেছিলেন, এখন দেখছেন মোটেই তা নন। বিশ্বনাথের প্রসাদী ফুল নিতে ছুটেছে, কত লক্ষ্মী মেয়ে ! ব্যাপার কি রুনিদি ? জপালেন কিসে ?"

"জপতপ পরে হবে, আগে বলো সেখানে কি হল ? কি দেখলে ?"

"দেখলুম, শুনলুম, বুঝলুমও। আমি ছবি তুলেছি, টেপও করেছি। কিছু কিছু নোটস করে রেখেছি। সাজিয়ে লিখে আপনাকে দোব। ছাপিয়ে দেবেন তো ?"

"আগে দেখি তো লেখাটা, তারপর ছাপানোর কথা ভাবা যাবে। সেখানে কি শুনলে,

দেখলে ?”

“এখন এখানে দাঁড়িয়ে অত সব তো বলা যাবে না। আপনাকে কাল গিয়ে বলব। তা ছাড়া আরো দু'-একদিন যেতে হবে। আচ্ছা, গঙ্গাপ্রসাদ আর তার বৌ তো মোমিনপুরে থাকে, তাই না ? বাসুদেবপুর বলে একটা গ্রামে ওদের তো একটা বাড়িও আছে ? সেখানে কখনো গেছেন ?”

“না।”

“শোভনেশ সেনগুপ্ত ওখানে কিছুদিন ছিলেন, তাই না ?”

“হ্যাঁ, বিয়ের আগে।”

“ওঁর ভাই পরমেশ থাকে বৌবাজারের বাড়িতে। তাকে শেষ কবে দেখেছেন ?”

“বছর ছয়েক আগে।”

“তারপর আর ওখানকার কোন খবরটবর বোধহয় রাখেন না।”

“একদমই নয়।”

“দিন তিনেক আগে একজন সুন্দরী প্রৌঢ়া সন্ধ্যেবেলা ঘোমটায় মুখ ঢেকে এসেছিল মোটরে, পরমেশের সঙ্গে কথা বলে গেছে। কে এসেছিল সেটা জানতে হবে।”

“শুনেছি, পরমেশ নাকি এখন পাগল হবার মত অবস্থায়। চোখে ভাল দেখতে পায় না, কঙ্কালের মত চেহারা, মাথায় চুল নেই, গায়ে চুলকুনি।”

“এই তো দেখছি খবর রাখেন।”

“এটা কি রাখার মত একটা খবর নাকি ! কানে এল, তাই মনে আছে।”

“কে আপনার কানে খবরটা দিল, জানতে পারি কি তার নাম ?”

“বললে কি চিনতে পারবে ? তার নাম সুজাতা গুপ্ত।”

কুন্তী ঠোঁট কামড়ে সেকেন্ড পাঁচেক ভেবে বলল, “নাহ্, চিনি না।”

খুব মেলামেশা না থাকলে এই রকম ফ্ল্যাট বাড়িতে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাদের নাম জানা সম্ভব নয়। মাসিমা কাকিমা হয়েই তারা রয়ে যান। রোহিণী নিজেও কি আগে জানত, ওনার নাম সুজাতা !

“এর কথা তোমায় আগে বলিনি। তবে বলব। একটা সায়কোলজিক্যাল কেস, তেমনি মীনা চ্যাটার্জিও। ইনি ফিল্ম অ্যাকট্রেস। দুজনেই শোভনেশকে চেনে জানে। ওর জীবনের প্রথম ন্যুড মডেল সুজাতা। আর মীনা হল বীণার বোন।”

“এদের কথা আগে আমায় বলেননি !” কুন্তী আক্ষেপ করল। তাহলে দেখা করে কথা বলতাম। ওহ্হ্ ফিল্ম অ্যাকট্রেসের সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছে যে কতদিনের !

“তুমি এই কদিন ধরে মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে আদাজল খেয়ে সিরিয়াসলি নেমে পড়েছ, ভাবতেই পারছি না !”

“আমাকে কী ভেবেছেন আপনি ! অপদার্থ, অকর্মা, আদুরে, ছেলেমানুষ, বোকা...।”

“থাক্ থাক্ তালিকাটা আর লম্বা কোর না। তোমাকে আমি ওই কথাগুলোর ঠিক উল্টোটাই ভাবি, তার সঙ্গে আরও একটা—পাগলী। রহস্য উদ্‌ঘাটন যদি করতে পার, প্রমিস করছি, তাহলে আমি তোমার দশ কেশি ওজন বাড়াবার ব্যবস্থা করবই। এখন চলি, কাল তাহলে আসছ, আমি সারাদিনই থাকব।”

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রোহিণী ভাবল, কে আবার ফোন করল ? গঙ্গাদা ছাড়া আর আছে রাজেন। জয়পুরে আজ খেলার শেষ দিন। সেখান থেকে ফোন করতে পারে, নাও পারে।

নিজের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে তাকিয়েই সে থমকে গেল। পাল্লার নীচের দিকে একটা সাদা কাগজ সেলোটেপ দিয়ে আটকানো।

কাগজ নয়, চারভাঁজ করা একটা চিঠি। টেপের আঠা থেকে চিঠিটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে ভাঁজ খুলল। কোন সম্বোধন নেই। শুধু লেখা : "এক নম্বর সুভাষ গায়েন, দু নম্বরে তুমি, তিন নম্বরে মীনা চ্যাটার্জি। তোমরা আবর্জনা। সব সাফ করব। আমি আসছি।"

ভ্রূ কুঁচকে রোহিণী চিঠিটা আবার ভাঁজ করে চাবি দিয়ে দরজা খুলল। আলো জ্বেলে ঘরের চারধারে চট করে চোখ বোলাল। একটু যে গা ছমছম করছে না, এটা সে অস্বীকার করবে না। যে কোন সময় এমন একটা হুমকি পেলে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠবেই। অবশ্য প্রথম ধাক্কাটা মীনার ওখানেই লেগেছিল। তবে মীনার মত কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছা তার হল না। হাতের লেখা দেখেই তো সে বুঝে গেছে, একই হাতে তাকে আর মীনাকে লেখা।

ঝোলার মধ্যে কাগজটা রেখে সে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল পা ঝুলিয়ে। এখন মাথার মধ্যেটা একদম সাদা। অন্ধকার সিনেমা হলে ছবি শুরু হবার জন্য প্রতীক্ষারত উন্মুখ দর্শকদের মত তার অবস্থা। কে একজন ফোন করেছে, কে একজন চিঠি দিয়েছে—কিছুই ভাব করার নেই। শুধু অপেক্ষায় থাকতে হবে। প্রোজেক্টর থেকে মাথার উপর দিয়ে তীব্র আলোক রশ্মি গিয়ে সাদা পর্দায় না ফেলা পর্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে জাগবে না।

বেল বাজল। রোহিণীর মনে হল, এইবার বোধহয় শো শুরু হতে যাচ্ছে। দরজা খুলতেই বুবুল। হাতে একটা ফোন নম্বর লেখা চিরকুট।

"এখান থেকে একটু আগে ফোন করেছিল। বলল, আপনি ফিরেই যেন এই নম্বরে ফোন করেন।"

নম্বরটা গঙ্গাদার বাড়ির ফোনের। রোহিণী ব্যস্ত হল না। চাবিটা হাতে নিয়ে সে মন্থর পায়ে উঠে এল।

গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ির ফোন নম্বর ডায়াল করে দু-তিন সেকেন্ড পরই রোহিণীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। "হ্যালো" বলে ফেলেছিল প্রায়! শব্দটা জিভের ডগা থেকে ফিরিয়ে এনে সে রিসিভারটা কানে চেপে ধরল। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে না পায়, এই ভেবে সে নিশ্বাসও বন্ধ করে রইল।

"রোহিণী এসেছিল আমার কাছে।"

"অ। তা কি জন্য? কি বলল?"

"সুভাষদার জন্য শোক সমবেদনা জানাতে। ওর সন্দেহ : আমিই ছাদ থেকে সুভাষদাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি।"

রোহিণী বন্ধ করে রাখা শ্বাস ফেলতে গিয়ে থমকে গেল। মীনা রিপোর্ট করছে গঙ্গাদাকে।

"ভাল, এই ধারণাটাই করুক।"

তার মানে? রোহিণী বিভ্রান্ত হল। এই ধারণাটা করুক মানে কি? তাহলে মীনা নয়, অন্য কেউ ঠেলেছিল!

"আপনাকে ও দেখেছে আমার কাছে আসতে।"

"সে কি? কখন, কিভাবে দেখল?"

"হয়তো আপনাকে এই বাড়িতে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে। আপনি চলে যাবার

পরপরই ও এলো। ওর ধারণা, শোভনকাকা এখানে লুকিয়ে আছে কি না জানতেই আপনি এসেছিলেন।"

"ভাল, এই ধারণাটাই যেন ওর থাকে। আর কিছু ?"

আবার ওই ধারণা! রোহিণীর মনে হল, এদের দুজনের মধ্যে যেন কোন একটা চুক্তি হয়েছে কোন এক ব্যাপারে। তার মনে ভুল ধাবণা থাকুক এটা ওরা চায়।

"ওকে চিঠি দুটো দেখালাম।"

"কি বলল দেখে ?"

"ওর বিশ্বাস : চিঠি দুটো আমিই কাউকে দিয়ে...আমার কাজের মেয়েটাকেই সন্দেহ করছে, তাকে দিয়েই লিখিয়েছি ধরে নিয়েছে।"

"আরো ভাল।"

রোহিণী বুঝল, চিঠিটা তাহলে অন্য কারুকে দিয়ে লেখানো। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। শুধু একটা জিনিস জানা গেল, মীনাকে জানিয়েই চিঠিটা তাকে দেওয়া হয়েছে। ওটা একেবারেই ভেজিটেবল মার্কা হুমকি !

"আমি বলেছি, চিঠি দুটো আপনাকে দেখিয়েছি। দেখে আপনি বললেন, শোভনেশের কাজ।"

"হুম্।"

"কিন্তু রোহিণী তা বিশ্বাস করেনি।"

"করেনি ?" কিছুক্ষণ চিন্তাগর্ভ নীরবতা। "কেন ? অবিশ্বাসেব কারণ ?"

"শোভনকাকার পক্ষে এভাবে চিঠি লিখে দবজায় আটকে দিয়ে যাওয়াটা, ওব মতে অসম্ভব। এটা আমাব নিজেরই কাজ বলে সন্দেহ কবেছে।"

"এখন আর তা করছে না। বাড়ি ফিবেই বোহিণী ইতিমধ্যে এই বকম একটা চিঠি পেয়ে গেছে।"

যাক, ব্যাপারটা পবিষ্কার হয়ে গেল। কাজটা তাহলে গঙ্গাদাবই। বোহিণী মুখটা রিসিভার থেকে পাশে ঘুরিয়ে নিশ্বাস ছাড়ল। আমাকে ভয পাওযাতে চেয়ে এত কাণ্ড !

"গঙ্গাবাবু, চাবদিন ধরে আমি অপেক্ষা কবছি। আপনি বললেন, সুভাষদা যেখানে আছে শোভনকাকা সেখানে আসবেন না। কিন্তু সুভাষদা তো আব..।"

"আহ্‌হা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। শোভু আব তো ফোন কবেনি, কবলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তোমার কাছে ওব আঁকা কতগুলো ছবি বয়েছে, সেটা কিন্তু আজও আমায় তুমি বললে না।"

"বিশ্বাস করুন, একখানা ছবিও আমার কাছে নেই।"

মিথ্যে কথা। রোহিণী ভাবল, একখানা তো আমি নিজেই দেখেছি। যাব নকলটা কিনেছে ঘোষালরা। মীনা দিব্যি মিথ্যে বলে দিল !

"সুভাষের কাছে কিছু ছিল। তাছাড়া তোমার নিজের কালেকশানেও নাকি একটা দুটো আছে বলে শুনেছি।"

"আপনাকে তো তখন বললামই, সুভাষদার কাছে একখানাও জাল বা আসল থাকলে আমি ঠিক জানতে পারতাম। আমার কাছে কোন ছবি আছে কি নেই, এটা কি করে যে আপনাকে বোঝাব—আপনার কথামত তো আমি সব কাজই করেছি, ...নরকেও আমার স্থান হবে না. শুধু একটা আশা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, কো-অপারেট করছি অথচ.....।"

"এইবার চুপ করতো। শোভুর 'উওম্যান ইন সলিচ্যুড' নামের বিখ্যাত ছবিটা তোমার কাছে আছে, এই খোঁজ আমি পেয়েছি। ওটা আমার চাই।"

"আমি তো আপনাকে বারবার বলেছি......"

"আচ্ছা আচ্ছা, আমি খুঁজে নেব ছবিটা কোথায় আছে। এবার বলো, রোহিণী আর কি বলল ?"

"বলল, শোভনকাকা ওকে টেলিফোন করতে পারে।"

"আর তাই শুনে তুমিও বললে, যেন সে তোমার শোভনকাকাকে তোমার কাছে আসতে বলে দেয়, কি ঠিক বলেছি ?"

"না না আমি এরকম কথা ওকে বলতে যাব কেন ? বরং রোহিণীই বলল, আপনার কথা থেকে তার নাকি ধারণা হয়েছে, শোভনকাকা খুন করতে পারেন।"

আবার মিথ্যে কথা। রোহিণীর বলতে ইচ্ছে করছে, ওহে মীনা, তুমিই তো বাপু বললে, তোমার শোভনকাকা আমার গায়ে আঁচড়টিও দেবে না।

"রোহিণীকে ?"

"হ্যাঁ।" একটু ইতস্তত করে, "ওর মনে হচ্ছে শোভনকাকা নয়, অন্য কেউ একজন তাকে মার্ডার করতে পারে।"

বহুত আচ্ছা মীনা চ্যাটার্জি। রোহিণী মনে মনে বলল, চালিয়ে যাও। তোমার কথাগুলো আমার বলে চালাচ্ছ ! আর আমিও যদি সুযোগ কখনো পাই তাহলে আমার কথাও তোমার বলে চালাব।

"কে সেই অন্য কেউ ? রোহিণী নাম বলল ?"

"না। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চেয়েও ওর পেট থেকে নামটা বার করতে পারিনি। আর একটা কথাও রোহিণী বলল, শোভনকাকাই সম্ভবত মার্ডারিড হতে পারেন।"

সর্বনাশ ! এটাও নাকি আমি বলেছি ? রোহিণী বলল, টুক করে এবার সে তার গলাটা ঢুকিয়ে বলবে নাকি—গঙ্গাদা, এটা ও বলেছে, আমি নয়।

"ননসেন্স ! রোহিণী এসব কী রটাচ্ছে ? শোভনেশ তো অলরেডি মরা মানুষই। ওকে কে মারতে যাবে ? কেনই বা মারতে যাবে ? শুধু পুলিসের হাতে তুলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তুমি কি ওকে বলেছ, বিয়ে টিয়ে করে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে, এই সব ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে ?"

"হ্যাঁ বলেছি। মনে হল, ও যেন সেটাই চায়।"

"ভাল, খুব ভাল। এটাই আমি শুনতে চেয়েছি। ধন্যবাদ, আমাকে এটা জানানোর জন্য।"

"গঙ্গাবাবু, আমি কিন্তু শোভনকাকার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি বলেছিলেন.."

"আঃ, আবার সেই এক কথা।" প্রবল বিরক্তি আর ধমক মিশিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ বলে উঠলেন, "তুমিও কেন বিয়ে থা করে ঘরসংসার সাজিয়ে বসলে না ? টাকাওয়ালা লোক ধরে বেড়াব আবার শোভনকাকার জন্যও হেদিয়ে মরবে। এসব না করে..... ।"

"গঙ্গাবাবু !"

রোহিণীর কান থেকে ফোনটা ইঞ্চি চারেক ছিটকে গেল। মেয়েদের মধ্যে গলা থেকে এমন শব্দ সিংহী বা বাঘিনীরাই বার করতে পারে।

"আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কোনরকম কমেন্টস আমি বরদাস্ত করব না। মনে

রাখবেন, মীনা চ্যাটার্জিরও এই শহরে কিছু খারাপ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে।"

সাব্বাস। রোহিণী তারিফ জানাল। এমন গলার স্বর অভিনয়ের সময় যদি মীনা বার করতে পারে, তাহলে বড় অভিনেত্রী অবশ্যই হতে পারবে।

"আই অ্যাম সরি।" বিনীত স্বর এবং ফোন রেখে দেবার শব্দ হল।

রোহিণীও রিসিভার রেখে দিয়ে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল কলকাতার টেলিফোনকে। ভাগ্যিস ওরা যন্ত্রপাতিতে বাসা বাঁধা ভূতকে খোঁচাখুঁচি করে চটায় না!

নন্দ আর বুবুল খেতে বসেছে। আরতি পরিবেশনে ব্যস্ত। অতক্ষণ ধরে ফোন কানে লাগিয়ে আন্টি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল কেন, সেটা জানার জন্য ভাইবোনকে খুবই কৌতূহলী মনে হচ্ছে। রোহিণী একটা চেয়ার টেনে টেবিলে বসল।

আরতি একটা প্লেট হাতে তুলে নিয়ে বলল, "একটু কিছু মুখে দেবেন নাকি?"

"আরে না না।" রোহিণী আঁতকে ওঠার ভান করল। "ইয়া বড় বড় দুখানা জয়নগরের মোয়া, বুঝলে নন্দা, নারকেলের মত সাইজ আর চারখানা পার্শেমাছ ভাজা খেয়ে এখন আমার পেটে আর একদানা ভাত রাখারও ...ওটা কি রেঁধেছেন বলুন তো?" রোহিণী টেবিলের প্রান্তে একটা বড় বাটির দিকে গলা উঁচিয়ে তাকাল।

"কাকা আর কাকিমা এসেছিলেন। ছানার ডালনা খেতে কাকা খুব ভালবাসেন, তাই করেছি।"

"অ।" রোহিণী দ্রুত ভেবে যাচ্ছে, মোয়া, পার্শেমাছের পর ছানাটা খাওয়া ঠিক হবে? ছেড়ে দেওয়াই ভাল। বড্ড ফ্যাট আজ শরীরে ঢুকেছে। কিন্তু ছানার ডালনা! গাওয়া ঘি আর গরমমশলার গন্ধটা যে জিভের অবস্থা এমন করে দেবে, কে জানত। সন্দেহ নেই, দারুণ রেঁধেছে। ভীমের মত লোকের বৌ, রন্ধনে দ্রৌপদী তো হবেই হবে। বহুদিন জিভে এমন জিনিস ঠেকাইনি। কিন্তু মুটিয়ে যাওয়া, আনফিট হওয়া, এসব ভয়ই কি এখন করা ঠিক হবে? নিজেকে সে বলল, রোহিণী অকুতোভয় হও। তোমার নাকি মার্ডার্ড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? তাহলে জলে ভরে যাওয়া জিভ নিয়ে অন্তত মরো না।

"দিন একটু চেখে দেখি। তবে খুব বেশি নয়, শুধু ওই বাটিটায়, যৎসামান্য—"

ফোন বেজে উঠতেই, কথা শেষ না করে রোহিণী লাফিয়ে ছুটে গেল।

"হ্যালো, কে গঙ্গাদা নাকি?"

"হ্যাঁ। তোমাকে আগে ফোন করেছিলাম।

"আমিও ভাবছিলাম, তাই তো, কে আবার ফোন করছে! মীনা চ্যাটার্জির কাছে সন্ধ্যাবেলায় গেছিলাম। ভাবলাম, সেই আবার ফোন করল নাকি!"

"ওহ্ মীনার কাছে গেছলে বুঝি? স্যাড, খুবই স্যাড ব্যাপারটা। সুভাষ গায়েন ওর ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড বলতে যা বোঝায় তাই ছিল। খুব বুদ্ধিমান লোক। তুমি তো ওকে মীট করেছ।"

"হ্যাঁ, বুদ্ধিমান ছিলেন।"

"মীনা কি বলল তোমায়?"

"কি আর বলবে, খুবই শোকাহত মনে হল।" রোহিণী দু' সেকেন্ড থেমে, ভেবে, আবার বলল, "মনে হল মাথার ঠিক নেই, আবোল-তাবোল বকছে। কি বলল জানেন, আপনি নাকি ওকে মৃত্যুভয় দেখিয়ে দুটো চিঠি, মানে অনামা চিঠি দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, মাথাটা ওর গেছে। বলল, সুভাষ গায়েনকে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, সেটা নাকি আপনি জানেন। আচ্ছা বলুন তো, ওকে এবার রাঁচিতে না পাঠিয়ে আর উপায় আছে?"

রোহিণী থামল ওধার থেকে প্রতিক্রিয়া আসার জন্য। আলতো করে দুটো বোমা সে ঠেলে দিয়েছে। ফাটবে কিভাবে, সেটাই টেলিফোনে দেখতে চায় সে।

খিলখিল হাসি ভেসে এল। রোহিণীর মনে হল, বোমার ফিউজ পোড়ার মত শব্দটা।

"বল কি ! মৃত্যুভয় দেখানো চিঠি, তারপর ঠেলে ফেলে দিয়েছে যে, তাকেও আমি জানি ?"

"আমাকে আবার বলল, এসব কথা যেন কাউকে না বলি, তাহলে আমাকেও নাকি ভয় দেখানো চিঠি দেবে। তা, আমি তো এখনো কোন চিঠি পেলাম না। দু তিনটে ফ্ল্যাটে খোঁজ নিলাম, কেউ বলতে পারল না আমার দরজায় কোন চিঠি আঁটা দেখেছে কিনা। যাক গে এসব বাজে কথা, বলুন কেন ফোন করছেন।"

ওধারে চুপ। মনে হচ্ছে দ্রুত ভাবনাচিন্তা চলছে। গোলমালে পড়ারই কথা। নিশ্চয় ভাবছে, চিঠি সেঁটে যাবার কাজটা যাকে দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই ফাঁকি মেরেছে।

"হ্যালো, গঙ্গাদা ?"

"হ্যাঁ, শোভু ফোন করেছিল।"

আবার চুপ। রোহিণী বুঝল, এবার তার প্রতিক্রিয়া গঙ্গাদা শুনতে চায়।

"প্লিজ গঙ্গাদা, আমার কিন্তু এখন যেন কেমন ভয় ভয় কবছে। আমি ঠিক করেছি, বোম্বাইয়ে দিদির কাছে চলে যাব।"

"আরে না না, ভয়ের কিছু নেই। চলে যাবে কেন ? চাকরি ছেড়ে দিয়েছ তো কী হয়েছে। তোমার মত মেয়ের জন্য অনেক চাকরি আছে, ইচ্ছে করলেই পাবে। শোভু বলল, একটা ছোট জেলখানা থেকে এখন সে একটা বড় জেলখানায় এসে পড়েছে। এভাবে পলাতক, ফেরার জীবন অসহ্য লাগছে। সে ঠিক করেছে আবার বহরমপুরেই ফিরে যাবে, মানে জেলে যাবে। আমি বললাম, তা কেন কববি। তুই দূরে কোথাও চলে যা। টাকা আমি দোব। তোকে ধরার জন্য পুলিসের কোন মাথাব্যথা নেই। তুই নকশাল নোস, স্মাগলার নোস, ফরেন এক্সচেঞ্জ রুলস ভেঙে বিদেশে টাকা জমাসনি। হঠাৎ একটা খুন করে ফেলেছিস, তাও একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষকে। দেশের বা সমাজের তোকে নিয়ে ভয় পাওয়ার বা ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তুই দিব্যি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়া। আমি বললাম, আমার বাসুদেবপুরের বাড়িতে গিয়ে থাক, ছবি আঁক। ওখানেই জীবনটা কাটিয়ে দে।"

"কি বলল শুনে ?"

"রাজী আছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, যাব।"

রোহিণী মাথাটা ঝাঁকিয়ে বুদ্ধির উপর জমে ওঠা সন্দেহের ধুলো ঝাড়ার চেষ্টা করল। নতুন কী চাল আবার চালতে চলেছে ?

"ভালই হবে গঙ্গাদা। অত বড় একজন আর্টিস্ট তাকে আবার কাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা তো মহৎ ব্যাপার। এই সেদিন ওর একটা ছবি দেখে আমি তো থ' হয়ে গেলাম। আগে আমি কখনো এটা দেখিনি। কী ড্রয়িং, কী কালার, কী রিয়্যাল যে মনে হচ্ছিল !"

"কোথায় দেখলে ?"

"মীনা চ্যাটার্জির ভিতরের ঘরে। যেদিন ওকে ইন্টারভিউ করতে গেলাম, ও দেখাল একটা ন্যুড। মীনা বলল, ওটা বীণা।"

"তুমি ঠিক বলছ ?" গম্ভীর থমথমে গঙ্গাপ্রসাদের স্বর। "নট ফেক, বাট রিয়্যাল ?"

"আসল কি নকল অত বুঝি না, তবে দারুণ লাগল। আপনি গিয়ে দেখে আসতে

পারেন। মীনা বলল, ছবিটার নাম উওম্যান ইন সলিচ্যুড। এটা নাকি শোভনেশের সেরা কাজগুলোর একটা। অন্তত লাখ·দুই টাকা দাম এখন তো বটেই। গঙ্গাদা, এমন ছবি যে আঁকতে পারে, তাকে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। ওকে আপনি বাসুদেবপুরেই ধরে রাখুন। না না, আমার সঙ্গে দেখাটেখা না হওয়াই ভাল। আমি কোনদিনই ওর জীবনে আর ছায়া ফেলব না।"

"তুমি কি একটাই ছবি দেখেছ, নাকি আরো আছে ? আমার সন্দেহ হচ্ছে, আরো আছে আর আমি অলরেডি খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠিয়েও দিয়েছি, হয়তো পৌঁছেও গেছে।"

রোহিণীর মনে হল, এতক্ষণ যেসব কথা সে বলল, তার কিছুই গঙ্গাদার কানে ঢোকেনি। গঙ্গাদা এবার মুখোমুখি হবে মীনার। লক্ষ লক্ষ টাকার বেওয়ারিশ ছবির দখল নেবার লড়াইটা এবার ভাল করেই শুরু হয়ে যাক। মীনার আকুলতা ছবির থেকেও বেশি শোভনেশের জন্য। আর গঙ্গাদা নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরে, 'শোভনেশকে তোমার কাছে এনে দেব' এই টোপটা দিয়ে ওকে খেলাচ্ছে, যদি কিছু ছবি মীনার কাছে থেকে থাকে সেগুলো হাতাবার জন্য।

"আরো ছবি আছে কিনা জানি না, আমি তো একটাই দেখেছি। গঙ্গাদা, হ্যালো, ...আমার ওপরে থাকেন সেই সুজাতা গুপ্ত, তিনি একটা অদ্ভুত কথা কাল বললেন। আছ্ লাইনটা বড়ো ডিস্টার্ব করছে, হ্যালো, ..উনি বললেন, শোভনেশ নাকি বীণাকে খুন করেনি। তার সাক্ষী নাকি একজন এখনো আছে দিগম্বর বর্ধন লেনের বাড়িতে। কী কাণ্ড দেখুনতো !"

"কে সাক্ষী ?"

"সেটা উনি বলতে চাইলেন না।" রোহিণী মনে মনে বলল, গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি, এইবার তোমাকে আমি খেলাব। কে সেই সাক্ষী জানার জন্য এইবার তুমি হন্যে হয়ে ওঠো।

"কিভাবে উনি জানলেন ? শোভনেশ নিজে কোর্টে কনফেস করেছে, সে নিজের হাতে খুন করেছে। আর এখন—"

"আরে আমিও তো তাই বললাম। কিন্তু উনি রি-ট্রায়ালের জন্য এখন উকিলের কাছে যাবেন ঠিক করেছেন। নতুন করে কেসটা আবার ওপেন করালে, ভাবতে পারেন, আবার অনেককে কোর্টে দাঁড়াতে হবে। আমাকেও। উহ্ফ, আমার আর এসব ভাল লাগছে না গঙ্গাদা। আবার কাগজে কাগজে কেচ্ছা বেরোবে ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কি করে এটা বন্ধ করা যায় বলুন তো ? পুলিস তো তখন শোভনেশকে ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগবে।" রোহিণী উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়তে পড়তে ভাবল, মীনা চ্যাটার্জি কি আমার মত অভিনয় করতে পারবে ? ফুঃ।

"রোহিণী, কালই তুমি আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করো। সত্যিই এটা বিশ্রী ব্যাপার হবে যদি কেসটা আবার তোলা হয়। যেভাবেই হোক বন্ধ করা দরকার।"

গঙ্গাপ্রসাদের স্বরে কিছুটা যেন ভয়ের আভাস পেল রোহিণী। সে ঠিক করে ফেলল, সুজাতা গুপ্তকে উকিলের বাড়িতে পাঠাতেই হবে। শান্ত গলায় সে গঙ্গাপ্রসাদকে বলল, "হ্যাঁ, বন্ধ তো করতেই হবে।"

ফোন রেখে দিয়ে রোহিণী কঠিন চোখে রিসিভারটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। চোয়াল শক্ত। কি যেন ভাবছে। রিসিভার তুলে আবার সে ডায়াল করতে শুরু

করল।

"হ্যালো, মিস চ্যাটার্জি ?"

"স্পিকিং।"

"এই মাত্র গঙ্গাপ্রসাদবাবু ফোন করেছিলেন। উনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, আপনার ঘরে শোভনের আঁকা যে ছবিটা রয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ বেডরুমে যেটা রেখেছেন... ।"

"উনি জানলেন কি করে, আমার বেডরুমে ছবি রয়েছে ?" উত্তেজিত স্বর মীনার এবং বিব্রতও।

"আমি তো আপনার সাক্ষাৎকারে ওটা মেনশ্যন করেছি। ওটা তো একটা প্লাস পয়েন্ট আপনার শিল্পবোধ, শিল্প চেতনা মানে আর্ট লাভার হিসেবে আপনি—"

"চুলোয় যাক আর্ট লাভার। আপনি এসব লিখতে গেলেন কেন ?"

"আপনাকে উজ্জ্বল করতে আর আমার লেখাটাকে একটা পারস্‌পেকটিভ থেকে—" রোহিণী যেন দেখতে পেল মীনার শ্বদন্ত বেরিয়ে এল, হয়তো রিসিভারটাকেই কামড়ে ধরবে।

"ছবির কথা লিখেছি বলে কি আপনি বিরক্ত হলেন ?" কাঁচুমাচু স্বরে রোহিণী বলল, "আমি কালকেই প্রুফ আনিয়ে ওই অংশটা বাদ দিয়ে দেব।"

"আর বাদ দেওয়া ! যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেছে। গঙ্গাপ্রসাদবাবু আপনার কাছে কি জানতে চাইলেন ?"

"বললেন," রোহিণী ঢোঁক গিলল। তাই তো, কি বলা যায় ! "বললেন, ছবিটা তো নকল। ওটাকে অত যত্ন করে রাখার কারণ কি ?"

"কে বলল ওটা নকল ?" মীনার স্বর তীব্র। "সুভাষদা আমায় দিয়েছিলেন।"

"আপনি যে আমায় বললেন, কোন এক প্রোডিউসার ছবিটা আপনাকে উপহার দিয়েছেন ?"

"ভুল করে বলেছি। ছবিটা আসলই, এর নকলটা গঙ্গাপ্রসাদবাবু পেয়েছেন, বোধহয় সুভাষদার কাছ থেকেই পেয়েছেন। আর পেয়ে সেটা কাকে যেন বিক্রিও করে দিয়েছেন।"

"কি করে পেলেন ?"

"গঙ্গাপ্রসাদবাবু নকল ছবি বিক্রি করার জন্য সুভাষদার ব্যবসাব পার্টনার হতে চান। কিন্তু সুভাষদা তাতে রাজি না হয়ে ওঁকে এজেন্ট করেছিলেন, একটা কমিশন দিতেন। মিসেস সেনগুপ্ত, আপনি কি জানেন, এই গঙ্গাপ্রসাদ লোকটির কাছে আপনার স্বামীর আঁকা কত লক্ষ টাকার ছবি জমা আছে ? আসল ছবিগুলো কালেক্ট করার জন্য উনি এখন উঠে পড়ে লেগেছেন। ওগুলো জমিয়ে রাখছেন পরে বেশি দামে বিক্রি করবেন বলে। আর নকলগুলো এখন বিক্রি করছেন। লোক বুঝে বুঝে নকল ছবি বেচছেন। আপনি যে কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন, তা জানেন না।"

"না, জানি না, জানতে চাইও না। আমি শুধু একটা পরিচ্ছন্ন, সভ্য জীবন চাই।"

"গঙ্গাপ্রসাদবাবু আর কি বললেন ?"

"বললেন ওই ছবিটা ওনার চাই। শোভনেশ ওকে বলেছে, সব নকল ছবি ধ্বংস করে ফেলতে হবে। তাই যেখানে যত আছে, উনি খোঁজ পেলেই টাকা দিয়ে কিনে নেবেন ঠিক করেছেন।"

"বাজারে নকলের ছড়াছড়ি থাকলে আসল কিনতেও খদ্দেররা ভরসা পাবে না বলেই

ওনার এই ব্যস্ততা। কিন্তু জেনে রাখুন, আমার কাছে আসলটাই রয়েছে।"

রোহিণী ফোনের মধ্যে কলিং বেল বাজার শব্দ পেল। মীনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে।

"এত রাতে কে আবার! এক মিনিট, কেউ নেই, আমাকেই দরজা খুলতে হবে, প্লিজ একটু ধরুন ... আরও কিছু কথা আপনাকে বলব।"

রোহিণী রিসিভারটা শক্ত কোন জায়গায় রেখে দেওয়ার শব্দ পেল। ফোনটা মীনার শোবার ঘরে। রোহিণী ফোন কানের কাছে ধরে পিছনে তাকাল। দত্ত পরিবার খাওয়ায় ব্যস্ত, কিন্তু কানগুলো নিশ্চয় তার কথাবার্তার দিকে। স্বাভাবিকই। খুন, মার্ডার, ভয় ভয় করছে, বোম্বাইয়ে চলে যাব, কোর্ট, কনফেস, নতুন করে মামলা,—এই সব কানে গেলে, দাঁত দিয়ে খাবার চিবোনোর বদলে কান দিয়ে শব্দ গেলার কাজ বেড়ে যাবেই। বাটি ভরা ছানার ডালনা টেবিলে রাখা। কড়াইশুঁটির সবুজ দানাগুলোর দিকে তাকিয়ে রোহিণী ভাবল, মীনা বড্ড দেরি করছে।

হঠাৎ সে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরল। তাব ঘাড়, বাহু শক্ত হয়ে উঠেছে! ক্ষীণভাবে হলেও স্পষ্টই কথাগুলো শোনা যাচ্ছে।

"না, ঘরে ঢুকতে দেব না। বেরোও বলছি, নইলে চেঁচিয়ে লোক ডাকব।"

"তা হলে জান্ খতম করে দেব। ওই তো ছবিটা, তুলে নে। চুপ কবে থাক, নইলে—।"

"না, না, আমি কিছুতেই—" একটা ভারি কিছুতে ধাক্কার বা পড়ে যাবার মত শব্দ রোহিণী পেল। মীনা বিপন্ন! ওর ঘরে একধিক অবাঞ্ছিত লোক, তার ছবি নিতে এসেছে, মীনা বাধা দিচ্ছে। বোধহয় ওকে মারল।

"ডাকাত, ডাকাত, বাঁচা—।"

কথাটা শেষ হবার আগেই থেমে গেল। রোহিণী থর থর কেঁপে উঠল। সর্বনাশ! 'ওই তো ছবিটা' বলল কেন? গঙ্গাদার লোক!

"মুখটা বাঁধ্। হাত আর পা দুটোও।"

ফোনের খুব কাছ থেকে লোকটা বলল। দ্রুত, তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত, স্বব। উচ্চারণ জড়ানো, অমার্জিত।

"আর ছবি আছে? ...সোনা দ্যাখ, তো ভেতরের ঘরগুলো। ...আরে গাধা, ফটো নয় ফটো নয়, হাতে আঁকা ছবি! এই রকম রঙ দিয়ে কাপড়ে আঁকা, দ্যাখ সব জায়গায়...বাথরুমটাও দেখবি।"

লোকগুলো জানে না, তাদের এই কীর্তিটা বহু দূর থেকে একজন জানতে পারছে। রিসিভারটা যে ক্রেডল থেকে নামিয়ে রাখা, চালু অবস্থায় রয়েছে এটা ওরা নজর করেনি। হুঁশিয়ার, পাকা গুণ্ডা নয়। কিন্তু সে এই মুহূর্তে কী করতে পারে? রোহিণী অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। শুধু শুনে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। দুঃখিত মীনা চ্যাটার্জি, আমি দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারছি না।

"আর নেই? ভাল করে দেখেছিস? ছবিটা আমি নিচ্ছি, তুই ওকে উপুড় করে খাটে শুইয়ে দে। ...আরে ফোনটা যে নামিয়ে রাখা দেখছি...হ্যাল্লো।"

রোহিণী কিছু না ভেবেই বলল, "সব শুনেছি। কার হয়ে কি জন্য কাজ করছ, তাও জানি।"

খটাস্। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার রাখার শব্দ হল। রোহিণীর মনে হল, তার চুপ করে

থাকাই উচিত ছিল। কথা বলে সে নিজের বিপদ ডেকে আনল না তো ! গঙ্গাদাকে এটা ওরা সম্ভবত বলবে। যখন শুনবেন একটা মেয়ের গলায় বলল, 'কার হয়ে কি জন্য কাজ করছ তাও জানি', তখন প্রথমেই ওর মনে হবে, রোহিণী ছাড়া আর কেউ নয়। আর কোন মেয়ে শোভনেশের ছবি সম্পর্কে গঙ্গাপ্রসাদের আগ্রহের কথা জানে না।

মীনাকে ওরা খুন করেনি। মনে হল, ধাক্কাটাই শুধু দিয়েছে। বড় ধরনের চোটও সম্ভবত পায়নি। তা হলেও একা একটা মেয়েকে পেয়ে এইভাবে হাত পা মুখ বেঁধে তার ঘর থেকে জিনিস চুরি করা—গঙ্গাদার এই কাজটা রোহিণীকে রাগিয়ে দিল এমনই যে, চোখ বন্ধ করে সে নিজেকে শান্ত করসর চেষ্টা করল।

মনে মনে সে নিজেকে বলল, কুল ডাউন রোহিণী, কুল ডাউন ...ঠাণ্ডা হও। রেগে উঠছ কেন ? মীনা চ্যাটার্জি তোমার কে ? ওর ঘর থেকে যদি গুণ্ডারা ছবি চুরিও করে, তাতে তোমার কি ? মীনাও কম জাঁহাবাজ নয়। তাকে যদি গুণ্ডারা দু-চারটে চড়চাপড় মাবে, তাতেই বা তোমার কি ? কয়েক ঘণ্টা আগেই তো তুমি ওর হাতের চড় খেয়েছ, মনে নেই ?

কিন্তু একটা দুর্বল অসহায় মেয়ের ওপর এইভাবে গুণ্ডা লেলিয়ে গঙ্গাদা যে-কাজটা কবলেন, এটা ক্ষমাব অযোগ্য নয় কি ? রোহিণী নিজেকে ঠাণ্ডা করার বদলে আরো অশান্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। মীনা তার কেউ নয় ঠিকই, কিন্তু তার মতই একটা মেয়ে তো ! তার মতই একা, তার মতই বুদ্ধি আর গতর খাটিয়ে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে।

রোহিণী থমথমে মুখে দরজার দিকে এগোল।

"আন্টি, আপনার ছানার ডালনা।"

"থাক্, এখন খাবার ইচ্ছে নেই।"

মুখ না ফিরিয়েই কথাগুলো বলে সে দরজা বন্ধ করে দিল। সামনেই গুপ্তদের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা। সিঁড়িটা ফাঁকা। কোথাও কোন শব্দ নেই। রোহিণীর মনে হল, মীনার মত তাব ফ্ল্যাটেও তো গঙ্গাদা খুনী পাঠাতে পারেন।

॥ নয় ॥

কলিং বেল বাজল।

রোহিণী আই-হোলে চোখ রেখেই দরজা খুলে দিল।

"এসো।"

"টেপটা আমি এনেছি। অবশ্য সব কথা এতে নেই। কি করব বলুন, পল্টু অর্ধেকটাই দখল করে রেখেছে ডি জি গিলেসপির জ্যাজ দিয়ে। রুনিদি, কী অসাধারণ যে গিলেসপি ট্রাম্পেট কী, বলব ! সত্তর বছরের বুড়ো, কিন্তু বাজায় কী ! ...বাহ্ ডুডল ইবহ্ ডিবহ্ ডিড়ল বু ডাহ্ ডী বাহ্ ডিব বু ...রুনিদি, আমেরিকান জ্যাজ আপনার ভাল লাগে ? আমার লাগে ... গিলেসপির বিবপ্ স্টাইলের জ্যাজ যদি শোনেন ...বিপ্ বপ্ বাহ্ ডীডী ডীডী ডাহ্ বাহ্ ডিডল বু ডি বো..."

"কুন্তী, তোমার নাচ আর গান এবার থামাও।"

"আপনি একটু শুনে দেখুন, পল্টু যা একখানা যোগাড় করেছে না !"

"এখন তুমি আমায় আবদুল করিম খাঁ সাহেবের 'যমুনা কি তীর' শোনাতে চাইলেও

শুনব না। আমার মেজাজ খুব খারাপ, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।"

"কেন ?"

"সে অনেক কথা, পরে বলব। তুমি দিগম্বর বর্ধন লেনে গিয়ে কী দেখলে শুনলে বুঝলে কী ছবি তুললে, টেপ করলে, নোটস নিলে সব আমাকে জানাবে বলেছিলে, এবার সেটা জানাও। তার আগে চায়ের জলটা চড়িয়ে আসি।"

রোহিণী রান্নাঘরে গেল। কুন্তী রেকর্ডারে ক্যাসেট ঢুকিয়ে শুরু করার জন্য টেপটা ঠিক জায়গায় রাখা আছে কি না পরখ করতে লাগল খাবার টেবিলে বসে। রোহিণী ফিরে এসে বলল, "আমি বরং প্রথমে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি।" সুজাতা গুপ্ত চারদিন আগে তাকে যা বলেছিলেন, সেইগুলোই সে মনে মনে ঝালিয়ে নিল।

"ওখানে পরমেশ সেনগুপ্ত যে অংশে থাকে, সেটা ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে, তাই তো ?"

"কারেক্ট।"

"তার পাশে শোভনেশের অংশটা একজন কিনেছে। নতুন মালিক সারিয়ে মেরামত করে এখন খালি অবস্থায় তালা দিয়ে রেখেছে ?"

"রাইট। আমি ছবি তুলে এনেছি।"

"পরমেশের একতলায় পুরনো চাকর বিশ্বনাথ তার আর বৌ গীতা থাকে।"

"ওয়েট রুনিদি, ওয়েট। আমি ওখানে গিয়ে প্রথমে গীতার সঙ্গে কথা বলি। প্রথমে বললাম, আমি জন্মেছি এই বাড়িতে। শোভনেশ সেনগুপ্তর ঠাকুর্দার ভাইয়ের নাতির মেয়ে আমি। বুঝলে না, আমি কেন কৌতূহলী, সেটা তো আগে ওকে বোঝাতে হবে! তা গীতা তো খাতির করে ওর ঘরের সামনে রকটায় একটা টুলে বসতে দিল। নিজেই বলতে শুরু করল, 'আর দিদিমণি, এখন আর কি দেখতে এয়েছেন। এখন তো ভূতের বাড়ি। এক ভাই ওপরে মাথা খারাপ অবস্থায়, আর এক ভাই জেলে'। আমি বললাম, 'জেলে কেন, চুরি করেছিল ? গীতা ফিসফিস করে বলল, চুরি নয় গো ...।"

কুন্তী টেপ-রেকর্ডারের রীড টিপল। রেকর্ডারটা সে রোহিণীর দিকে এগিয়ে দিল।

"চুরি নয় গো, খুন করেছিল।"

"খুউন ! বলো কি, কাকে ?"

"একটা মেয়েমানুষকে। বড়দা তো ছবি আঁকত। ওই মেয়েমানুষটা, বীণা নাম, আসত। কাপড় চোপড় খুলে শুয়ে বসে থাকত আর বড়দা তার ছবি আঁকত।"

"এ ম্যাগো, ওইভাবে কেউ পুরুষ মানুষের সামনে—।"

"টাকা পেত সেজন্য। কি করবে, গরিব মানুষকে পেটের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। তবে খারাপ কিছু ছিল না ওদের মধ্যে।"

"তুমি জানলে কি করে ? দেখেছ কি ?"

"না, না আমি দেখব কেন। লুকিয়ে লুকিয়ে তো দেখত ছোড়দা, ওই যার নাম পরমেশ, ওপরে থাকে। একদিন আমি দেখে ফেলেছিলুম, ছোড়দা খড়খড়ি তুলে দেখছে।"

"তুমি একদিনও দেখনি ?"

টেপ রেকর্ডারে শব্দ নেই। রোহিণী মুখ টিপে হাসল।

"একদিন একটুখানি দেখেছি। ওই খড়খড়ি তুলে। বড়দা খুব রাগী মানুষ ছিল তো। জানতে পারলে বাড়ি থেকে বার করে দেবে।"

"কেমন দেখলে বীণাকে ?"

"ওহ্ দিদিমণি, সে কি শরীর, কি গড়ন। দুগ্‌গা ঠাকুরকে কাপড় পরাবার আগে দেখেছ কখনো ? কি কোমর ! কি বুক ! কি পাছা ! হাত পায়ের গড়নই বা কি !

"হবে না কেন ? বড়দার বৌ, যাকে বিয়ে করে আনল, তারও তো অমন শরীর ছিল !"

"কি নাম তার ?"

"নামটাম বাপু অত জানি না। তবে হ্যাঁ, ওরও একটা দেখার মত শরীর ছিল। যেমন লম্বা তেমনি মানানসই বুক পেট পাছা—"

চট্ করে রেকর্ডার বন্ধ করে রোহিণী বলল, "হাসছ কেন ?"

কুন্তী নিঃশব্দে হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে গেছিল। সোজা হয়ে বলল, "ওহ্ রুনিদি, হাসব না ? পল্টু যা বলে, গীতাও তাই বলল, আমিও তাই বলি। আপনার ফিগার যে একবার দেখেছে...এত...মানে কি বলব, প্রোভোকেটিভ যে ..."

"হয়েছে হয়েছে, এবার হাসি থামাও, বড়দের নিয়ে ঠাট্টা করতে হবে না।" রোহিণী দস্তুরমত রাগ দেখাল।

"ঠাট্টা ! আপনি আমার কি ক্ষতি যে করেছেন পল্টুর সোফিয়া লোরেন হয়ে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, বলেছি তো, এই সব ঝামেলা চুকে যাক, তারপর তোমাকে নিয়ে পড়ব। হপ্তায় এক কেজি করে ওজন বাড়িয়ে দেব।"

"ছাই করবেন।" ঠোঁট ফুলিয়ে কথাটা বলেই কুন্তী রেকর্ডারের রীড টিপল।

"দিদিমণি কি বলব, দুজনের মধ্যে কিন্তু একদমই মনের মিল ছিল না। কেমন যেন ছাড়াছাড়া ভাব। হয়তো বয়সের পার্থক্যের জন্য।"

"তা বড়দার বিয়ের পর সেই বীণা আর আসত ?"

"না। একদমই না। প্রথম এল সেইদিনই, যেদিন ওই জানালা দিয়ে নীচে পড়ে মরল।"

"তোমার মনে আছে সেদিনের কথা ?"

"মনে থাকবে না ? উঠোনে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলুম। দুপুরবেলা। দেখি বড়দা হনহনিয়ে বেরিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছে। ওই পর্যন্ত, ওই যে ইটটা পড়ে রয়েছে, ওই পর্যন্ত গেছে, আর তখন দোতলার জানলা দিয়ে কে যেন চেঁচিয়ে কি বলল। মনে হল যে, দাঁড়াতে বলল। বড়দা দাঁড়াল না, আর তখনই ধপ করে শব্দ হল। আমি চমকে উঠে এগিয়ে গেলুম। বড়দাও ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল। আমি দূর থেকে দেখলুম, বীণা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছিল একটুও নড়ছে না। ভয়ে আমি একেবারে ঘরের মধ্যে ছুটে এসে বিছানায় উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। বাব্বা, এমন মিত্যু জীবনে কখনো দেখিনি।"

"আমি তো শুনেছি, তোমার বড়দাই নাকি বীণাকে জানলা গলিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিল।"

"তাই কখনো সম্ভব নাকি ? বড়দা তো তখন ঘরেই ছিল না।"

"বীণা নিজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল ?"

টেপ রেকর্ডার থেকে কয়েক সেকেন্ড কথা বেরোল না।

"রুনিদি, গীতা হেজিটেট করছে।"

"না দিদিমণি, আমি নিজের চক্ষে যখন ঝাঁপ দিতে দেখিনি, তখন কি করে তা বলি। আমি তো পড়ার শব্দ শোনার পর তাকালুম।

"বড়দা যে ফেলে দেয়নি, এটা তো তুমি জান ?"

"হ্যাঁ বড়দা তখন তো গেটের কাছে।"

"বড়দার বৌ ছিল না তখন ?"

"না। কোথায় একটা নেমন্তন্ন ছিল, সকালেই বেরিয়ে গেছিল।"

"তারপর তুমি কি করলে ?"

"আমার সোয়ামি, নারানের বাপ, বলল : পুলিশ টুলিশ আসবে, তোকে আর এখন এখানে থাকতে হবে না, বাপের বাড়ি চলে যা। আমি তক্ষুনি নারানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলুম। সাতদিন পর ফিরলুম। বড়দাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, তার বৌ একা রইল।"

"কোন আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুবান্ধব তখন আসত না ?"

"কই কাউকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে বড়দার এক বন্ধু আসত।"

"কি নাম ?"

"নাম জানি না, নারানের বাপ বলতে পারবে। ওর সঙ্গে বড়দার বন্ধুটার আলাপ হয়েছিল।"

"কি কথা হত ওদের ?"

"আমাকে সেসব কিছু বলত না। শুধু একদিন বলেছিল লোকটাব মতলব আছে, খুব চালাক। বড়দাকে জেলে ভরে রাখতে চায়। তা নারানের বাপও খুব স্যায়না। লোকটাকে বলল, মাসেমাসে দুশো করে টাকা দাও তাহলে আমার বৌ মুখে চাবি দিয়ে থাকবে। লোকটা রাজি হল। কিন্তু যেই বড়দা জেলে ঢুকল, অমনি টাকা দেওয়া বন্ধ করে বলল, কাজ চুকে গেছে, আবার কিসের টাকা ? কি নেমকহারাম খচ্চর লোক দেখেছেন ? নারানের বাপ আমাকে বলেছিল, তুই একদম কারুর কাছে মুখ খুলিস না, তা হলে পুলিশে ধরবে। আমিও বাপু কারুকে কিছু বলিনি। এই তোমাকেই ...একটা বুড়ি এসেছিল, তার কাছেই, আর তোমার কাছেই শুধু অ্যাদ্দিন বাদে মুখ খুললুম।"

"বুড়িটা কে ?"

"বলল তো এককালে নাকি এখানে ভাড়া থাকত।"

"তোমার স্বামী কখন আসবে ?"

"এখন কটা বাজে ? একটার সময় খেতে আসবে।"

"ঠিক আছে, আমি তখন আবার আসব। ওর সঙ্গেও আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। তোমরা সব পুরনো লোক, কত পুরনো পুরনো গল্প জান এই বাড়ি সম্পর্কে।"

"আপনি ছোড়দার সঙ্গে দেখা করুন, তবে ভাল করে তো কথা বলতে পারে না। মাথার ঠিক নেই। বোধহয় বেশিদিন আর বাঁচবে না। ওর কাছে পুরনো কথা জানতে পারবেন।"

"এখন গেলে দেখা হবে ? ঘুমোচ্ছেন না তো ?"

"না না উনি দুপুরে ঘুমোন না।"

কুন্তী রেকর্ডার বন্ধ করল। রোহিণী এই কথাগুলো সুজাতা গুপ্তর কাছ থেকে আগেই শোনায়, খুব রোমাঞ্চিত হল না। শুধু বলল, "গঙ্গাদা সম্পর্কে গীতার স্বামী বিশ্বনাথ যে কথাগুলো বলেছে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং।"

"হ্যাঁ, তাই আমি পরমেশ সেনগুপ্তর সঙ্গে কথা বলেই নীচে নেমে আসি বিশ্বনাথের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সেদিন ও খেতে আসেনি। তাই পরের দিন আবার যেতে হয়।"

"পরমেশের সঙ্গে কি কথা হল ?"

"ওর সঙ্গে কথা বলা আর একটা চার বছরের বাচ্চার সঙ্গে কথা বলা প্রায় একই ব্যাপার। আপনি এবার টেপটা শুনুন।"

কুন্তী টেপ রেকর্ডারের রিড টিপল। "রোহিণী ! কে রোহিণী?"

পরমেশের ঘড়ঘড়ে সরু মেয়েলি গলা। তার কথার মাঝখান থেকে টেপে রেকর্ড করা হয়েছে। কুন্তী ফিসফিস করে বলল, "মিনিট কুড়ি এর আগে কথা বলেছি। টেপ করার মত কিছু পাইনি।"

"দাদার বৌয়ের নাম ছিল রোহিণী। কিন্তু ওকে তো পাগল করে দিয়েছে !"

"কে ?"

"আমার দাদা। দেয়নি ?....তাহলে কে পাগল হল ?"

"কেউ হয়নি। আপনি ভুল করছেন, কেউ পাগল হয়নি।"

"হ্ অ্যা অ্যা, বললেই হল। দাদা হয়নি ? একদিন আমি নিজে দেখেছি, দাদা টেনে টেনে বৌদির কাপড় ছিঁড়ছিল। বৌদি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে তিনতলায় গেল। আমি তখনই বুঝে গেছলুম, হা হা হা হা,....বুঝে গেছলুম আমি বেঁচে গেছি, বুঝলে, আমি বেঁচে গেছি।"

"কি বেঁচে গেছেন ?"

"আমি আর তাহলে পাগল হচ্ছি না। একজনের পাগল হওয়ার কথা তো ! পাওয়া হয়ে গেছে সেই একজনকে। তুমি জেলে গিয়ে দেখে এসো শোভনেশ সেনগুপ্ত পাগল হয়ে রয়েছে।...বঝলে, আমার এবার একটা বিয়ে করতে হবে।...কত লোককে বলেছি, আমাব বিয়ে দিয়ে দাও, কেউ আমার কথা শুনল না।"

"সে কি ! আপনার মত লোকের বিয়ে হবে না, তাই কখনও হয় ! আমি আপনার বিয়ে দিয়ে দোব। কিরকম মেয়ে আপনার পছন্দ বলুন তো ?"

"হে হে হে, ঠিক বলছ তো, নাকি ধাপ্পা দিচ্ছ ?"

"কেন, কেউ কি আপনাকে ধাপ্পা দিয়েছে নাকি ?"

"দেয়নি আবার ! ওই মোটা বেঁটে গঙ্গা হারামজাদা ! আমার বলল, মুখবন্ধ করে থাক. কাউকে কিচ্ছু বলবে না, তাহলেই তোমার জন্য মেয়ে দেখে বিয়ে দোব। তা আমি দু বছর মুখ বন্ধ করে বসে রইলুম। ফোক্কা...দাদার যাবজ্জীবন জেল হল, আর গঙ্গাব্যাটা আমায় কলা দেখাল। আর এলই না এ বাড়িতে !"

"আপনি মুখ বন্ধ করেছিলেন ? কিছু বলা বারণ ছিল কি ?"

"ছিল না ? দাদা যখণ সিগারেট কিনতে বাড়ি থেকে বেরুল, আমি তখন ফাঁক বুঝে ঘরে ঢুকে সে মাগিকে বললুম, 'অ্যাই তোর পেটে বাচ্চা আছে কিনা দেখব...দাদার বাচ্চা.....পাগলের বাচ্চা, ওটাও পাগল হবে। দেখি তোর পেটটা। সে মাগি যা ভয় পেল না। কি বলব ! দাদার প্রথম বৌটাও অমন ভয় পেয়ে জানলার দিকে ছুটে গেছিল চেঁচিয়ে লোক ডাকতে। এ মাগিও ঠিক তাই করল। সেবার যা করেছিলুম, এবারও তাই করলুম। দৌড়ে গিয়ে ঠ্যাং দুটো ধরে উল্টে দিলুম আর টুক করে জানলা দিয়ে নিচে পড়ল। আর বাবা পাগলের ঝাড় বাড়তে পারবে না, কী বলো, ঠিক করেছি কিনা ?"

"বীণাকে তাহলে আপনিই ফেলে দিয়েছিলেন ?"

"তা না হলে পড়বে কেন ? ও এলেই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওর— ।"

কুন্তী রিড টিপে টেপ বন্ধ করে, ফরোয়ার্ড লেখা রিডটা টিপল। খর খর শব্দে দ্রুত

টেপ ঘুরে যেতে লাগল কিচির মিচির শব্দ করে। রোহিণী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল কুন্তীর দিকে।

"এই জায়গাটা আর শুনতে হবে না। বুড়োটা বীণার অ্যানাটমি নিয়ে খুব ভালগার ফিলদি ওয়ার্ডস ইউজ করেছে।" স্কুলের দিদিমণির মত গম্ভীর স্বরে কুন্তী বলল।

"আমার সম্পর্কেও বলেছে নাকি?"

"না। বললে তো এই রেকর্ডারটা ওর মাথায় ভাঙতাম। আচ্ছা, এবার শুনুন।"

পরমেশের গলা আবার ফিরে এল টেপে।

"দুজনে খালি ঝগড়াই করে গেল, আমি বসে আছি কখন দাদা ছবি আঁকা শুরু করবে বলে। শুরুই আর হয় না। তারপর হঠাৎ বীণা চিৎকার করে উঠল।"

"কি বলল?"

"তোমায় তা বলব কেন?"

"বলুন না।"

"না বলব না। তুমি ধাপ্পা দিয়ে সব শুনে নিচ্ছ। ওই গঙ্গা ব্যাটাও আমার কাছ থেকে শুনেছিল। বলল আমার জন্য মেয়ে দেখবে...হুঁ হুঁ বাবা, আর আমি ভুলছি না। আগে মেয়ে দেখাও, তবে মুখ খুলব। এই মুখে চাবি দিলুম।"

কুন্তী টেপ বন্ধ করে হতাশ চোখে তাকাল।

"বুড়ো আর মুখ খুলল না। কত করে বললুম, কিন্তু চাবি আর ঘোরাল না।"

"মাথা খারাপ হয়েছে বটে, কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ এখনো হয়নি। তবে মাঝে মাঝে হয়ে যায়। তখন দানবের আত্মা যেন ভর করে, অন্য সময় খুবই স্বাভাবিক। দুই ভাই পরস্পরকে খুব ভালবাসত। পাগল হয়ে যাবার ভয়ে দুজনেই সিঁটিয়ে থাকত। পরমেশকে বিয়ে করতে দেয়নি শোভনেশ, কারণ পাগলের বংশ সে এই জেনারেশনেই শেষ করে দিতে চেয়েছে।"

"তাহলে উনি আপনাকে আবার বিয়ে করলেন কেন? আপনাদেব মধ্যে কি- ?"

রোহিণী কন্তীর আড়ষ্ট কৌতূহল ভেঙে দেবার জন্যই বলল, "সেকস্যুয়াল সম্পর্ক? হ্যাঁ ছিল, আই টুক প্রিকশনস্। আর এই বিষয়ে কথা নয়।"

"রুনিদি চায়ের জল কিন্তু অনেকক্ষণ চড়িয়ে এসেছেন।"

"ওমা, তাই তো!" রোহিণী ধড়মড়িয়ে উঠে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই কলিং বেল বেজে উঠল। দরজায় গিয়ে আই হোলে চোখ রেখেই সে প্রচণ্ড অবাক হল। গঙ্গাপ্রসাদ দাঁড়িয়ে। পিছন ফিরে হাত নেড়ে সে কুন্তীকে ইশারা করল, রেকর্ডারটা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্য। কুন্তী বিস্মিত চোখে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল রেকর্ডারটা হাতে নিয়ে।

"আরে গঙ্গাদা, আপনি?" রোহিণী দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বলল। "আসুন।"

"গেছলুম লেকটাউনে একটা কাজে। ফেরার সময় মনে হল, যাই তোমাকে দেখে আসি।"

"বসুন। চায়ের জল চড়িয়েছি।"

"না না, চা-টা এখন খাব না।" গঙ্গাপ্রসাদ ভিতরে এসে কুন্তী যে চেয়ারে বসেছিল, সেটিতেই বসলেন। কৌতূহলী চোখে চারধারে তাকাতে তাকাতে বললেন, "কত্ত বছর পর যে এলাম। চুনকাম করা দরকার। দরজাগুলোতেও রঙ করতে উবে।" কথাটা বলেই খোলা দরজা দিয়ে রোহিণীর শোবার ঘরের ভিতরে তাকালেন। কুন্তীকে দেখা

যাচ্ছে না।

"আমি আগে চলে যাই, তারপর করাবেন।"

"তুমি কি সত্যি সত্যিই মহারাণীকে ছেড়ে দিলে?" মৃদুস্বরে গঙ্গাপ্রসাদ জানতে চাইলেন।

"সত্যি নয়তো কি? শোভনেশ সংক্রান্ত এই সব ব্যাপার-স্যাপার একদমই ভাল লাগছে না। ঠিক করেছি দিদির কাছেই চলে যাব।"

"কিন্তু তুমি কাল যা বললে, তাতে তো আবার তোমাকে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য যে দরকার হবে। সুজাতা গুপ্ত যদি রি-ট্রায়ালের জন্য পিটিশ্যন করে, আর কোর্ট যদি তা অ্যাডমিট করে, তাহলে তো—" কথা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি উৎকণ্ঠা নিয়ে রোহিণীর মুখের দিকে তাকালেন।

"করুক না পিটিশ্যন, তাতে আপনার কি?"

"আমার কিছুই না, তবে শোভুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আমাকে আবার ডাকতে পারে। তাহলে বুঝতেই পারছ, এই নিয়ে খবরের কাগজগুলো কি শুরু করবে। আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার বিয়েরও তো একটা ব্যাপার আছে, সেটা ভেস্তে যেতে পারে।"

রোহিণীর মনে পড়ে গেল রাজেনের বাড়ির লোকেদের কথা। ওর মা দাদা বৌদি, সবাই রক্ষণশীল। নিজেদের বনেদিয়ানা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। এই রকম কেলেঙ্কারির খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে গেলে রাজেনদের বাড়িতে বৌ হয়ে ঢোকা বোধহয় যাবে না।

"গঙ্গাদা, আমি তো কালই আপনাকে বললাম, সুজাতা গুপ্তকে থামাতে হবে। ওর আর শোভনেশের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা আপনার কাছে শুনেছি, তাতে উনিও একটা অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়বেন।"

"পড়বেনই তো। উকিল জেরা শুরু করলে কতদূর পর্যন্ত যাবে, তার কি কোন সীমা আছে?"

"আপনি ওকে থামাবার ব্যবস্থা করুন।" স্বর নামিয়ে চক্রান্তকারীর মত একটা ভঙ্গি গলায় এনে রোহিণী বলল।

গঙ্গাপ্রসাদ তাকিয়ে রইলেন রোহিণীর মুখের দিকে। ধীরে ধীরে চোখ দুটো সরু হয়ে এল। কি যেন ভেবে দেখছেন। রোহিণী স্থির চোখে তাকিয়ে। ঠোঁটে ভেসে উঠল পাতলা হাসি।

"কাল তুমি মীনাকে ফোন করেছিলে।"

"হ্যাঁ।" অচঞ্চল স্বরে রোহিণী বুঝিয়ে দিল, সে জানে গঙ্গাপ্রসাদ এখন কি ভাবছে।

"কাল মীনার ফ্ল্যাটে কি ঘটেছে জান?"

"কাজটা করার কি খুব দরকার ছিল?" রোহিণী লুকোচুরির বদলে মুখোমুখি হওয়াটাই শ্রেয় মনে করল। শোবার ঘর থেকে কুন্তীর উঁকি দেওয়া মুখ সে দেখতে পাচ্ছে।

"হ্যাঁ দরকার ছিল। শোভনেশের ছবি আমার চাই।"

"বিক্রি করে টাকাগুলো নেবার জন্য?"

"হ্যাঁ।"

রোহিণী অবাক হয়ে দেখল, কিভাবে এক পলকের মধ্যেই একটা মুখ তার চরিত্র বদল করল। গঙ্গাপ্রসাদের স্তিমিত শান্ত চোখ দুটি কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মিসৃণ সুডৌল গাল দুটি থেকে যেন চামড়া টেনে তুলে ফেলে, কর্কশ ভাঁজবহুল চামড়া

লাগিয়ে দেওয়া হল। ঠোঁট দুটি থেকে মিষ্টি হাসিটা ভেঙে ভেঙে পড়ল।

"হ্যাঁ, আমার টাকা চাই। আমি টাকা কবতে ভালবাসি।"

"যে কোন ভাবেই হোক্?"

"হ্যাঁ, যে কোন ভাবেই হোক্।"

"চুবি, জাল, জোচ্চুবি, খুন.."

"হ্যাঁ তাই। টাকা কবতে হলে এভাবেই কবতে হয়।"

"সততা, সাধুতা, বন্ধুত্ব এসবেব তাহলে কোন মূল্যই নেই?"

"এইসব বস্তাপচা কথাগুলো আব আউড়ো না। আমি ওগুলো বাচ্চা বযস থেকেই জানি। শোন বোহিণী, তুমি আমাব সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছ। তাতে আমার সামান্য অসুবিধা হতে পাবে।"

"সামান্য?"

"হ্যাঁ সামান্য। তুমি শুধু জেনেছ কিন্তু কিছুই প্রমাণ কবতে পাববে না। শোভুব ছবিগুলো আমাব কাছেই আছে। যদি পাব তো খুঁজে বাব কবো।"

"আমাব কোন আগ্রহ নেই।"

"নেই তো মীনা, সুভাষ গায়েন, সিদ্ধার্থ সিঙ্গি, সুজাতা গুপ্ত এদেব সঙ্গে দেখা কবেছ কেন?"

"নিছকই কৌতূহল।"

"খুব বিপজ্জনক দিকে তোমাকে নিযে গেছে এই কৌতূহলটা। এখন আমায ভাবতে হচ্ছে, তোমাকে সচল বাখা আব উচিত হবে কিনা।"

"অচল কবে দেবেন। কিভাবে?"

"যেভাবে সুভাষ গায়েন অচল হয়েছে।"

বোহিণীব সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদও উঠে দাঁড়ালেন। ধীব পাযে দবজাব দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নিজেকে শুনিয়েই যে, বললেন, "বাহাদুবিটা বোকাবাই দেখাতে চায, তাব ফল যে কি হতে পাবে—"

"গঙ্গাদা!" বোহিণীব গম্ভীব কঠিন গলাব স্ববে গঙ্গাপ্রসাদেব হাতটা দবজাব হাতল থেকে নেমে হল।

"আপনি আমাকে অচল কবাব ব্যবস্থাই করুন। বস্তাপচা কথা শুনে শুনেই আমি বাচ্চা বয়স থেকে বড হয়ে উঠেছি। এখনো বিশ্বাস কবি, জীবন তো একটাই, তাই সেটা খুব দামি জিনিস। কোনভাবেই অচল কবা উচিত নয়, সেটাকে পবিপূর্ণভাবে ভোগ কবাই উচিত। আব ভোগ করতে হলে একটা শক্ত মেরুদণ্ড থাকা দবকাব। তাই না?"

গঙ্গাপ্রসাদ জবাব না দিয়ে ভ্রূ তুলে শুধু তাকিয়ে বইলেন। বোহিণী উত্তেজনায়, আবেগ এবং রাগে থবথর কবে কাঁপছে।

"আপনি জানেন কি না জানি না, আমাব মেরুদণ্ডটা কিন্তু বেশ শক্তই। আব জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার ইচ্ছাটাও প্রচুব। দোষেগুণেই মানুষ, আমি তাব ব্যতিক্রম নই। আমার একটা বড় দোষ, আমি ভীতু নই। ...এবাব বেরিয়ে যান।"

রোহিণী তর্জনী তুলে দরজাটা দেখাল। গঙ্গাপ্রসাদ আঙুলটাব দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সারামুখে বিষাদ ছড়িয়ে বললেন, "হাততালিই দেওয়া উচিত, কিন্তু তোমাব জন্য এত বেশি দুঃখ হচ্ছে যে—এই শরীর, এর ধ্বংস আমি চাই না। কিন্তু তুমি নিজেই তা ডেকে নিলে।" মাথা নাড়লেন খেদ জানাতে। "সাহসী হওয়া তো ভালই। তোমাব

সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, এটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, সুখ দুঃখ নিয়েই তো মানুষের জীবন, তাই না ?"

গঙ্গাপ্রসাদ দরজা খুলে বেরিয়ে সন্তর্পণে, শব্দ না করে তা বন্ধ করে দিলেন। রোহিণী রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাস নিভিয়ে ফুটে ফুটে জল উবে যাওয়া শুকনো কেটলিটা নামিয়ে রেখে ফিরে এল। কুন্তী শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার চোখে মুখে দিশেহারা ভাব।

"রুনিদি, লোকটা কে ? এই কি সেই গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি ?"

"হ্যাঁ।" রোহিণী ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে একদৃষ্টে টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

"কি যেন বলছিল, অচল টচল করে দেবে ! মানে কী কথাটার ?"

"খুব সোজাই মানেটা। হার্ট বিট বন্ধ করে দেবে,... ডেথ !"

"অ্যাঁ !" কুন্তীর হাত আপনা থেকেই মুখে উঠে এল। "আর আপনি ওইভাবে জবাব দিলেন ?"

রোহিণী মুখ তুলে কিছুক্ষণ কুন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "হ্যাঁ দিলাম। তুমি তো সবই শুনেছ, কি মনে হচ্ছে এখন আমাকে ? বোকা ?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুন্তীর মুখের ভাব তিন-চারবার বদলাল। আপন মনে সে বলল, "আমি কি রকম যেন কনফিউজ্‌ড হয়ে যাচ্ছি রুনিদি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনাকে। জীবন সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই।"

"নেই তো কি হয়েছে, আস্তে আস্তে হবে।" মৃদু নরম স্বরে রোহিণী বলল। "অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জীবনকে বুঝতে পারা যায়। কখনো পালাবে না, ভয় যখন হাত বাড়াবে, তখন তেড়ে যাবে। হাতটা ধরে ভেঙে দেবে। আর যদি পালাও, তাহলে সারা জীবনই পালাতে হবে। সেই জীবনটা কি খুব কাম্য ?"

কুন্তী চুপ করে রইল। রোহিণী উঠে দাঁড়িয়ে ওর পিঠে একটা থাবড়া কষিয়ে বলল, "ভাবনাচিন্তা পরে করবে, এখন আত্মরক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। আমার কাছে ঝাঁটা ছাড়া তো আর কোন অস্ত্রই নেই। তোমাদের কাছে কি আছে কি ? লাঠি, রড বা ওই ধরনের কিছু ?"

"লাঠি, রড দিয়ে কি হবে ?"

"গুণ্ডারা যদি আসে, তাহলে আটকাতে হবে।"

"আপনি দরজা খুলবেন কেন ? আগে তো আই হোল দিয়ে দেখে নেবেন, কে বেল বাজাল ! যদি দেখেন অপরিচিত লোক, তাহলে একদমই খুলবেন না। ওরা তো আর দরজা ভেঙে ঢুকবে না।"

"তা বটে।"

"আর এখন একদমই বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না।"

"সে কি ! না বেরোলে আমার চলবে কেন ?"

"বলছি বেরোনো বন্ধ ! কুন্তী ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। রোহিণী অবাক হয়ে দেখতে থাকল ওর মুখটা, আর তার মনে হল, হঠাৎ যেন কত বড় হয়ে গেছে এই মেয়েটা। সারা মুখে ছড়িয়ে আছে মায়ের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আর স্নেহ।

"কি দরকার আছে বেরোনোর ? যা যা দরকার আমায় বলবেন, আমি এনে দেব। গল্পের বই দিয়ে যাচ্ছি, রেডিও রয়েছে, আর খাটে শুয়ে জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায়, ব্যস আবার কি চাই ?"

"কতদিনের জন্য ?"

"তখন কি একটা কথা শুনলাম, লোকটা যেন বলল, তোমার বিয়েরও ব্যাপার আছে...কি সেটা ?"

'কি আবার, বিয়ে মানে বিয়ে।" রোহিণী মনে মনে অপ্রতিভ হতে লাগল। মেয়েটা তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এবার কথা বার করতে শুরু করবে !

"কার সঙ্গে ?"

"একটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে।"

"ন্যাচারালি। কিন্তু ডুবে ডুবে কতদিন জল খাওয়া হচ্ছে ? তাই বলি, এমন একটা মেয়েকে কি কখনো পুরুষরা একা ফেলে রেখে দেবে ! পল্টুর সঙ্গে বাজি ধরেছি, ও বলেছে ডেফিনিটলি লোকটা ডাক্তার, ফরেনে থাকে, চিঠিতে প্রেম চলছে। আমি বলেছি, এখানকারই লোক, ফিল্ম ডিরেক্টর কি আই এ এস। ঠিক বলেছি ?"

"তোমরা তাহলে এতদূর পর্যন্ত গবেষণা করে ফেলেছ ? কি বাজি ধরেছ ?"

"আমি জিতলে আইসক্রিম খাব, ও জিতলে চকোলেট।"

"হায় ভগবান, আমাকে নিয়ে এত কম টাকার বাজি ! মরে যেতে ইচ্ছে করছে কুন্তী, এত কম আমার মূল্য ! নাহ্, আমি কলিং বেল বাজলেই, আই হোল দিয়ে না দেখেই দরজা খুলে দেব। তাতে যা হয় হোক্।"

"প্লিজ রুনিদি, ওটা করবেন না। আপনি যাকে বিয়ে করবেন তাকে খবর দিন। চটপট বিয়ে করে সেফ জায়গায় গিয়ে বসবাস করুন। ওই গঙ্গাপ্রসাদের কথাবার্তা, চাউনি-টাউনি আমার একদমই ভাল মনে হল না।"

"তোমার টেপরেকর্ডারে আর কারুর জবানবন্দী রয়ে গেছে নাকি ?" কথা ঘোরাবার জন্য রোহিণী বলল।

"না, শুধু গীতা আর পরমেশ সেনগুপ্তকেই টেপ করেছি। গীতার হাজব্যান্ড বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হয়নি। ভাবছি, আজ কি কাল একবার যাব।"

"আর যাওয়ার দরকার নেই। যা জানার ছিল, সেটা তো গঙ্গাদা নিজের মুখেই বলে দিলেন। আমি তো আর ডিটেকটিভ নই যে, সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে কালপ্রিটকে পুলিসের হাতে তুলে দেব। যা ঘটে গেছে, তাকে আবার কবর থেকে তুলে ঘটনার কঙ্কাল নিয়ে খটখটানোর কোন মানে হয় না। বহরমপুর জেল থেকে যাবজ্জীবন পাওয়া দু'জন কনভিক্ট পালিয়েছে, এই খবরটা কাগজে পড়েই কেন জানি মনে হয়েছিল, বোধহয় ওদের একজন শোভনেশ। আর কিরকম যেন একটা ভয় ধরল। সেই থেকে এই সাত-আট দিনে গড়াতে গড়াতে ভয়টা স্নো বল, হয়ে আজ এখানে পৌঁছেছে। এখন আর শোভনেশ নয়, গঙ্গাদাই হয়ে উঠেছেন ভয়ের কারণ।"

"রুনিদি, হাতের কাছে কিছু জিনিস রাখা ভাল। যদি এসে পড়ে, তাহলে, বুঝলেন না ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে হয়তো দরজাটা নিঃশব্দে খুলে ঢুকে পড়ল, তখন কি করবেন ?"

"চেঁচাব।"

"লোকজন এসে পড়ার আগে পর্যন্ত ফাইট করতে হবে তো ! দাঁড়ান আমি আসছি।"

কুন্তী প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল। রোহিণী খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

মানুষের জীবনে এক-একটা এমন সময় আসে, যখন তার মনে হয় পা থেকে মাথা দেহটার মধ্যে বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু রক্ত, মাংস, হাড়ই নয় কোন ইন্দ্রিয়েরই অনুভব শক্তি নেই, চিন্তা করার ক্ষমতাও নেই। রোহিণীর জীবনে দু তিনবার এই রকম সময় এসেছিল। এখন আবার সে ওই ধরনের একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সে ধস্তাধস্তি শুরু করল। এখন কোনভাবেই বোধ ও বুদ্ধি রহিত হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি মোটেই সহজ লোক নন। মৃত সুভাষ গায়েনই তো তার প্রমাণ। মীনা চ্যাটার্জি তো বেঁচে আছে, আর একটা নজির হয়ে। এবার রোহিণীকেও এমন কিছু একটা করবেন যাতে সে অচল হয়ে যায়। কি করতে পারেন গঙ্গাদা?

তার চোখ পড়ল খবরের কাগজে। আজ সকাল থেকে একবার হেডলাইনটাও দেখা হয়নি। রোহিণী কাগজটা তুলে প্রথমেই পিছনের পাতা ওলটাল। কাল জয়পুরে রঞ্জি ট্রফির খেলা শেষ হয়েছে। যা ভেবেছিল, তার থেকেও বাজেভাবে খেলাটার ফল দাঁড়াল।

বাংলার ইনিংসে পরাজয়
মাত্রুর ৮ উইঃ ৪৭ রানে

কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে গিয়ে রোহিণী আবার তুলে ধরল সরাসরি জেতার ইচ্ছায় ঝড়ের গতিতে তিন ঘণ্টায় ২০২ রান তুলে বাংলার সবাই আউট। ইনিংস ও ১৫ রানে তো হারল। কিন্তু রাজেনের রান কত? পড়তে পড়তে তার মুখে হালকা হাসি ফুটল আর ক্রমশ তার মনে হতে লাগল, এখন যেন তার দেহের মধ্যে ভরাট হবার কাজ শুরু হচ্ছে। রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ সব আবার ফিরে আসছে।

মাত্রুর প্রথম বলেই রাজেন বোল্ড হয়েছে।

সিঁড়িতে হালকা দ্রুত পায়ের শব্দ। রোহিণী সতর্ক হল। বোধহয় সেই অফ স্টাম্পের বাইরের ইন সুইঙ্গারটা, ছেড়ে দেবার জন্য ব্যাট তুলে রাজেন ঠকে গেছে। হায় রে পজিটিভ অ্যাফারমেশন। সেঞ্চুরিটা পাওয়ার জন্য কি প্রচণ্ড টেনশ্যানের মধ্যে যে পড়েছিল, সেটা দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম বলেই আউট হওয়া থেকে বোঝা যাচ্ছে। যে মুহূর্তে সেঞ্চুরি পাওয়া হল জয়পুর থেকে কলকাতায় টেলিফোনে কথা বলল, তখনই টানটান হয়ে গুটিয়ে থাকা উত্তেজনা স্প্রিংয়ের মত খুলে যাচ্ছিল। প্রেসার থেকে বেরিয়ে এসে রাজেন আর কনসেনট্রেট করতে পারেনি। রোহিণীর মনে হল, রাজেনের টেনশ্যানটা যে কত গভীর এবং যন্ত্রণাকর ছিল, এখন সে নিজে তা অনুভব করতে পারছে। আর সেটা বুঝতে শুরু করেই সে তার চারপাশের জগৎ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তার ভিতরের শূন্যতাবোধটা কেটে যাচ্ছে। রাজেনের শূন্য তাকে ভরাট করে দিল।

কুন্তী আসছে। দুহাতে উপচে পড়ছে অস্ত্র।

'রুনিদি, এইগুলোই পেলাম। হাসবেন না, হাসবেন না, খুব কাজে দেবে। পল্টু যখন রাতে ক্লাব থেকে টং হয়ে ফিরে এক একদিন গণ্ডগোল বাধাবার উপক্রম করে, তখন এগুলো আপনাকেও হেল্প করবে, অন্তত কিছুক্ষণ তো গুণ্ডাফুণ্ডাদের আটকে রাখতে পারবেন।"

বলতে বলতে কুন্তী টেবিলের উপর জিনিসগুলো রাখল। প্লাস্টিকের দুটি খালি ওয়াটার বটল দেখিয়ে বলল, "এগুলো ছুঁড়ে মারার জন্য। জল ভরে দিচ্ছি, দেখুন এক একটা কী ভারী হয়ে যাবে। আর যদি স্ট্র্যাপ ধরে বনবন করে ঘোরাতে পারেন, আচ্ছা আপনি টিভিতে ওলিম্পিক্সের হ্যামার থ্রো দেখেছেন ?" কুন্তী বেসিনের কল থেকে ওয়াটার বটলে জল ভরতে ভরতে প্রশ্ন করল।

"দেখেছি মনে হচ্ছে।" রোহিণী হাসবে না ঠিক করে ফেলেছে।

"এই দেখুন, এইভাবে হ্যামার ঘোরায়।"

কুন্তী কাঁধে ঝোলানোর ফিতের মত স্ট্র্যাপটা দুহাতে ধরে ওয়াটার বটল্‌টা বৃত্তাকারে ঘোরাতে শুরু করল। "পণ্টু আর এগোতে পারত না। অবশ্য বসে পড়লে মাথার ওপর দিয়ে বট্‌লটা বেরিয়ে যাবে। এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন।"

"পণ্টু কি বসে পড়ত ?"

"চট করে বসেই, ডাইভ দিয়ে একদিন আমার পা দুহাতে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে ফেলে দিয়েছিল। য়ু মাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিজ গুণ্ডাস।"

"তোমাকে ফেলে দিয়েছিল, তাহলে শব্দও হয়েছিল, তাইতে মাসিমার ঘুমও ভেঙে গেছিল নিশ্চয় ?"

"নো নো রুনিদি, এই সময় আমারা দুজনেই একদম সাইলেণ্ট থাকি, একটা কথাও বলি না। পাশের ঘরেই তো মাসিমা ! আর হ্যাঁচকা টানে মেঝেয় তো পড়িনি, খাটের ওপর পড়েছিলুম !"

"সব্বোনাশ ! শ্রীমান পণ্টু তখন কি করল ?"

"পণ্টু তখন...," কুন্তীর ওয়াটার বটল ঘোরানো বন্ধ হয়ে গেল। ভ্রু কুঁচকে, চোখ সরু করে সে সন্দেহজনক চাহনি রাখল রোহিণীর মুখে।

"ওয়েল, পণ্টু ইজ নট আ গুণ্ডা। সুতরাং তখন একজন ভদ্রলোকের যা করা উচিত, সে তাইই করল। আর এই বিষয়ে কথা নয়। একটা কথাও নয়। আমরা এখন গুণ্ডাদের ফেস করার জন্য প্রিপেয়ার্ড হচ্ছি, পণ্টুকে সামলানোর জন্য নয়, সুতরাং ব্যাপারটাকে একভাবে দেখাটা ঠিক হবে না। পণ্টু যেভাবে ডজ করেছিল, মনে রাখবেন ও একবছর জুনিয়র বেঙ্গল টিমে ফুটবল খেলেছে, গুণ্ডারাও যে সেইভাবে ডজ করতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি ওয়াটার বটল ডিফেন্স ভেদ করে ওরা এগিয়ে আসে, তখন আপনি এইটে হাতে নেবেন।" কুন্তী একটা তিন ব্যাটারির টর্চ এগিয়ে ধরল।

রোহিণী টর্চটা হাতে তুলে ওজন পরীক্ষা করল। নিজের মাথায় হালকাভাবে ঠুকে বলল, "বেশ ভারীই দেখছি। এটাকে কি কখনো পণ্টুবাবুর ওপর প্রয়োগ করে দেখেছ ?"

"না, রুনিদি, আমাকে ও একটা চান্সও দেয়নি। বরং আমার মাথাতেই একদিন ঠকাস করে মেরে একটা আলু তৈরি করে দিয়েছিল।"

"কিন্তু আমি কি আলুর চাষ করার জন্য ঠকাস করব, না নারকোল ভাঙার মত করে মারব ?"

"আপনি নারকোল ভাঙারই চেষ্টা করবেন। কিন্তু মাথা যদি খুব শক্ত হয়, আপনি নিশ্চয় জানেন এক একটা নারকোল খুব বেয়াড়া ধরনের হয়, এক ঘায়ে ভাঙে না, তা হলে কি করবেন ?"

"চেঁচাব।"

"আহ্হা, সে তো করবেনই। কিন্তু অ্যাটাকটা তো কিছুক্ষণ সামলাতে হবে! নখ দেখি?" রোহিণীর হাত তুলে ধরে আঙুল পরীক্ষা করে কুন্তী হতাশ হল। "বড্ড সেকেলে আপনি। নিজেকে ডিফেন্ড করার কোন ব্যবস্থাই করেননি। নখগুলো সব কেটে রেখে দিয়েছেন?"

"আমার দাঁত কিন্তু খুব স্ট্রং।"

"না, না, কামড়াবেন না যাকে তাকে। খুব আনহাইজিনিক। পল্টুকে পর্যন্ত আমি কামড়াইনি কখনো! আপনি বরং চুলের এই কাঁটাটা রাখুন। কিন্তু রুনিদি, কাঁটা তো খোঁপায় গুঁজে রাখতে হবে, আর আপনি একেলে ফ্যাশনে চুল কেটে কি মুশকিল বাধিয়েছেন বলুন তো! কাঁটা গুঁজব কোথায়?"

কুন্তীর হাত থেকে রুপোর কাঁটাটা নিয়ে রোহিণী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মাথার ঠিক উপরের চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বলল, "এইভাবে রাখলেই হবে।"

"মাসিমার দেওয়া, খুব সাবধান, হারায় না যেন। তবে নেহাৎই যদি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে চোখেই ঢুকিয়ে দেবেন। আর এটাও যদি ফেইল করে, তাহলে, লাথি! কিন্তু রুনিদি আপনার ওই ফিনফিনে হালকা জুতোয় বা চটিতে তো কাজ হবে না!"

"শুধু পায়েই লাথি মারব।"

"ধ্যেৎ, তাতে কিসসু হবে না। আমি বরং পল্টুর সরু মাথাগুলো একজোড়া জুতো দিয়ে যাব। ওটা সবসময় পরে থাকবেন। অবশ্য একটু ঢিলে হবে, তা হোক। আর এই স্কিপিং রোপটাও রেখে দিন। টুল বক্সে তো বিশেষ কিছু পেলাম না, তবে এই স্ক্রু ড্রাইভারটা হয়তো কাজ দিতে পারে। আচ্ছা হ্যাক স্য কি দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে?"

"না না, ওটা লাগবে না, তুমি নিয়ে যাও। করাত চালাবাব সময় পাব না। যা দিয়েছ, এই যথেষ্ট।"

কুন্তীর মুখের উদ্বেগ কিন্তু কাটল না। ঠোঁট কামড়ে জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে খুবই চিন্তিত স্বরে সে বলল, "যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয়। আপনি নিশ্চয় মনে মনে হাসছেন, কিন্তু এইসব ছোটখাট জিনিসই বিপদের সময় যা কাজ দেয়,... রামচন্দ্র পর্যন্ত কাঠবেড়ালিদের হেল্প রিফিউজ করেননি।... অচল করে দেব বলে থ্রেট করে গেছে লোকটা, হাল্কাভাবে কথাটাকে কিন্তু নেবেন না। আমি অবশ্য সজাগ থাকব, জানালা দিয়ে গেটের দিকে নজরও রাখব। আপনার ফ্ল্যাটের বেল বাজলেই উঠে আসব।"

"তা এসো, বেল না বাজলেও এসো। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ হলে যে মরে যাব।"

"তাহলে সেই ভদ্রলোককে এখানে আসতে বলুন। পাহারা দেবার জন্য একজন পুরুষমানুষ থাকলে ভালই হবে। ঠিকানা দিন. আমি গিয়ে খবর দিয়ে আসছি।"

"সে এসে কি করবে, আমার সঙ্গে থাকবে?"

"নিশ্চয়"

"বিয়ের আগেই?"

"নিশ্চয়। রুনিদি আপনি বড্ড সেকেলে। বিয়ের আগে কি—" কুন্তী থেমে গেল। ঠিক কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করা উচিত বুঝতে না পেরে সে অর্থহীন হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলল। রোহিনী মনে মনে সিঁটিয়ে হাসিটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করল। ভাগ্যিস রাজেন এখন জয়পুরে। সবে মাত্র তো কাল খেলা শেষ হয়েছে।

"কুন্তী, সেই ভদ্রলোক আমার থেকেও সেকেলে, প্রচণ্ড কনজারভেটিভ, ভীষণ

পিউরিটান। এখানে এসে আমাকে পাহারা দিতে বললে যে কি কাণ্ড বাধাবে....উরি বাবা, ভাবলেই শিউরে উঠছি।"

"না না তাহলে দরকার নেই বলার। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আমি তো আছিই। পল্টুটা যদি এখন থাকত...আরও চারদিন লাগবে ওর ফিরতে। জানেন, পল্টু দেড়মাস ক্যারাটে শিখেছিল। একদিন আমাকে দেখাতে গিয়ে হাতটাকে কাটারির মত কবে ঘাড়ের এইখানে এমন একটা— ।"

"য়্যাঁ, মারল ! তুমি নিশ্চয় পড়ে গেলে .খাটে ?"

"ঠাট্টা করছেন ? আমি চললাম।"

কুন্তী সত্যিই চলে গেল। ও বেবিয়ে যাওয়া মাত্রই রোহিণীর মন থেকে হাল্কা স্বাচ্ছন্দ্যটা ঝরে গিয়ে থমথমে গুমোট একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠল। এখন তাব কিছুই করার নেই এবং যথেষ্টই করার মত কাজ বয়েছে। কোনটা সে বেছে নেবে ?

গঙ্গাদা অস্বস্তিতে পড়েছেন একটা ব্যাপারে আর সেই জন্যই এই সকালে মোমিনপুব থেকে সল্টলেকে ছুটে আসা। সুজাতা গুপ্ত যদি মামলাটা খুঁচিয়ে তোলেন, তাহলে গঙ্গাদা মুশকিলে পড়বেন। সুজাতা গুপ্তকে নিবস্ত কবাব ভাব নেওয়াব জন্যই তাকে বলতে এসেছিলেন। কিন্তু কথাবার্তা যেভাবে এগোল তাতে গঙ্গাদা বুঝে গেছে, কোন সাহায্যই তার কাছ থেকে পাবেন না, বরং পাবেন বিরুদ্ধতাই। এক্ষেত্রে গঙ্গাদা প্রথমে কি করবেন ?

রোহিণী ভেবে দেখল, সুজাতা গুপ্ত বিপজ্জনক হয়েছেন দিগম্বর বর্ধন লেনে গিয়ে একটা খবর জেনে যাওয়ায়। গঙ্গাদা নিশ্চয় বুঝে গেছেন, কাজটা গীতা বা বিশ্বনাথের। ওই দুজনকে অচল করে দিলে সুজাতার চেষ্টাটা ভস্মে ঘি ঢালার মত ব্যাপাবই হবে।

গঙ্গাদা অসম্ভব ধূর্ত লোক। কাল রাতে মীনাব ঘবে যা ঘটেছে, টেলিফোনের মধ্য দিয়ে সেটা জেনে ফেলার ব্যাপারটা কেমন চট কবে বুঝে নিলেন। তাহলে তো উনি প্রথমে টার্গেট করবেন গীতা, বিশ্বনাথ আব পবমেশকেও। কিন্তু তিনজনকে অচল কবে দেওয়াটা তো ছোটখাট ব্যাপাব নয়, হৈ চৈ পড়ে যাবে। এক্ষেত্রে গঙ্গাদাব স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে ?

রোহিণী পায়চাবি শুরু কবল। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে : বিশ্বনাথ, গীতা, পরমেশরা এত বছব যখন চুপ কবে ছিল, তখন চুপ কবেই থাকবে। ওদেব কোন মাথাব্যথা নেই শোভনেশ সম্পর্কে। কোর্টঘর, পুলিশ, উকিল ব্যাবিস্টাব এসব ঝামেলায জড়াতে হলে যথেষ্ট টাকাও তো চাই। ওরা কি দুঃখে এতে জড়াবে ? তাছাড়া নারানেব বাপেব হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেই ওরা মুখে চাবি আঁটবে। সুজাতা গুপ্ত ওদেব কথার ভিত্তিতেই মামলা তুলতে চান। তা এই বৃদ্ধাকে সরিয়ে দিলেই তো গঙ্গাদা ঝামেলামুক্ত হতে পারবেন।

পায়চারি থামিয়ে রোহিণী ভাবল, উপরে গিয়ে ব্যাপারটা সব খুলে বলে হুঁশিয়ার করে দেওয়া দরকার 'সাবধানে থাকবেন মাসিমা। গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি কিন্তু আপনাকে অচল করে দেবার চেষ্টা করবেন।'

উপরে যাবার জন্য শাড়ি বদলাতে রোহিণী শোবার ঘরে এল। আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে চিরুনি তুলে চুলে দিতেই রুপোর কাঁটাটা মেঝেয় পড়ে গেল। কাঁটাটা তোলার জন্য নিচু হতেই চোখে পড়ল, খাটে বালিশের পাশে কুন্তীর টেপ রেকর্ডারটা। নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। তারপর তার মনে হল, এই টেপেই তো রয়েছে গীতা আর

পরমেশের ভাইটাল কনফেশন ! গঙ্গাদা টেপ করার কথাটা জানেন না। কিংবা ওদের কাছ থেকে পরে শুনতেও পারেন, সালোয়ার কামিজ পরা, একটা রোগা মেয়ে এসে তাদের কথা বলার সময় একটা ছোট বাক্স সামনে রেখেছিল। ধূর্ত গঙ্গাদা বুঝে যাবেন বাক্সটা কী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা নেবেন মেয়েটার ! ভাববার চেষ্টা করবেন, কে এই রোগা মেয়েটা ? কুন্তীকে উনি দেখেননি।

গঙ্গাদা তাহলে আবার আসবেন। টেপ করার পিছনে আমার হাত আছে কিনা জানার চেষ্টা করবেন। যতক্ষণ না জানছেন, ততক্ষণ আমাকে অচল করার কাজে নামবেন না। টেপটা না হাতিয়ে উনি কোনভাবেই নিজেকে নিরাপদ বোধ করবেন না।

রোহিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খাটে বসে পড়ল, রেকর্ডারটটা কোলে নিয়ে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবল, এটাই এখন আমার সিকিউরিটি। গঙ্গাদা যত তাড়াতাড়ি এটার কথা জেনে যান, ততই নিরাপদ হওয়া যাবে। সুজাতা গুপ্তর কাছে কে মুখ খুলেছে, সেটা জানার জন্য গঙ্গাদা নিশ্চয় এখান থেকে সোজা দিগম্বর বর্ধন লেনে যাবেন। তার মানে এতক্ষণে হয়তো জেনে গেছেন, শোভনেশকে জেলে পাঠানোর জন্য তাঁর সাক্ষ্যলোপের ব্যবস্থার কথা কেউ একজন প্রমাণ করার উদ্যোগ নিতে পারবে। সুতরাং গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি ..এবার তুমি পাগলের মত টেপটা খুঁজে বেড়াও।

সন্ধ্যার সময় কুন্তী এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল ভিডিও ফিল্ম দেখে সময় কাটাবার জন্য।

"দুপুরে বেরিয়ে দোকান থেকে দুটো ক্যাসেট ভাড়া করে এনেছি, ক্যারাটে আর কুংফু ফিল্ম। আমার মনে হল, এখন আপনার এই রকম ছবিই দেখা দরকার। মনের জোর বাড়বে, তাছাড়া কিভাবে অ্যাটাক আসে, কিভাবে সামলে পাল্টা অ্যাটাক করতে হয় সে সম্পর্কে একটা আইডিয়াও পেয়ে যাবেন।"

"দুটো ফিল্ম দেখেই শিখে যাব ? বলো কি ! হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি, ডিগবাজি খাওয়া, লাফ মারা, টেবিল চেয়ার ছোঁড়া, এসবের দবকার হবে না ?"

"হবে হবে, এত তাড়াহুড়োর কি আছে। আমি তো বলেছি, শুধু আইডিয়া পাওয়ার জন্য দেখা দরকার।"

ভিসিপি-তে ক্যাসেট গুঁজে দিয়ে, সুইচ টিপে কুন্তী বসল টিভি সেটের সামনে। গলা নামিয়ে রোহিণী বলল, "মাসিমা কোথায় ?"

"এই বেরোলেন, নিচের ফ্ল্যাটে বন্ধুর সঙ্গে পরচর্চা করতে।"

প্রথম ছবিটা শেষ হবার পর কুন্তী একটু উত্তেজিত হয়েই বলল, "এবার বুঝতে পারলেন, কিভাবে আপনাকে পজিশ্যন নিয়ে দাঁড়াতে হবে ! দরজাটা খুলেই চট করে কিরকম সরে যেতে হবে !" বলতে বলতে সে ক্যাসেট বদল করে দ্বিতীয়টা ভরছিল। রোহিণী "উহুহু" বলে কাতরে উঠল।

"কি হল রুনিদি ?"

"কলিক পেনের মত একটা যন্ত্রণা...কালকেও হয়েছিল। আমি বরং এখন যাই, শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। তুমি বরং একটা গল্পের বই-টই দাও।"

"তা দিচ্ছি। কিন্তু মাসিমাকে যে বলেছিলাম, রুনিদিকে রাতে খেতে বলেছি। আপনার জন্য উনি রান্না করেছেন। খেয়ে যেতে পারবেন না ?" কুন্তী উৎকণ্ঠিত চোখে তাকাল।

"আবার কেন এসব করা।" পেটে হাত রেখে রোহিণী বহু কষ্টে কথাগুলো বলল।

“তা কি রান্না করেছেন ?”

“এঁচোড়ের কি যেন, বোধহয় কোপ্তা। কিন্তু এখন কি হেভি মশলা দেওয়া এসব আপনার—”

“উচিত কুন্তী, উচিত। গুরুজনদের অসম্মান করা হবে, যদি আমি এখন না খাই। কত যত্ন করে রান্না করা !”

আধঘন্টা পর শরৎ-সমগ্র হাতে নিয়ে কুন্তীদের ফ্ল্যাট থেকে রোহিণী যখন বেবোল, মাসিমা তখনো ফেরেননি। কুন্তী তাকে তিনতলায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। বোহিণী আপত্তি জানায়।

“দোতলা থেকে তিনতলায় যাব, তাতেও ভয় ?”

“বুঝছেন না। সিঁড়িটা নির্জন। ফট করে যদি চারটে লোক ওপর থেকে নেমে আসে ! ফিল্মে তাহলে কি দেখলেন ?”

“যদি নেমে আসেই, আমরা দুটো মেয়ে তাহলে কি করতে পারি ?”

“নাহ্ আপনাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। ঠিক আছে যা ইচ্ছে হয় করুন।” কুন্তী দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ দরজার দিকে স্নেহ ভবে তাকিয়ে রোহিণী মাথা নাড়ল আর মনে মনে বলল, পাগলামি করে তুমি যা তুলে এনেছ, সেটাই এখন আমাব রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি রোহিণীর সঙ্গে দেখা হল হৃদয়রঞ্জনের। একটু উদ্বিগ্ন চোখে তাব দিকে তাকিয়েই নেমে যাচ্ছিলেন। রোহিণী পিছন থেকে ডেকে বলল, “মাসিমা কেমন আছেন ?”

“ভালই।” তারপর ইতস্তত করে হৃদয়রঞ্জন বললেন, “বিকেলবেলায় বেবিযেছে, এখনো ফিরল না।”

“মাসিমা ? কোথায় গেছেন ?”

“জানি না। কিছু বলেও যায়নি। একটা লোক এসে ওর সঙ্গে কথা বলে চলে গেল। কি যে কথা হল জানি না। তারপরই বলল, আমি একজনেব সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এখনি আসছি। শুধু এইটুকু বলে কাপড় বদলে বেরোল।”

“দেখুন, এখনি হয়তো এসে পড়বেন। তবে বিকেলবেলায় এভাবে বেবোনো উচিত হয়নি। যে লোকটা এসেছিল, তাকে দেখতে কেমন ?”

“মাঝবয়সী, ধুতি শার্ট পরা, রোগা মতন।”

হৃদয়রঞ্জন যে বর্ণনা দিলেন, সেরকম লোক কলকাতার রাস্তায় অন্তত হাজার পঁচিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোহিণী কয়েক সেকেণ্ড হৃদয়রঞ্জনের চশমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?”

“কোথাও না। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।“ খোঁড়া পায়ের জন্য দুলে দুলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। তখন বোহিণীর মনে হল, সকালবেলাতেই সে ভেবেছিল, সুজাতা গুপ্তও বিপদের মুখে এসে পড়েছেন। গঙ্গাদা ওঁকে অচল করবার চেষ্টা করবেন। তিনিই হয়তো কাউকে দিয়ে এই বৃদ্ধাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেছেন।

বিষণ্ণ মনে রোহিণী ফ্ল্যাটে ফিরে এসে শরৎসমগ্র বইটা শোবার ঘরের খাটে রাখল। একমাস ধরে, দিনে দুঘন্টা টানা পড়ে গেলেও বইটা শেষ করা যাবে না। ম্যাক্সিটা পরার জন্য সে নিরাবরণ হল। আড়চোখে একবার আয়নায় নিজেকে দেখে পেটে আর কোমরে হাত বোলাল। পিঠের দিকে হাত ঘুরিয়ে পেশি খামচে ধরল। অস্ফুটে বলল, এখনো

জমেনি। তারপর মনে হল, শরৎচন্দ্রের পুরো কালেকশনটা যদি চিত হয়ে বুকে রেখে, দিনে একঘণ্টা পড়া যায়, তাহলে শরীরের কতকগুলো জায়গার ব্যায়ামের আর দরকার হবে না।

টেবল ল্যাম্প জ্বেলে চিত হয়েই সে বই পড়া শুরু করেছিল। মিনিট পনেরো পরই চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। ধীরে ধীরে পাতা বুজে আসছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত ঘুম ঝরে পড়ছে। সে শুনতে পাচ্ছে, কোথায় যেন ঘড়ি বাজছে। কিন্তু বাজার ছন্দটা একটু যেন অন্য রকম। থেমে গিয়ে আবার বাজল। কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার বাজল। মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা জাগছে। বিরক্তি ধরছে। রোহিণী চোখ খুলল।

কি আশ্চর্য, এতো তার ফ্ল্যাটেরই কলিং বেল বাজছে! এত রাত্রে কে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রোহিণী। বুক থেকে বইটা মেঝেয় পড়ে ধপ্ করে শব্দ হল। বইটা কুড়োবার সময় দেখল, পন্টুর একজোড়া সরু মুখ জুতো খাটের নিচে, সোজা হয়েই চোখে পড়ল টেবলে জলভরা ওয়াটার বটল, স্ক্রু ড্রাইভার, টর্চ, স্কিপিং রোপ। টেবল ল্যাম্পের পাশে চুলের কাঁটা। সে হাওয়াই চটি পায়ে গলিয়ে ঘরের আলো জ্বালল। দরজার দিকে এগোল বইটা হাতে নিয়েই।

রোহিণী আই হোলে চোখ রাখল। কি কাণ্ড! লোক কোথায়? মুখ তুলে কলিং বেল যন্ত্রটার দিকে তাকাল। এটাই কি বেজেছে, না অন্য কোন ফ্ল্যাটে?

"টিং টং।"

তাড়াতাড়ি সে আই হোলে চোখ রাখল। কেউ নেই। মাথা কাত করে আই হোল দিয়ে দুপাশে যতটা দেখা যায়, দেখল। একটা আরশোলা পর্যন্ত নেই। বেলের সুইচটা ল্যাণ্ডিং-এ দরজার পাশে, ভিতর থেকে সেটা দেখা যায় না। কেউ একজন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বেল টিপছে।

রোহিণীর গলা শুকিয়ে এল। বুকের মধ্যে স্পন্দনের শব্দ সে কানে শুনতে পাচ্ছে। দুহাতে সমগ্র শরৎচন্দ্র আঁকড়ে সে বলে উঠল—কে? কিন্তু গলা দিয়ে একটু হাওয়া বেরোনোর শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোল না।

"টিংটং।"

আবার। কটা বাজে এখন? দশটা? বারোটা? যতটাই বাজুক, সারা বাড়ি, সারা এলাকা এখন নিঝুম এই সময় তার ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজাবার মত লোক পৃথিবীতে কে আর থাকতে পারে, একমাত্র গঙ্গাদার পাঠানো খুনীরা ছাড়া! কথাটা ভাবামাত্রই তার সারা দেহ শক্ত হয়ে উঠল। আর একটা শীতল অনুভব বুক থেকে তলপেটে নেমে এল।

'কে?" এবার গলা দিয়ে শব্দ বেরোল। মস্তিষ্ক কাজ করেছে। "কে এত রাতে?"

"আঁমি ভূত।" নাকি সুরে ভূতের গলা ভেসে এল দরজার পাশ থেকে। হাঁফ ছাড়ল রোহিণী। খুনীরা কলিং বেল টিপে আর যাই হোক ফাজলামি করবে না।

"কে তুমি? মাঝরাতে লোকের বাড়িতে বেল টিপে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে? মেরে মাথা ভেঙে দেব।" রোহিণী একহাতে শরৎচন্দ্রকে শটপাট করার ভঙ্গিতে ঘাড়ের কাছে ধরে অন্য হাত দরজার হাতলে রাখল।

ধপ করে একটা শব্দ হল। ভারী কিছু একটা যেন মেঝেয় ফেলল।

"আঁমি খুঁব বিঁপন্ন। আঁশ্রয় চাঁই রাঁতের মঁত। আঁমি আঁপনার ঘাঁড় মঁটকাব নাঁ, আঁমি ভঁদ্দরলোঁক ভূঁত।"

শব্দ না করে সন্তর্পণে রোহিণী দরজার হাতল ঘোরাল। পাল্লাটা এক সেন্টিমিটার মত

ফাঁক করে সে একচোখ দিয়ে তাকাল।

একটা লম্বা খয়েরি রঙের ক্যানভাস আর চামড়া মোড়া ব্যাগের একটা কোণ আর তাতে ঝোলানো ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ব্যাগেজ টিকিট সে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার মধ্যে সাইক্লোন আর টর্নাডোর মিশ্রণে ওলট পালট করা তুমুল একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়ে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিল।

এক ঝটকায় দরজাটা খুলেই হাতের বইটা নিচের সিঁড়ির দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রোহিণী লাফিয়ে ভূতের গলা জড়িয়ে ঝুলতে শুরু করল দুই হাঁটু পিছনে মুড়ে। আর রাজেন ভীত চোখে তাকিয়ে রইল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা রোগা মেয়েটির দিকে, যার একহাতে ঝুলছে ওয়াটার বটল অন্য হাতে হ্যাক স্য।

"এই ছাড়ো ছাড়ো, আমাব গায়ে অত জোর নেই যে, গন্ধমাদন তুলতে—"

"আঁমি শাঁকচুঁন্নি, এঁইবাঁর ঘাঁড় মঁটকাঁব।" গলা জড়ানো দু হাত দিয়ে টান দিল রোহিণী। রাজেনের মুখটা নিচু হতে হতে নাকের সঙ্গে নাক ঠেকে গেল। তারপর রোহিণীর হাঁ করা মুখের মধ্যে ঠোঁট দুটি ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

"আমি ভালবাসি।"

"আমি তা জানি।"

"কিন্তু এটা জান কি, সিঁড়িতে একজন দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে?"

"দেখুক। সারা পৃথিবী দেখুক। কিছু কিছু জিনিস দেখিয়ে বড় সুখ হয়।"

"সেকেণ্ড ইনিংসে জিরো করেছি।"

"আমার সেকেন্ড ইনিংসে ব্র্যাডম্যান খেলবে।"

"আমি আর খেলব না, রিটায়ার করব।"

"খেলা কখনো ফুরোয় না, এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে সরে যায় শুধু।"

খুক খুক শব্দ হল।

"রুনিদি, এখন রাত সওয়া এগারোটা।" গম্ভীর স্বরে কুন্তীর চাপা ধমক শোনা গেল। রাজেনের গলা থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে রোহিণী মেঝেয় পা রাখল। কাঁচুমাচু মুখে রাজেন তাকিয়ে রইল কুন্তীর দিকে।

"ওয়ান্ট এনি হেল্প, রুনিদি?"

"ইয়েস। তুমি যদি এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমোতে যাও, তাহলে—"

"ইনি?"

"আমার পাহারাদার।"

"আপনি কি এখন সেফ হ্যাণ্ডে?" কুন্তীর গলায় কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা।

"না।"

মেঝে থেকে রাজেনের ক্রিকেট গিয়ার্সের ভারী ব্যাগটা এক হাতে, সুটকেসটা অন্য হাতে তুলে নিয়ে রোহিণী পা দিয়ে দরজার পাল্লাটা খুলে ভিতরে যেতে যেতে বলল, "রাত্তিরে ভূতের হাতে সেফ্ থেকেছে পৃথিবীতে এমন মেয়ে দেখাতে পারবে?"

দরজা বন্ধ হল।

হাতে ধরা বইয়ের কোণা থ্যাঁতলানো মলাটের দিকে তাকিয়ে কুন্তী অনুযোগের সুরে বিড়বিড় করল, "শরৎচন্দ্রকে ছুঁড়ে এই দশা হল, মাসিমা দেখলে আমার যা হবে না!"

দুহাতের মোট মেঝেয় নামিয়ে রেখে রোহিণী এবার গম্ভীরমুখে রাজেনের দিকে তাকাল। ওর চোখের ভাষাটা পড়ে নিয়ে রাজেন আমতা আমতা করে কিছু একটা বলতে

যাচ্ছে, তার আগেই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন হল : "এখন, এই সময়ে, কি ব্যাপার ? জান, আমি এখানে একা থাকি।"

"একে একে উত্তর দিচ্ছি। প্রথমে, এখন কেন ? কারণ চল্লিশ মিনিশ আগে দিল্লির প্লেন দমদমে নেমেছে। সেখান থেকে মাল খালাস করে বেরিয়ে এক ডাক্তারের গাড়িতে লিফট্ পেয়ে এখানে এখন, এই সময়ে। দ্বিতীয়টা হল, কি ব্যাপার ? কাল খেলা শেষ হবার পরই রাতের প্লেনে জয়পুর থেকে দিল্লী আসি। ভেবেছিলাম, ভোরের ফ্লাইটে কলকাতা চলে আসব। কিন্তু সেই ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে গেল। গ্রাউণ্ড স্টাফের একজনকে সাসপেণ্ড করায় অ্যাজিটেশন, কর্মবিরতি, তারপর অবধারিত পুলিশ, লাঠিচার্জ, ফলে প্লেন আর উড়ল না। অবশেষে আলোচনা, সাসপেনশন প্রত্যাহার করে প্লেন উড়ল বিকেলে। তাতে জায়গা পেলাম না। রাত সাড়ে আটটার ফ্লাইটে সিট পেলাম প্রায় হাতে-পায়ে ধরে। প্লেনে পাশের সিটেই এক ডাক্তার। ক্রিকেটের খবর রাখে। বাড়ি সল্টলেকে। দমদমে তাকে নিতে গাড়ি এসেছিল। আমাকে বলল, উল্টোডাঙার মোড় পর্যন্ত লিফট দিতে পারি। ওখানে ট্যাক্সি পেয়ে যাবে। উল্টোডাঙায় এসে মনে হল, তোমার এত কাছে এসে একবার দেখে যাব না ?"

রাজেন চুপ করে শুধু তাকিয়ে রইল। রোহিণীর মন ভিজল কিনা সেটা না বুঝে আর এগোতে ভরসা পাচ্ছে না।

"তৃতীয়টা ?"

"তুমি যে একা থাক, সেটা খেয়াল হল ডাক্তার এখানে নামিয়ে দিয়ে যাবার পর। কিন্তু আমি তো এখনি চলে যাব।"

"কিভাবে ? সল্টলেকে রাত সাড়ে এগারোটায় বাস, ট্যাক্সি, সাইকেল রিক্সা, এমনকি ঠেলাগাড়িও পাবে না, শুধু মশা আর রাস্তার কুকুর ছাড়া।"

"তাহলে হেঁটেই বাড়ি যাব। একরাতের জন্য এই দুটো জিনিস রাখতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না ?"

"এখান থেকে সাদার্ন অ্যাভিনু হেঁটে যাবে ?" এই মাঝরাতে ? ভাল....তাই যাও।"

রাজেন কথা না বলে ধীরপায়ে এগিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। দরজা বন্ধ হতেই রোহিণী বন্ধ পাল্লার কাছে দ্রুত এসে আই হোলে চোখ রাখল। রাজেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। দরজাটা খুলে গলা বাড়িয়ে রোহিণী চাপাস্বরে বলল, "বীরত্ব ? শিভালরি ? খুব হয়েছে।"

কোন জবাব এল না বা রাজেনের প্রত্যাবর্তনও ঘটল না। একতলার সিঁড়ি থেকে ড্রাইভওয়েতে বেরিয়ে এসে রাজেন গেটের দিকে যাচ্ছে, তখন দোতলার বারান্দা থেকে গলা ভেসে এল, "ও মশাই, এত রাতে বেরোচ্ছেন যে ? আপনার না রুনিদিকে পাহারা দেওয়ার কথা ?"

রাজেন থতমত হয়ে মুখ তুলে তাকাল। বাইরের দেওয়ালে জ্বলা ইলেকট্রিক আলোয় তার মনে হল, সেই মেয়েটিই, যে ওয়াটার বটল হাতে রোহিণীকে বলেছিল, 'ওয়ান্ট এনি হেল্প ?'

"ও বলল পাহারার দরকার নেই।"

"বললেই হল ? আপনি ওপরে আসুন।"

রীতিমত হুকুম। দোনামনা করে রাজেন দোতলায় উঠতেই দেখল সেই মেয়েটিই, তার ফ্ল্যাটের দরজা ভেজিয়ে ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে।

"পাহারা লাগবে না মানে ? আমি নিজের কানে শুনেছি, থ্রেট করে গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি আজ সকালেই ওকে বলল, অচল করে দেব। তার মানে মার্ডার করবে রুনিদিকে। এমন বিপদের মধ্যে একা রয়েছে আর আপনি ওকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন ?"

"আমি তো এ সবের কিছুই জানি না !" রাজেন হতভম্ব। "আমাকে তো এসব কিছুই বলল না !" তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার মাথার মধ্যে।

"আশ্চর্য লোক বাপু ! যান, শিগ্‌গিরি ওপরে যান।"

"কিন্তু, ও একা··· আমি কি করে···"

"আপনিই তো সেই লোক, যিনি রুনিদিকে বিয়ে করবেন, রাইট ?"

"হ্যাঁ, না, মানে···ও আমাকে বিয়ে করবে।"

"তাহলে রাতে থাকতে অসুবিধে কোথায় ?"

"আমার দিক থেকে তো···।"

"আশ্চর্য লোক তো আপনি ! দেখতে তো ম্যানলিই লাগছে, করেন কি ?"

"ক্রিকেট খেলি, এঞ্জিনিয়ারও।"

"গেট ক্র্যাশিং কাকে বলে জানেন ? দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ুন। আসুন··· আস্তে কথা বলবেন, সবাই ঘুমোচ্ছে।"

"ক্র্যাশিংয়ের শব্দে তো ঘুম ভেঙে যাবে !"

"সেভাবে ক্র্যাশ নয়।" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কুন্তী পিছনে তাকিয়ে বলল, "রুনিদির কিছু এথিক্স আছে তো। পিউরিটান ধরনের মানুষ···আপনি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। ক্র্যাশ আমি করব।"

বেল টিপতে গিয়ে, কি ভেবে, কুন্তী দবজায় খুটখুট টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গেই দবজা খুলে গেল। রোহিণী প্রথমে কুন্তীর মুখে তারপর মুখের পাশ দিয়ে দৃষ্টিটা সিঁড়ির দিকে পাঠিয়ে খুঁজতে শুরু করল।

"তুমি আবার যে ? ঘুমোওনি ?"

"আমার জিনিসগুলো নিতে এসেছি।" কুন্তী ভিতরে ঢুকে এল। "পল্টুর জুতোটা কোথায় রেখেছেন ?"

"শোবার ঘরে। কিন্তু কাল সকালেও তো নিতে পারতে ?"

"না এখনি দরকার। অপরিচিত একটা পুরুষমানুষ ফ্ল্যাটে রাতে থাকবে, পল্টুও নেই, লোকটা কেমন তাও জানি না ! হাতের কাছে কিছু তো রাখা দরকার।"

"কে থাকবে তোমার ফ্ল্যাটে ? রাজেন !"

"ওনার নাম রাজেন বুঝি ?···ইস্‌স্ ভদ্রলোক নিচে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে যেভাবে চোখ মুছছিলেন, দেখে বড় মায়া হল।"

"রাজেন কাঁদছিল !"

"আমি দৌড়ে নেমে গেলাম। উনি বললেন, রোহিণী আমায় তাড়িয়ে···।"

কুন্তীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রোহিণী তীর বেগে সিঁড়ির দিকে ছুটল। কুন্তী ছিটকে পড়েছিল দেয়ালে। নিজেকে দাঁড় করিয়ে একগাল হেসে সে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

রাজেনকে টানতে টানতে ভিতরে আনল রোহিণী।

"রুণিদি, আমি কি তাহলে—"

"হ্যাঁ, দয়া করে এবার গিয়ে ঘুমোও। তোমাকে আর বারান্দায় বসে নজর রাখতে হবে

না।

"কিন্তু এখনো তো আপনাদের—" কুন্তী চিন্তিত মুখে থেমে গেল।

"ওহ্‌হ্ কুন্তী ! তুমি আর একটা কথা যদি বলেছ...রাজেন, এত হাসির কি আছে ? একটু আগে তো গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বাচ্চাছেলের মত কাঁদছিলে, লজ্জা করে না ? ...কুন্তী, মাসিমা যদি দেখেন তুমি মাঝরাতে ফ্ল্যাটের বাইরে, তাহলে কি কাণ্ডটা হবে ভেবে দেখেছ কি ?"

"মাসিমা দেখবেন কি করে ? তিনি তো এত বড় একটা আফিংয়ের গুলি আর এক বাটি দুধ খেয়ে সেই যে বুঁদ হয়ে গেলেন, তারপর আমিই তো ওনাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। রুনিদি তাহলে কি উনি—"

"হ্যাঁ, উনি আজ রাতটা আমাকে পাহারা দেবার জন্য এখানে থাকবেন...এটা কি খুব হাসির কথা যে হাসছ ?"

"আপনি সবার মুখে শুধু হাসিই দেখছেন। পল্টু না থাকলে আমার যে কি কান্না পায়, সেটা আর আপনি বুঝতে চাইছেন না, ওর কথা ভেবে আমার ঘুম আসে না বলেই বারান্দায় বসে মশার কামড় খাই। গঙ্গা ব্যানার্জির গুণ্ডাদের উপর নজর রাখতে আমার বয়ে গেছে।" কথাগুলো বলে থমথমে মুখে কুন্তী দরজার দিকে এগোল।

"কুন্তী, আমি খুব দুঃখিত। সত্যিই এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।" রোহিণী এগিয়ে এসে কুন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরল। "এম্মা, বুড়ো মেয়ের চোখে জল !" রোহিণী ওর মাথার উপর গাল চেপে ধরল। কপালে চুমু খেল।

ধাতস্থ হয়ে কুন্তী দরজা খুলে ফ্ল্যাট থেকে বেরোল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কি একটা মনে পড়ায় থেমে গিয়ে ফিরে তাকাল। খোলা দরজায় রোহিণী দাঁড়িয়ে স্নেহ ভরে তাকিয়ে। কুন্তী হালকা পায়ে উঠে এসে রোহিণীর ঘাড়ের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "ক্র্যাশ কাকে বলে এবার দেখলেন তো ?"

"এ তো ভিভ রিচার্ডসের ইনিংস !"

দরজা বন্ধ করার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করল, "ক্র্যাশটা কি জিনিস ?"

"কঠিন বাধা চুরমার করে দেওয়া ! ইচ্ছে করছে, যে ম্যাক্সিটা এনেছি, সেটা ওকেই উপহার দিই।"

"থাক্ থাক্, তাহলে আড়াইটে কুন্তী লাগবে একটা নন্দার ম্যাক্সি ভরাতে। ...খিদেটিদে পাচ্ছে কি, খেয়েছ কখন ?"

"পাচ্ছে। প্লেনে ডিনার নামে [illegible]ভবা যে জিনিস সার্ভ করে, তাতে মাত্র ঘণ্টা চারেক পেটটাকে চুপ করিয়ে রাখা যায়।

"তাহলে ডিম পাউরুটি দিয়ে মোগলাই টোস্ট..."

"আহা হা হা, এখন আবার কষ্ট করে রান্নার দরকার কি ! তৈরি খাবার যা আছে, তাতেই তো রাতটা চলে যাবে।"

"তৈরি তো কিছুই নেই।" বিব্রত স্বরে কথাটা বলে রোহিণী কুণ্ঠিত চোখে তাকাল এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। হাত বাড়িয়ে সে টেবল থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে বলল, "গুণ্ডা দমনের জন্য কুন্তী এটা দিয়ে গেছে। ভাল ছেলের মত যদি এই চেয়ারটায় বসে না থাক, তাহলে মাথায় আলুর ক্ষেত তৈরি হবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে টোস্ট হয়ে যাবে, পেঁয়াজটা কাটতে শুরু কর।"

"কিন্তু রুনি, এক একটা মিনিট এখন আমার কাছে এক একটা বছর। পাঁচ মিনিট মানে

পাঁচ বছর, এতদিন উপবাস করলে কেউ বাঁচে না। এটা বোঝার মত হৃদয় কি ভগবান তোমায় দেননি ?"

"দিয়েছেন," রান্নাঘর থেকে জবাব ভেসে এল। "সেই সঙ্গে কিছু বুদ্ধিও। গঙ্গাদা এখন আমার বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

"কুন্তী আমায় বলল, সে নিজের কানে শুনেছে, আজ সকালেই গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি নাকি তোমায় মার্ডার করবে বলে থ্রেট করেছে ? সত্যি নাকি ? আমি তো ভাবলুম, মেয়েটি তোমার বিপদের কথা বলে ভয় ধরিয়ে আমাকে আটকাবার জন্য কথাটা বানিয়ে বলল, তাই আর গুরুত্ব দিইনি। তুমিও তো এতক্ষণ এ সম্পর্কে কিছু বলোনি ! আশ্চর্য লোক তো !"

রাজেন উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল। তার চোখে উৎকণ্ঠা। হাতে কুচোনো পেঁয়াজ। মুখ গম্ভীর।

"পাঁচ ছ'দিন ছিলাম না। দেখে গেছিলাম, তুমি খুব ডিস্টার্বড ছিলে।"

"হ্যাঁ ছিলাম, এখনও আছি। তারপর এই কদিনে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটেছে, অনেক ব্যাপার জেনেছি, এমনকি একটা খুনও হয়েছে, একজনের ফ্ল্যাটে গুণ্ডারা হামলা করে ছবিও চুরি করে নিয়ে গেছে। সবই তোমায় বলছি, আগে এটা করে নিই, তারপর খেতে খেতে শুনো।"

"তার আগে গায়ে জল ঢালা দরকার। সারাদিনে স্নান হয়নি। তোমার কি রাতের স্নান হয়ে গেছে ?"

প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবার জন্যই যেন রোহিণীর সর্বাঙ্গে চোখ বোলাল রাজেন। কুঁকড়ে গেল রোহিণী। পাতলা, ঢিলে ম্যাক্সিটার অন্তরালে কোন অন্তর্বাস নেই ; রাজেনের চোখ দেখে তার মনে হল, থাকার দরকার রয়েছে। সে ভ্রূ কুঁচকে পিছন ফিরল, মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে।

রাজেন লক্ষ করেছে রোহিণীর মুখভাব। গম্ভীর স্বরে বলল, "নিশ্চিন্ত থাকতে পার, রেপ কেসের আসামী হবার ইচ্ছে আমার নেই।"

"একটা আসামী নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, তারপর আর একটা কপালে জুটলে…। আচ্ছা, আমার এই শরীরটাকে ধ্বংস করে ফেললে হয় [illegible]হলে আর কোন ঝামেলার মধ্যে কাউকেই পড়তে হবে না।"

"চমৎকার প্রস্তাব। গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি [illegible] পুলকিত হবে। আমি আর পেঁয়াজ টেয়াজ কাটতে পারব না…বাথরুমে যা[illegible]"

"এই এই শোনো।" রোহিণী রান্নাঘর থেকে [illegible]রিয়ে এসে রাজেনের হাত ধরল, ওর চোখে চোখ রাখল। প্রায় এক মিনিট তা[illegible] তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে স্তিমিত কোমল হয়ে এল রাজেনের ক্রুদ্ধ চাহনি[illegible] রোহিণীর মাথায় গালে, ঘাড়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, "[illegible]কে আগে বেরিয়ে এসো, তা না হলে এই দেহ এই মন থেকে আমি নিজেকে পরিচ্ছন্ন [illegible] নিতে পারব না।"

রোহিণীর মুখটা কিছুক্ষণ বুকে চেপে রেখে রাজেন স্নান করতে গেল।

রাত প্রায় চারটে। টেবিলে মুখোমুখি রোহিণী ও রাজেন। তৃতীয়বারের চা খাওয়া শেষ করে রাজেন বলল, "ব্যাপারটা তো আর হালকাভাবে নেওয়া যাচ্ছে না। তলায় তলায় যে এতটা গড়িয়েছে, তুমি কিছুই কি বুঝতে পারনি ?"

"একদমই পারিনি। সবকিছু আনফোল্ড হতে লাগল তুমি চলে যাবার পর। আর কী

অদ্ভুত দ্যাখো, ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল আমার বিনা চেষ্টাতেই ! মীনা চ্যাটার্জিকে ইন্টারভিউ করার জন্য আটদিন আগে তুমি আমাকে পৌঁছে দিলে, সেখানে ওর ফ্ল্যাটে একটা ছবি দেখে ফেললাম। ব্যাস, সেই শুরু হল। সেখানেই সুভাষ গায়েনের সঙ্গে পরিচয়, তার কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পারলাম। আবার তোমাকে খাওয়াব বলে ইলিশ মাছ কিনে সেটা উপরের ফ্ল্যাটে ফ্রিজে রাখতে গিয়ে আলাপ হল সুজাতা গুপ্তর সঙ্গে, তার কাছেও আবার অনেক কথা জানতে পারলাম। মহারানীর রাশিফল লেখার জন্য কুন্তীদের কাছ থেকে ইংরিজি ম্যাগাজিন আনলাম, তাতে শোভনেশ সম্পর্কে এমন একটা প্রবন্ধ দেখলাম, তুমিও সেটা পড়েছ, লেখাটা আমাকে এমনই চাগিয়ে তুলল যে, নিজেই উদ্যোগ নিয়ে খোঁজ খবর করতে লাগলাম।"

"না করলেই ভাল হত। তাহলে এই রকম অবস্থাটা তৈরি হত না। সুভাষ, মীনা, গঙ্গাপ্রসাদ বা সুজাতা গুপ্ত এরা তোমার কেউ নয়। যা কিছু বোঝাপড়া ওরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে করে নিত, তোমার কোন দরকারই ছিল না এদের মধ্যে মাথা গলাবার। তাছাড়া শোভনেশ সেনগুপ্তর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপরও তোমার যখন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, তখন এদের থেকে দূরে থাকাই ভাল ছিল।"

"এখন তাই মনে হচ্ছে।" মুখ নামিয়ে রোহিণী নখ দিয়ে টেবল থেকে মোমবাতির জমাট মোম তুলতে লাগল।

"গঙ্গাপ্রসাদ কি কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে ?"

"মীনাকে যা করেছে ?"

"না, সুভাষ গা[illegible]েনকে যা করেছে।"

"মনে হয় না, অন্তত টেপের ক্যাসেটটা কার কাছে রয়েছে, সেটা না জানার আগে পর্যন্ত নয়।" চিন্তিত স্বরে ধীরে ধীরে রোহিণী বলল। "একটা লোককে খুনি সাজিয়ে জেলে ঢোকাবার সুযোগ উনি নিয়েছেন। তার বহু টাকা দামের ছবি হাতিয়েছেন, বসত বাড়িটাও আমার মনে হয় বেনামে নিজেই কিনেছেন সামান্য টাকায়। তাই নয়, নিজের মুখেই বলে গেলেন, এসব করেছি টাকার জন্য, টাকা করতে [illegible]ালবাসি, টাকা করতে হলে এভাবেই করতে হয়। ভাবতে পার রাজেন, বেশ গর্বের সঙ্গেই কিছু না রেখে-ঢেকে একটা লোক পরিষ্কার দিনের আলোয় বি[illegible]র উপর বলল, কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না, আর শোভনেশের ছবিগুলো তে[illegible]র অ[illegible]ছেই আছে !"

"প্রমাণের কিছু না থাকলে[illegible]ভাবে কথা বলতে পাবি। শোভনেশ সেনগুপ্ত নিজের মুখে কোর্টে বলেছেন[illegible]ঢোব[illegible]াকে জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছেন। তারই ভিত্তিতে কনভিক্টেড হয়েছেন[illegible]ইল। [illegible]ঙ্গাপ্রসাদকে ফাঁসানো কি এত বছর পর সম্ভব হতে পারে ? ওর ছবিগুলো [illegible]লছি, [illegible]ই যে হাতিয়েছে, তুমি কি তা প্রমাণ করতে পারবে ? পুলিশে অবশ্য তুমি [illegible]াসবেন[illegible] করতে পার, কিন্তু এমন জায়গায় এমনভাবে সেগুলো লুকোনো যে, খুঁজে ব[illegible]তারকর[illegible] অসম্ভব হবে। ধরো, খোঁজ পাওয়া গেল, তখন দেখবে গঙ্গাপ্রসাদ এমন একটা[illegible] বার করবে যাতে লেখা, শোভনেশ তার সব ছবিই ওঁকে বিক্রি করে দিয়ে গেছে ! এখন তো আসল ছবিগুলোর সঙ্গে নকলগুলোও গঙ্গাপ্রসাদ বিক্রি করে যাবে, কিন্তু ধরা পড়বে না। ধরিয়ে দেবার লোক ছিল সুভাষ গায়েন, তাকে তো হাওয়া করে দিয়েছে।"

"শুধু একটা লোকই এখন গঙ্গাদার মুখোশ খুলে দিতে পারে। কিন্তু সে লোকটা যে এই মুহূর্তে কোথায়, তা কেউই জানে না।"

"শোভনেশ সেনগুপ্ত।"

রাজেন জলের গ্লাস নিয়ে উঠে বেসিনের কলে গেল। গ্লাসে জল ভরে ঢক ঢক করে খেয়ে, চোখে জলের ঝাপটা দিল।

"শোভনেশ নাকি গঙ্গাদাকে ফোন করেছিল! আমার মনে হয়েছে এটা মিথ্যে কথা।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। ব্লাফ দিয়ে তোমাকে বোধহয় অসাড় করে দিতে চেয়েছিল।" তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হঠাৎ মোছা বন্ধ করে রাজেন বলল, "একবার বহরমপুর গিয়ে খোঁজ নিলে হত না? সেনগুপ্তর হাসপাতাল থেকে পালানোর খবরটাও ব্লাফ কিনা সেটা একবার ভেরিফাই করা কি উচিত নয়?"

"করে কি লাভ হবে? ধরো শোভনেশ পালায়নি।" রোহিণী চেয়ারে বাবু হয়ে বসে মুখের সামনে তালু রেখে হাই তুলল। রাজেন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

"ধরো শোভনেশ জেলেই আছে, তাতে এখনকার এইসব ব্যাপারের উপব তার কোন প্রভাব পড়বে কি? গঙ্গাদার কেশাগ্রও স্পর্শ করা যাবে না। ওর শুধু একটাই অস্বস্তি, কেসটা রি-ওপেন হলে, ওনার সাক্ষ্যপ্রমাণ ধামাচাপা দেবার চেষ্টাটা ফাঁস হয়ে যাবে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। ..ওহ্‌হ্‌ দ্যাখো ভুলেই গেছি, ওপবের মাসিমা কাল বিকেলে বেরিয়ে রাত পর্যন্তও ফেরেননি।"

"কে, সুজাতা গুপ্ত?" রাজেন অবসাদ কাটাতে ক্যালিসথেনিকস শুরু করেছে। দু পা ফাঁক করে কোমর থেকে উর্দ্ধাঙ্গ চক্রাকারে ঘোরাচ্ছিল। সেটা থামিয়ে বলল, "তোমায় কে বলল?"

"মেসোমশাই। কাল রাতে সিঁড়িতে দেখা, তখন বললেন, খুবই আপসেট মনে হল।"

"হওয়াটাই স্বাভাবিক। বুড়ো বয়সে বৌ পালালে কি মুশকিল যে হয়!"

"পালিয়েছেন ধরে নিচ্ছ কেন, হয়তো বিপদে পড়েছেন, অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে! একবার উপরে গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত।"

"ওপরে গেলে ম্যাক্সিটা নিয়ে যেও।"

"ওরে বাবা, তুষার দত্ত ওটা দেখলে খাপ্পা হয়ে, ফড়াৎ করে হয়তো ছিঁড়ে ফেলে দেবে। আমি পরলে ঠিক আছে, কিন্তু নিজের [redacted] গায়ে এই রকম অসভ্য ড্রেস উনি বরদাস্ত করবেন না। আমি বরং নন্দাকে ডেকে [redacted] দেব।"

রোহিণী চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে জানা[redacted]বাইরে আবছা আলো। ভোর হচ্ছে। পাখিদের কিচির মিচির ছাড়া আর কে[redacted]

"তোমার গৌরীর মা এসে পড়ার আগেই [redacted] পড়তে হবে। ট্যাক্সি এখানে কখন পাওয়া যাবে? বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে হবে[redacted]

"আটটা নটার আগে পাচ্ছ না। তবে ভাগ্যে[redacted] আগেও পেয়ে যেতে পার। ততক্ষণ তুমি বিছানায় গড়িয়ে নিতে পার।"

"এখন বিছানায় বডি ফেললে সাত আট ঘণ্টার [redacted]টা তুলতে পারব না। অসম্ভব টায়ার্ড। বরং আর একবার চা হোক।"

চা করতে করতে রোহিণী বলল, "আজ একটা জরুরী কাজ আছে, ঘোষালদের ফোন করতে হবে। গঙ্গাদাকে আজই চণ্ডীদাস ঘোষাল ফোন করে জানবে, বিক্রির জন্য শোভনেশের ছবি পাওয়া যাবে কিনা। পাওয়া গেলে কোথায় ছবি দেখার জন্য ওদের যেতে হবে, সেটাই আমায় জানতে হবে।"

"জেনে কী করবে?" আঙুলে টুথ পেস্ট লাগিয়ে দাঁতে ঘষতে ঘষতে রাজেন বলল।

"তুমিও কি ছবি দেখতে যাবে ?"

"যাব কিনা ভাবছি, তবে মীনা চ্যাটার্জিকে খবরটা নিশ্চয় দেব।"

॥ দশ ॥

চা খেতে খেতে রাজেন খবরের কাগজ পড়ছিল। রোহিণী চারতলায় গেছে হৃদয়রঞ্জনের কাছ থেকে সুজাতা গুপ্তর খোঁজখবর নিতে। তখন কলিংবেল বাজল।

দরজা খোলার জন্য রাজেন উঠে গিয়ে আই হোলে চোখ রেখেই সিঁটিয়ে গেল। একটি স্ত্রীলোক এবং হাতে পাঁউরুটি আর দুধের প্যাকেট দেখে মনে হচ্ছে কাজের লোক অর্থাৎ গৌরীর মা। রাজেন ভেবে পাচ্ছে না এখন তার কি করা উচিত। ফ্ল্যাটে রোহিণী নেই, দরজা খুলে দিলে, তার পরিচয় জানার জন্য এই মহিলার ভ্রূ বেঁকে উঠবে আর সেটি কপালে উঠবে যথার্থ পরিচয় শুনলেই। অতএব দরজা না খোলাই উচিত। কিন্তু না খুললে ইনি তো বেল বাজিয়েই যাবেন !

গৌরীর মা আবার বেল বাজাল। মুখে বিরক্তি। তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, রোহিণী এখন চারতলায়। 'যা হয় হবে' এই রকম একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে রাজেন দরজা খুলল।

"তুমি গৌরীর মা ?"

"হ্যাঁ।" গৌরীর মা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে। তার মুখের উপর দিয়ে বিস্ময়, সন্দেহ, কৌতূহল পর পর ঢেউ খেলে গেল। "দিদি নেই ?"

"এই মাত্র ওপরে গেল মাসিমার খবর নিতে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো।" রাজেন খোলা দরজা থেকে এক পা পিছিয়ে গেল।

"আপনি ?" প্রশ্নটা করার পরই গৌরীর মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "জামাইবাবু !"

রাজেন ভ্যাবাচ্যাকা দশার মধ্যে পড়ল। এখনো হইনি তবে হবো, এই ধরনের একটা বাক্য সে মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিল, কিন্তু কাজটি সম্পূর্ণ করার আগেই গৌরীর মার মুখে ছড়ানো হাসি দেখে সে ঢোঁক গিলল।

"আমার মন বলছিল, আপনি ফিরে আসবেনই। না এসে পারবেনই না···দিদির মত অমন ভাল মেয়েকে কষ্ট দিয়ে কদ্দিন আর নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারবেন ?" গৌরীর মা ভিতরে এসে হাতের জিনিসগুলো টেবিলে রাখল। ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে রাজেন এবার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"কতদিন আমি দিদিকে বলেছি, ওপরের মাসিমাকে, নিচের বৌদিকেও বলেছি, জামাইবাবু ঠিক ফিরে আসবেনই আসবেন। আজ সকালেই তো আমার বাঁ চোখটা নাচল, তখন কেন জানি মনে হল, বাবা তারকনাথের দিব্যি, সন্তোষী মার দিব্যি করে বলছি, মনে হল দিদির দুখ্যু আজ ঘুচবে, হ্যাঁ আজকেই। কেমন মিলে গেল তো ? আমার মন যা বলবে, তা হবেই হবে। তা জামাইবাবু, কতদিন আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলেন ?"

"ছ'-সাত বছর।" মুখ ফসকেই রাজেনের অজান্তে কথাটা বেরিয়ে এল।

"য়্যাঃ ! অত্তোদিন, এমন বৌকে ফেলে ? পারেন বটে আপনারা। আমার বর একবেলা আমায় না দেখে··তা দিদি এখন আবার উপরে গেল কেন, দাঁড়ান আমি ডেকে নিয়ে আসি। এখন কি···।" শশব্যস্তে গৌরীর মা প্রায় জগ্ করেই বেরিয়ে গেল।

রাজেন বিমূঢ়ের মত ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল। ঠিক সেই সময় চারতলায় হৃদয়রঞ্জনের ফ্ল্যাটেও রোহিণী উৎকণ্ঠিত স্বরে দ্বিতীয়বার বলল, "সে কি! মাসিমা রাতে ফেরেননি?"

হৃদয়রঞ্জন মাথা নাড়লেন।

"তাহলে এবার পুলিশে খবর দিন। আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে। মাসিমা দিগম্বর বর্ধন লেনে সেদিন না গেলেই ভাল করতেন।"

"কেন?" হৃদয়রঞ্জন তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে, একটি শব্দেই বুঝিয়ে দিলেন, তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। "কেন পুলিশের কাছে যাব? যে স্বেচ্ছায় চলে গেছে তার জন্য সবাইকে উদ্বাস্ত করে লাভ কি?"

"কিন্তু তিনি কোন বিপদে পড়লেন কিনা..."

"পড়ে পড়বেন। বহু বছর ধরে আমি যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আমার সারা জীবন বিষিয়ে দিয়েছে... আমি খোঁড়া, আমি কুৎসিত, আমি শোভনেশ সেনগুপ্তর মত লম্বা নই, ফর্সা নই, তাঁর মত শিল্পী নই...কিন্তু আমারও তো সহ্যের সীমা আছে।" বলতে বলতে হৃদয়রঞ্জন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পুরু কাঁচের ওধারে চোখ দুটোয় ধকধক করে ঘৃণা জ্বলছে। হাতের আঙুল কাঁপছে।

রোহিণী ভেবে পেল না, এখন কী বলে সে এই লোকটিকে সান্ত্বনা দেবে। লাঞ্ছিত, অপমানিত এক পুরুষ এতদিনে যেন শোধ নিতে নিজেকে জাগিয়ে তুলেছে।

"এই একটা লোক আমার জীবন দুর্বিষহ করেছে। কলকাতা ছেড়ে দূরে চলে গিয়ে ভেবেছিলাম ...কিন্তু এখন দেখছি সবই আগের মতনই রয়েছে, কিছুই মুছে যায়নি।" হৃদয়রঞ্জনের স্বর হতাশায় অস্ফুট হয়ে এল।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে রোহিণী, ঠিক সেই সময়ই পড়িমরি ছুটে এল গৌরীর মা।

"অ দিদি, অ্যাদ্দিন পর জামাইবাবু ফিরে এল, আর তুমি এখানে বসে বসে গপ্পো করচো! একদিন নয় এক বছর নয়, ছ'-ছ'টা বছর পর নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে এয়েচে! কোথায় তুমি তাঁর সেবা যত্ন করবে, তা না তুমি...ধন্যি বাবা। যাও যাও নিচে যাও।"

একটা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটল অথচ একটা পিঁপড়েও মরল না, এমন একটা ব্যাপার যেন প্রত্যক্ষ করছে রোহিণী, সেই রকমভাবে গৌরীর মার দিকে তাকিয়ে রইল। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। মাথাটা টলে যেতেই সে চেয়ারে আবার বসে পড়ে বলল, "শোভনেশ ফিরে এসেছে?"

তখনই দরজার দিকে ছুটে যেতে গিয়ে টেবলের কোণায় ধাক্কা লেগে বেটাল হয়ে পড়তে পড়তে হৃদয়রঞ্জন চিৎকার করে উঠলেন, "আমি খুন করব শয়তানটাকে, আজ আমি...।" দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আবার নিজেকে দাঁড় করিয়ে তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রোহিণী চোখ বন্ধ করে ফেলল। গত সাত-আট দিন ধরে যে ভয়টাকে নিয়ে সে নাড়াচাড়া করেছে, অবশেষে সেটা বাস্তব রূপ নিল।

"হ্যাঁ গো দিদি, ব্যাপার কি?" গৌরীর মা কোনক্রমে কথাটা বলতে পারল। ওদের আচরণ দেখে সে এইটুকু শুধু বুঝেছে, তার বলা কথাগুলো দক্ষের যজ্ঞে ক্ষ্যাপা শিবের মত হাজির হয়েছে দুজনের কাছে।

"মেসোমশাই অমন করে ছুটলেন কাকে খুন করতে?"

সর্বনাশ, নিচে তো রয়েছে রাজেন! মনে পড়ামাত্র ছিটকে উঠেই রোহিণী দরজার

দিকে ছুটল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে দেখল, তার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা আর ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি লোক, যাদের মধ্যে একজনকেই সে শুধু চেনে।

রোহিণী থমকে পড়ল মাঝ সিঁড়িতে। গঙ্গাদা আবার এসেছেন, কিন্তু সঙ্গে ওই দুটি লোক কারা ? চেহারা সুবিধের মনে হচ্ছে না।

গঙ্গাপ্রসাদ দেখতে পেয়েছেন রোহিণীকে। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে বললেন, "কথা আছে। তার আগে বলো, ঘরে যে দুজনকে দেখলাম, ওরা কারা ?"

রোহিণী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তার আগে বলুন, আপনার সঙ্গের ওই লোক দুটি কারা ?"

"আমার লোক, আমার সঙ্গে এসেছে।"

"ওদের বেরিয়ে আসতে বলুন। আমি পছন্দ করি না, আমার বিনা অনুমতিতে অপবিচিত কেউ আমার ফ্ল্যাটে ঢোকে।'

"এ ফ্ল্যাট আমাব, আমি এর মালিক।"

"অবশ্যই। কিন্তু যতক্ষণ আমি এটায বযেছি, ততক্ষণ আমি মালিক।"

রোহিণী কণ্ঠস্বরকে যতটা ইস্পাত করল, ঠিক ততটা কঠিন চোখেই গঙ্গাপ্রসাদ তাকিয়ে রইলেন। সাত-আট সেকেন্ড পর মাথা নেড়ে ইসারা করলেন লোক দুটিকে বেরিয়ে আসার জন্য। ওরা বেরিয়ে আসতেই বোহিণী ফ্ল্যাটের ভিতব ঢুকল।

খাওয়ার টেবিলে চুপ করে বসে আছেন হৃদয়রঞ্জন, মাথা দু হাতে ধরে, নিচু করে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রাজেন, একটু ঝুঁকে হাত নেড়ে কি যেন তাঁকে বলছে বোঝাবার মত ভঙ্গিতে। রোহিণী হাঁফ ছাড়ল। খুনটুন ধরনেব কিছু যে ঘটেনি, এটাই তাকে স্বস্তি দিল। অবশ্য বৃদ্ধ হৃদয়রঞ্জন, খালি হাতে কোন 'শয়তানকে' যে সাবাড় কবতে পাববেন, এমন সম্ভাবনাকে বহু চেষ্টাতেও সে স্বপ্নে জায়গা দিতে পাববে না। তাহলেও, মানুষের সব থেকে সহজ কাজগুলোর মধ্যে, খুনই বোধহয় সব থেকে সহজতম। আক্রমণ রুখতে গিযে বাজেনই হয়তো হৃদয়রঞ্জনকে মেরে ফেলতে পাবে ! যাই হোক, দুজনকেই বেঁচে থাকতে দেখার পব বোহিণী ফিবে তাকাল দরজায দাঁড়ানো গঙ্গাপ্রসাদেব দিকে।

"বলুন, কি কথা ?"

"একটু বাইরে এসো।"

রোহিণী পরিবেশটা বুঝে নিল। গঙ্গাদার লোক দুটোর অস্বস্তিকর বকমেব চেহারা। বোধহয় উনি ভেবেছিলেন, মীনা চ্যাটার্জিকে দেওয়া ওষুধেই কাজ সারতে পারবেন। কিন্তু ফ্ল্যাটে আরো দুটি লোক যে থাকবে, এটা জানতেন না। দশ ঘণ্টা আগে রোহিণীও জানত না। এখন আর ঝঞ্ঝাট বাধানোর কোন ঝুঁকি ওবা নেবে না। রোহিণী সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে এসে দাঁড়াল।

কোন ভনিতা না করেই গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, "কুন্তী নামে কোনো মেয়েকে চেনো ?"

"কুন্...তী !" রোহিণী তার বিস্ময়কে দীর্ঘস্থায়ী করল চিন্তা কবার সুযোগ নেবার জন্য। নামটা জেনে গেছে ! কি ভাবে ? দিগম্বর বর্ধন লেনে গিয়ে তাহলে গীতা বা বিশ্বনাথের সঙ্গে গঙ্গাদা কথা বলেছেন। কুন্তী নিশ্চয় নিজের নামটা গীতার কাছে বলে ফেলেছিল। উনি এখন তাহলে টেপ রেকর্ডারের সন্ধানে বেরিয়েছেন !

"মনে পড়ছে না এমন নামের কাউকে চিনি। কেন বলুন তো ?" সরল কৌতূহল রোহিণীর কণ্ঠে ও চোখে।

"ভাল করে মনে করো...খুব রোগা, লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, বয়স কুড়ি-বাইশ,

সালোয়ার-কামিজ পরে…এমন কাউকে ?” গঙ্গাপ্রসাদ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রোহিণীর মুখভাব লক্ষ করছেন। কিন্তু মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছেন না।

রোহিণী মাথা নেড়ে বলল, “নাহ্, মনে পড়ছে না।”

“অ।” গঙ্গাপ্রসাদ একবার খোলা দরজা দিয়ে ফ্ল্যাটের ভিতরে তাকালেন, কি যেন ভাবলেন, তারপরই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলেন। তাঁর পিছনে লোক দুটিও।

তখনই দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে কুন্তী। তাকে দেখেই গঙ্গাপ্রসাদ থমকে দাঁড়ালেন। কুন্তীও থমকে পড়ল। গতকাল এই সময়ই সে রোহিণীর শোবার ঘর থেকে উঁকি দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদকে দেখেছিল। মুখ তুলে কুন্তী একবার শুধু রোহিণীর দিকে তাকিয়েই কি যেন বুঝে নিল, তারপর গঙ্গাপ্রসাদকে বলল, “এক্সকিউজ মী, মিসেস রোহিণী সেনগুপ্তর ফ্ল্যাট কোন্‌টে, বলতে পারেন ?”

“আমি এখানে থাকি না।”

“ওহ্‌হ্।” কুন্তী পাশ কাটিয়ে উপরে উঠছে তখন রোহিণী বলল, “আমিই রোহিণী সেনগুপ্ত, আপনি ?”

“আমার নাম নন্দা দত্ত।” কুন্তী চোখের পলক না ফেলে, অপরিচিতের মুখভাব বজায় রেখে বলল, “আমি আসছি পল্টু দত্তরায়ের কাছ থেকে।”

রোহিণীর মুখে হাসি ফুটল।

“ওহো পল্টু ! আসুন, আসুন। কালকেই তো পল্টু ফোন করে বলল, আজ আসতে পারবে না, বৌকে নিয়ে নার্সিং হোম যাবে…বাচ্চা হবে কিনা। তা আপনাকে বুঝি পাঠাল ?”

বাজারের থলি হাতে চারতলা থেকে তুষার দত্ত নামছে। সিঁড়িতে অতগুলো লোক দেখে সে মন্থর হয়ে গেল। রোহিণীর দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা হেলিয়ে বলল, “বেরোচ্ছি, একটু বাজারের দিকে যাব। মেজ শালা এসেছে কানাডা থেকে, খুব বড় ডাক্তার, ওকে আজ খেতে বলেছি।”

“তাই নাকি !” এর বেশি আর কি সে বলতে পারে, রোহিণী তা ভেবে পেল না।

“চেতলের পেটি খাওয়াব ভাবছি, চয়েসটা ঠিক করেছি কি না বলুন ?”

“অসাধারণ চয়েস। কিন্তু আপনি কি একটু দেরি করে ফেলেননি ? বাজারে এ সব জিনিস এত দেরি করে গেলে কি পাওয়া যায় ?”

তুষার দত্ত, “তাই তো” বলেই দ্রুত নেমে যেতে যেতে ভ্রূ কুঁচকে একবার গঙ্গাপ্রসাদ ও তার সঙ্গের লোক দুটির দিকে তাকাল। ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে হৃদয়রঞ্জন ও রাজেন তখন বেরিয়ে এল।

“চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।” মৃদু কোমল স্বরে রাজেন বলল।

“না না, আমি ঠিকই আছি, মাথাটা তখন কি রকম যেন—”

হৃদয়রঞ্জন এক পা এক পা করে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলেন। রাজেন সিঁড়িতে লোকজন দেখে রোহিণীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। কুন্তীর দিকে তাকিয়ে হেসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রোহিণী ব্যস্ত হয়ে বলল, “মেসোমশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাও, দেখছো না ওনার মাথা ঘুরছে, পড়ে টড়ে যেতে পারেন।”

রাজেন লাফ দিয়ে হৃদয়রঞ্জনের কাছে পৌঁছল।

একদৃষ্টে গঙ্গাপ্রসাদ সব কিছু লক্ষ করছিলেন, এইবার রোহিণীকে লক্ষ করে বললেন, “নিচের ফ্ল্যাটে দত্তরায় লেখা একটা নেমপ্লেট দেখলাম। সেখান থেকেই কি উনি

আসছেন ?"

রোহিণীর বুক নিমেষের জন্য হিম হয়ে গেল। কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, "দত্তরায় কি কলকাতা শহরে এই একজনই আছে ?"

"তা বটে।" গঙ্গাপ্রসাদ শান্ত ভঙ্গিতে তাকালেন কুন্তীর পায়ের দিকে। শৌখিন ঘাসের চটি কুন্তীর পায়ে। "উনি তাহলে এ বাড়ির লোক নন, বাইরে থেকেই আসছেন। আচ্ছা চলি।"

গঙ্গাপ্রসাদরা নেমে যাওয়ামাত্র কুন্তীর হাত ধরে রোহিণী ফ্ল্যাটের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

"তুমি পল্টু দত্তরায় বলতে গেলে কেন ?"

"ওই নামটাই মুখে এসে গেল যে !"

"নিচে গিয়েই খোঁজ নেবে গঙ্গাদা।"

"নিক্ গে। আমার তাতে কিছু এসে যাবে না।" কুন্তী অবহেলাভরে কাঁধ ঝাঁকাল।

"এসেছে কেন জান ? তুমি যে টেপ করে এনেছ, সেই খবর পেয়ে গেছে। তোমার খোঁজেই এসেছে। সঙ্গের লোক দুটো গুণ্ডা।"

"ওহ্ বিয়ালি !" কুন্তী খুশিতে চনমন করে উঠল। "আমার জন্য, গুণ্ডা ! রুনিদি, এ তো রিয়াল লাইফ থ্রিলার ! আমি এটা লিখবই, কিন্তু ছাপিয়ে দিতে হবে।"

রোহিণী হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "ব্যাপারটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ না এখনো।"

"খুব বুঝতে পারছি, আমাকে অত হাঁদাভোঁদা ভাববেন না। আপনার ওই গঙ্গাদা এবার টেপের ক্যাসেটটা উদ্ধার করার জন্য আমাদের ফ্ল্যাট র‍্যানস্যাক করবে, আমাকে কিডন্যাপ করবে, টর্চার করবে আর পল্টু গিয়ে আমাকে ওদের ডেন থেকে রেসকিউ করবে। ভাবতে পারেন রুনিদি, ভাবতে পারেন ?" কুন্তী উত্তেজনায় জড়িয়ে ধরল রোহিণীকে।

কলিংবেল বাজল। রোহিণী দরজা খুলল।

"কি কাণ্ড গো দিদি, য়্যাঁ উনি জামাইবাবু নন ? আমাকে সে কথা বলবে তো ?"

"তুমি আমাকে সে কথা বলার সুযোগ অন্তত দেবে তো ?"

"ছিছিছি, এমন ভুল আমি করে বসলুম ! সকালে বাঁ চোখটা নাচল, আমি ভাবলুম আজ তাহলে ভাল একটা কিছু ঘটবে। আর কিনা একটা বাইরের লোককে তোমার স্বামী বানিয়ে দিলুম ! কি হবে এখন বল তো ? কি লজ্জায় যে এখন—"

"কি আর করা যাবে, তোমার লজ্জা ঘোচাতে ওকেই এখন আমায় বিয়ে করতে হবে।" "তোমার ভাল লোকটি করছেন কি উপরে ?" রোহিণী জানতে চাইল আর তখনই রাজেনকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেখে গৌরীর মা ঘোমটা তুলে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কুন্তী একগাল হেসে বলল, "আপনার খবর নিতেই এসেছি। কিন্তু এসেই ঘটে গেল গঙ্গাস্নান। এখন হিহি করে কাঁপছি। কি করা যায় বলুন তো ?"

"ভিজে কাপড়ে আর কিছুক্ষণ থাকলেই নিউমোনিয়া হবার খুবই সম্ভাবনা। গঙ্গাযাত্রা ঘটে যেতে পারে।" রাজেন হালকা স্বরে বললেও তার মুখে ছড়ানো রয়েছে দুশ্চিন্তার ছায়া। সে জিজ্ঞাসু চোখে রোহিণীর দিকে তাকাল। দু'জনেই কোন কথা বলছে না।

পরিবেশটা ক্রমশ গুমোট হয়ে উঠছে দেখে কুন্তী বলল, "টেপটার জন্যই তো দলবল নিয়ে ওর আসা, তা ওটা দিয়ে দিলেই তো হয়।"

"সে কি! দিয়ে দেব?" রোহিণী জীবনে এই প্রথম যেন একটা আজগুবি কথা শুনল! "এটাই তো এখন আমাদের হাতে রাখা দরকার!"

"রুনিদি, দেব মানে এর একটা নকল দেব। আমার কাছে টেপ আছে, তাইতে ডুপ্লিকেট করে সেটাই ওকে দেব। গঙ্গারাম বুঝতেও পারবে না।"

রোহিণী আর রাজেন মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। সেটা লক্ষ করে কুন্তী বলল, "লোকটা যাতে আর ঝামেলা না করে, সেই জন্যই বললাম। তখন রুনিদি এমন একটা কথা ফট করে মুখ থেকে বার করলেন, শুনেই মনটা কিরকম যেন হয়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে ধুমধাড়াক্কা, হুড়োহুড়ির থেকে শান্ত, আনন্দের জীবন অনেক সুন্দর।" কুন্তীর কথাগুলো সকালের রোদের মত সোনালি আভা হয়ে ঘরে ভেসে রইল।

অবাক স্বরে রোহিণী বলল, "কখন আমি কি বললাম?"

"বললেন না, পল্টু নার্সিংহোমে বৌকে নিয়ে গেছে কিসের জন্য যেন।" কুন্তী মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। চোখে হালকা নরম স্বপ্নের ছায়া।

হেসে উঠতে গিয়ে রোহিণী হাসল না। রাজেন কথাগুলোর অর্থ বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়ে বলল, "কারুর সিরিয়াস কিছু হয়েছে নাকি?"

"হয়েছে। কুন্তীকে খুব সিরিয়াস রোগেই ধরেছে। কিন্তু পল্টুবাবু ছাড়া আর কারুর পক্ষে তো এর চিকিৎসা সম্ভব নয়। ফিরে আসুক গৌহাটি থেকে, তারপর কুন্তীর জন্য নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখব। কিন্তু তার আগে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়াটা খুবই জরুরী। গঙ্গার ঢেউ কুন্তীর ঘরে ঢুকে বাচ্চার দোলনা ভাসাক, এটা কোনমতেই হতে দেওয়া যায় না। কুন্তী তোমার প্রস্তাবই শিরোধার্য করছি, এই টেপটার একটা কপি এখনি করে দাও।"

"কপি করতে হলে আর একটা রেকর্ডার যে দরকার! জোগাড় করতে পারবেন?" কুন্তী জানতে চাইল।

"নন্দাদের একটা আছে। দাঁড়াও আমি দেখছি।" রোহিণী ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, "গৌরীর মা, নিরুদ্দেশ থেকে ফেরা তোমার জামাইবাবুটি সকাল থেকে অভুক্ত, টোস্ট করে অন্তত খাওয়াও।"

কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলল স্বয়ং নন্দা।

"আঙ্কল্ তোমার জন্য জয়পুর থেকে ম্যাক্সি এনেছে, ওটা নিয়ে এসো, আর তোমাদের টেপরেকর্ডারটা কিছুক্ষণের জন্য দরকার, ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেও। চটপট।" দরজায় দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে কথাগুলো বলেই রোহিণী নেমে এল।

খাওয়ার টেবিলে টেপরেকর্ডারটা। কুন্তী ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করায় ব্যস্ত। রাজেন গালে হাত দিয়ে বসে। গৌরীর মা লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে টোস্ট রেখে গেল টেবিলে।

"নন্দা রেকর্ডার আনছে। কুন্তী তোমার কাছে স্পেয়ার ক্যাসেট আছে বললে, সেটা নিয়ে এস। আমি ওটা বরং অফিসে গিয়ে গঙ্গাদার হাতেই দিয়ে আসব।"

দু'ঘন্টার পর ট্যাক্সিতে মালপত্র তুলে রাজেন রওনা হল, সঙ্গে রোহিণীও। তাকে মহারানী অফিসে নামিয়ে দিয়ে সে বাড়ি যাবে। পথে হৃদয়রঞ্জনের প্রসঙ্গ উঠল। রাজেন বলল, "ভদ্রলোক একেবারে শ্যাটারড হয়ে গেছেন। আমিও খুব লজ্জায় পড়ে গেছলাম। আচমকা পিছন থেকে একজোড়া হাত যদি গলা টিপে ধরে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য ইনস্টিংক্টিভ্‌লি যা করার তাই করেছি। বুড়ো মানুষ, গায়ে জোর নেই, আমি গলা থেকে হাতটা ছাড়িয়েই উঠে দাঁড়িয়ে একটা ঘুঁসি চালাই। ভাগ্য ভাল সেটা ওঁর

মুখে লাগেনি। তাহলে এতক্ষণে হাসপাতাল আর পুলিশ করতে হতো। তারপর আমি ওঁকে দেখে আর উনি সেনগুপ্তর বদলে আমাকে দেখে, দু'জনেই হতভম্ব হয়ে যাই। ওনার অবস্থাটাই মর্মান্তিক হয়ে পড়ে। বার বার এমনভাবে ক্ষমা চাইতে লাগলেন যে, দেখে আমার কষ্টই হচ্ছিল।"

"ওঁর মনের ব্যাপারের কিছুটা বুঝতে পারি, কিন্তু কিছুই তো আমাদের করার নেই। ওঁর বৌ যে এই বয়সে শোভনেশের জন্য এমন পাগলামো করবেন, এটা আমি ভাবতেও পারি না। ভদ্রমহিলা হঠাৎ যে কোথায় গেলেন!"

"এই সব দেখে এখন তো বিয়ে করতেই ভয় করছে। কোনদিন বাড়ি ফেরে দেখব বৌ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।"

"আমারও তো সেই একই দশা! একদিন হয়তো দেখব বরমশাই গেটে দাঁড়িয়ে ভ্যা ভ্যা করে কাঁদছে আর রুমালে চোখ মুছছে।"

রোহিণী জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। আর হো হো করে হেসে উঠল রাজেন।

"কুন্তীর গেট ক্র্যাশিংয়ের কোন জবাব নেই। ভাবছি, এবার থেকে গুরুতর কোন সমস্যায় পড়লে ওরই দ্বারস্থ হব।"

"হয়ো। তবে জেনে রেখ, আর আমায় বোকা বানাতে পারবে না। ...আর হাতটা সরাও, এটা বি বা দী বাগ, রাস্তায় লাখ খানেক লোক, তাদের অনেকেই ট্যাক্সির দিকে তাকাচ্ছেও।"

মহারানীর অফিসের সামনে পেভমেন্ট ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়াল। নামার আগে নিশ্চিত হবার জন্য রোহিণী ঝোলা থেকে ক্যাসেটটা বার করে দেখে নিল।

"ঠিক এক ঘণ্টা পর আমি এসে এখানে দাঁড়াচ্ছি।" জানালায় মুখ বাড়িয়ে রাজেন বলল।

"বাড়ি গিয়ে এখন তোমার একটা লম্বা ঘুম দেওয়া উচিত। কাল সারা রাত তো জেগেই কাটালে।"

"যতক্ষণ না জানছি গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জির কাছ থেকে কি অভ্যর্থনা পেলে, ততক্ষণ ঘুমটুম আর আসবে না। তাহলে এই কথাই রইল, এক ঘণ্টা পর এইখানে দাঁড়িয়ে থাকছি।"

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পরও রোহিণী সেই দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গঙ্গাদার এখন অফিসে থাকারই কথা। কিভাবে কথা শুরু করবে ভাবতে ভাবতে রোহিণী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও ফিরে এসে লিফটের লাইনে দাঁড়াল।

সে দাঁড়াল ঠিক চণ্ডীদাস ঘোষালের পিছনেই। তাকে দেখে চণ্ডীদাস হেসে বলল, "সেই ছবি কেনার ব্যাপারে, মিঃ ব্যানার্জিকে সকালে ফোন করেছিলাম। উনি দেখা করতে বলেছেন। কোথায়, কখন ছবি দেখতে যাব সেটাই উনি এখন বলে দেবেন।"

চণ্ডীদাস ঘোষাল আর সে একসঙ্গে মহারানী অফিসে ঢুকলে সেটা কারুর চোখেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। তবে একটা ব্যাপারেই হুঁশিয়ার থাকা দরকার, রোহিণী সেটাই গলা নামিয়ে ঘোষালকে বলল, "আমরা কেউ কাউকে চিনি না, এটা খেয়াল রাখবেন।"

"তা আর বলতে।"

লিফটে তারা তিন তলায় পৌঁছল। মহারানীর অফিসে ঢুকল অপরিচিতের মত।

কমল বসেছিল তার বেঞ্চটায়। রোহিণীকে দেখে হেসে উঠে দাঁড়াল। কমলের দিকে তাকিয়েই চণ্ডীদাস ঘোষালের ভ্রূ দুটির কুঁচকে ওঠা রোহিণী লক্ষ করল। চিনতে পারার মত একটা ভাব ঘোষালের চোখে ফুটে উঠল কেন, সেটা সে আন্দাজ করল। সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে ঘোষাল দম্পতিকে ছবি দেখিয়েছিল তাহলে কমলদাই।

"দিদি, আপনি আসছেন না যে। ছুটি নিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, বরাবরের জন্য। গঙ্গাদার সঙ্গে দেখা করব, আছেন ?"

ঘোষাল গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।" কার্ডটা সে কমলের দিকে এগিয়ে দিল।

"আপনি কি ঘোষালবাবু ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে যেন চেনাচেনা মনে হচ্ছে ! আচ্ছা, আপনিই তো সল্ট লেকে দেখিয়ে ছিলেন শোভনেশ সেনগুপ্তর ছবি ?"

"আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" কমল হঠাৎই শশব্যস্ত হয়ে চণ্ডীদাস ঘোষালকে থামিয়ে দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদের কামরায় ঢুকে গেল। ঘোষাল আর রোহিণী দৃষ্টি বিনিময় করে হাসল।

সম্পাদকীয় দপ্তরের দরজা খুলে দুটি মহিলা বেরিয়ে গেলেন। দু-তিন সেকেন্ডের জন্য রোহিণী ভিতরটা দেখার সুযোগ পেল। তার চেয়ারটা খালিই রয়েছে দেখে একটু উন্মনা হল। গঙ্গাদা কি আশা করছেন রোহিণী আবার কাজ শুরু করবে ! বৃথা আশা। গঙ্গাদার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। জীবনের এই অধ্যায়টা একেবারেই বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তিতে বাকি জীবনটা কাটাবার চেষ্টা এবার সে করবে।

"আপনি ভেতরে যান।"

কমল দরজার পাল্লা খুলে ধরে রেখেছে। ঘোষাল ভিতরে ঢুকে যাবার পর সে রোহিণীকে বলল, "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, অফিসে গিয়ে বসুন।"

"আমি এই অফিস ছেড়ে দিয়েছি কমলদা, আর মায়া বাড়াব না। গঙ্গাদার সঙ্গে দরকারী একটা কাজ সেরেই চলে যাব।" রোহিণী বেঞ্চে বসল বলল, "বসুন আপনি। যতক্ষণ না ভদ্রলোক বেরোচ্ছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলি।"

কমল বসল না। রোহিণীর অফিস ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে তাকে মর্মাহত দেখাচ্ছে।

"আপনি আর কাজ করবেন না ? কেন, কি হল ? অন্য কোথাও ভাল কিছু পেয়েছেন নাকি ?"

"কিছুই পাইনি, আর হয়নিও কিছু। মাঝে মাঝে মানুষকে কুঁড়েমিতে ধরে, আমাকে এখন তাই ধরেছে। কতদিন ধরে থাকবে, কে জানে ! যাক্‌গে, আপনার ছেলে এখন কেমন আছে ?"

"ভালই। ভয়ের আর কিছু নেই। কিন্তু দিদি, আপনি আর আসবেন না শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।"

গঙ্গাপ্রসাদের কামরার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রোহিণী ম্লান হাসল। ঘোষালের বেরোতে এত দেরি হচ্ছে কেন ! তিন চারটে তো কথা বলবে। কোথায় যাব, কখন যাব, কি ধরনের ছবি আছে বা কেমন দামের ছবি আছে, এর বেশি আর কি কথা হতে পারে ?

এরপরই রোহিণীর হুঁশ হল, গঙ্গাদা আর ঘোষালের মধ্যে কি কথা হল সেটা সে জানবে কি করে ? ঘোষালের বাড়িতে ফোন করে বা বাড়িতে গিয়ে ? কিন্তু তার আগে এখানেই

তো ঘোষালের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেতে পারে! কিন্তু কমলদার সামনে তো ঘোষালের সঙ্গে কথা বলা যাবে না! তাহলেই গঙ্গাদার কানে তা পৌঁছে যাবে। আর যা ধূর্ত লোক, ঠিক বুঝে নেবে ঘোষালের ছবি কেনার পিছনে অন্য কোন ব্যাপার আছে।

"কমলদা, ভদ্রলোক তো এখন বেরোবেন বলে মনে হচ্ছে না, এদিকে নীচে একজনকে আমি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। আমি বরং নীচে গিয়ে তাকে বলে আসি, আপনি গঙ্গাদাকে বলে রাখুন আমি এসেছি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে।"

"সে আমি জানিয়ে দিয়েছি। আর এই ভদ্রলোক এখনি চলে যাবেন, এসেছেন তো ছবি কেনার জন্য।"

"কার ছবি?" রোহিণী দ্রুত প্রশ্নটা করে বসল। থতমত হয়ে কমলের মুখে অস্বস্তি দেখা দিল।

"কার ছবি? তাতো আমি বলতে পারব না।"

"ভদ্রলোক তখন বললেন সল্ট লেকে আপনিই তো শোভনেশ সেনগুপ্তর ছবি দেখিয়েছিলেন, কথাটার অর্থ ঠিক বুঝলাম না! ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপার আবার কি। বহু বছর আগে শোভনেশবাবু তাঁর কয়েকটা ছবি বিক্রির জন্য সাহেবকে দিয়েছিলেন। এই ঘোষালবাবু তারই একটা কিনেছিলেন। আমি ওনাকে ছবিগুলো দেখাই "

"কটা ছবি দেখান?"

"মনে নেই ঠিক...তিন চারটে হবে।"

রোহিণী বুঝে গেল, কমল মিথ্যে কথা বলল। চণ্ডীদাস ঘোষাল আর তার বৌ বলেছিল, দুটো ঘরভরা ছবি তারা দেখেছে।

"বাকিগুলো কি বিক্রি হয়ে গেছে?"

"বোধহয়।"

"তাহলে এখন ঘোষালবাবু কার ছবি কিনতে এসেছেন?"

"বলতে পারব না।"

রোহিণীর সপ্রশ্ন দৃষ্টি থেকে কমল চোখ সরিয়ে নিল। তার চোখমুখে গ্লানি। রোহিণী উঠে দাঁড়াল। "আমি নীচের থেকে আসছি।"

সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নীচে নেমে রোহিণী বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে চণ্ডীদাস ঘোষালের জলপাই রঙের মারুতিটাকে দেখতে পেল। গাড়ির কাছে অপেক্ষা করলেই ওকে ধরা যাবে। কিন্তু পেভমেন্টে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা মানেই কৌতূহল আকর্ষণ করা। নোংরা নজর পানের পিকের মত গায়ের উপর এসে পড়বে।

পাশের বাড়ির গেটের ধারে মশলা-মুড়ির দোকান। রোহিণী সেদিকেই এগিয়ে গেল।

"এক টাকার মুড়ি-নারকেল-বাদাম দাও তো।" বলতে বলতে রোহিণী থলি থেকে পার্স বার করল।

ঠোঙাটা হাতে নিয়ে সবেমাত্র মুখে একগাল ঢেলেছে তখনই সে, চণ্ডীদাস ঘোষালকে দেখতে পেল, মারুতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুখ ভর্তি মুড়ি নিয়ে ডাকা সম্ভব হল না, তাই সে আধছোটা হয়ে ঘোষালের কাছে পৌঁছল।

"আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। কী কথা হল?"

চণ্ডীদাস বলল, "কাল বেলা বারোটায় মিঃ ব্যানার্জি দমদমে এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে গাড়িতে অপেক্ষা করবেন। আমরাও সেখানে তাকে মীট করব। তারপর

একসঙ্গে যাব বাসুদেবপুর বলে একটা জায়গায়। সেখানে একটা বাড়িতে শোভনেশবাবুর পুরো কালেকশানটাই আছে।"

"কাল বারোটায়, এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে ?"

"হ্যাঁ। আমি বললাম, বাসুদেবপুর জায়গাটা কোথায় বলুন। আমরা নিজেরাই চলে যাব। তা, উনি বলতে চাইলেন না। 'ডিরেকশান দিলেও চিনে যেতে পারবেন না, ভিতরের দিকে একটা গ্রাম,' এইসব বলে এড়িয়ে গেলেন।"

"ঠিক আছে আপনি যান। আমি এখন গিয়ে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করব। দামটামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন ?"

"করেছি। দশ-বারো হাজারের মধ্যে অল্পই আছে। পঁচিশের উপরেই বেশি। শিগ্‌গিরই নাকি বোম্বাই আর দিল্লিতে শোভনেশবাবুর একটা একজিবিশন করবেন। আমেরিকাতেও করার জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছেন। ছবির দাম বাড়ানোর জন্যই এইসব কথা আমাকে শোনানো !"

"আচ্ছা, আমি আসি। হয়তো কাল দেখা হতে পাবে।"

রোহিণী দ্রুত পায়ে ফিরে গেল। দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছে, লিফটম্যান তাকে দেখে খুলে দিল। তিনতলায় থামতেই মুড়ির ঠোঙাটা সে লিফটম্যানেব হাতে ধবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

গঙ্গাপ্রসাদের কামরার দরজায় টোকা দিয়ে ঠেলে খুলল। মুখ তুলে তাকে দেখে গঙ্গাপ্রসাদ একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, "কে বোহিণী, এসো।"

চেয়ারটায় বসে, যেমন সে ভেবে রেখেছিল, কোন রকম ভণিতা না কবেই রোহিণী বলল, "আজ সকালে কুন্তীকে খুঁজতে গেছিলেন কেন ? সঙ্গে আবার দুটো লোক নিয়ে ?"

"বিশ্বনাথের বৌয়ের কিছু আবোল-তাবোল কথা মেয়েটি টেপ করে এনেছে। উপবে গিয়ে পরমেশের সঙ্গেও কথা বলেছে, টেপ করেছে। বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে দেবে বলে কথা দিয়ে এসেছে। খুব-ধড়িবাজ মেয়ে। যাই হোক, আমার মনে হল, ওকে দিয়ে এ কাজ করানো দুজনের পক্ষেই সম্ভব—তুমি আর মীনা। কেননা, শোভনেশ সেনগুপ্ত সম্পর্কে আর কারুর তো মাথাব্যথা থাকার কথা নয়।"

"সুজাতা গুপ্তও আছেন।"

গঙ্গাপ্রসাদের কপাল কুঁচকে উঠল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঁর কথাটা একদমই ভুলে গেছিলাম। তবে উনি কোন ফ্যাক্টর নন। যাই হোক, আমি প্রথমে তোমার কাছেই যাই। আর গিয়েই কুন্তীকে পেয়ে গেলাম। টেপের ক্যাসেটটা আমার চাই। নিশ্চয় সেটা তোমাকেই ও দিয়েছে।" ধীর, শান্ত স্বরে কথাগুলো বলে তিনি রোহিণীব মুখে সার্চলাইট চাহনি ফেললেন।

"হ্যাঁ দিয়েছে। এসব করার জন্য ওকে কিন্তু আমি বলিনি। নিজে থেকেই করে এনেছে। মিস্ট্রি, ক্রাইম, থ্রিল এইসবের দিকেই মেয়েটির ঝোঁক। ওকে শুধু সিদ্ধার্থ সিনহার আর্টিকেলটা পড়তে দিয়েছিলাম। তারপর নিজের উদ্যোগেই খোঁজাখুজি করতে বেরোয়। মনে হচ্ছে ক্যাসেটটা পাওয়া আপনার খুবই দরকার।"

"হ্যাঁ, দরকার।"

"না পেলে আপনার লোকেরা সেইসব কাজই করবে, যা মীনা চ্যাটার্জিকে করেছে ?"

"তার থেকে বেশি কিছুও করতে পারে।"

"আর যদি ক্যাসেটটা পেয়ে যান ?"

গঙ্গাপ্রসাদের চোখ পিট পিট করে উঠল। হাসি মাখানো মুখে রুমাল ঘষলেন। রুমালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যেন, কতটা হাসি তাতে লেগে রয়েছে। হাতটা বাড়িয়ে বললেন, "বারগেন করতে চাও ? মনে হচ্ছে, সঙ্গে করেই এনেছ ! দাও। ক্যাসেটটা। কথা দিচ্ছি কখনো কোন ঝামেলা হবে না।"

রোহিণী ঝুলি থেকে ক্যাসেটটা বার করে গঙ্গাপ্রসাদের হাতে দিল। তিনি চোখের কাছে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা দেখে টেবিলের ওপর রাখলেন। "গীতা আর পরমেশ দুজনেই এতে আছে ?"

"হ্যাঁ, যতটুকু পেয়েছে, তার সবই এতে রয়েছে।"

"বাড়ি গিয়ে শুনব।" চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজেকে শিথিল করে গঙ্গাপ্রসাদ স্মিত হেসে বললেন, "এবার তুমি কি ঠিক করলে, বিয়ে ?"

"হ্যাঁ। শুধু একটা কথা এবার জিজ্ঞাসা করব, মনে হয় সত্যি কথাই বলবেন।"

"মিথ্যে কথা বলার কোন কারণ তো নেই।"

"মিথ্যে আপনি অনেক বলেছেন, কাজও অনেক করেছেন। করেননি ?" রোহিণী ক্যাসেটটার দিকে তাকাল। গঙ্গাপ্রসাদ লক্ষ করলেন। তারপর চাপা হেসে বললেন .

"শোভুর আর বেঁচে থাকার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করিনি। পাগলের বংশ, ও পাগল হয়ে যেতই। মাঝে মাঝেই ওর মধ্যে উন্মত্ত ব্যাপার স্যাপার ফুটে উঠত। কুকুর পাগল হলে লোকে যা করে, আমি তাই করেছি। গুলি করে বা পিটিয়ে না মেরে, ওকে জেলের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেছি। তাতে সব থেকে উপকার হয়েছে কার জান ?"

গঙ্গাপ্রসাদ ঝুঁকে রোহিণীর মুখের দিকে তীব্র চোখে তাকালেন। অপলক দৃষ্টি রেখে রোহিণী বলল. "আমার ?"

"আমারও।" গঙ্গাপ্রসাদ আবার হেলান দিয়ে হাসিটা ফিরিয়ে আনার জন্য সময় নিলেন। "আমার টাকার দরকার। ইস্টার্ন ম্যাগাজিনসের জন্য এক্সপ্যানশন প্রোগ্রাম নিয়েছি। শুধুই কয়েকটা পত্রিকা নিয়ে থাকলে তো চলবে না। আরও নানান ব্যবসা খোলা দরকার। বাড়াতে হবে, ক্রমশ নিজেকে বাড়াতে হবে।" দু হাত বিস্তার করে তিনি বোঝাতে চাইলেন।

"সেজন্য আপনি ওর বাড়িটা আর ছবিগুলো হাতিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। নতুন কোম্পানি খুলছি। সেরামিক ফ্লোর টাইলস আর ওয়াটার হিটার তৈরির কারখানা শিগগিরই শুরু হবে উলুবেড়িয়ায়। আমার তখন খুব প্রয়োজন ছিল টাকার। তোমারও প্রয়োজন ছিল ওর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার, ঠিক বলছি কি ?"

"বোধহয় ঠিক।"

"এজন্য তোমাকে খেসারত দিতে হয়েছে শুধু তোমার স্বামীর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। আর সেজন্য তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হওনি। আগে যা ছিল তোমার, এখনো তাই রয়েছে। মাঝের থেকে পেয়েছ কিছু কঠিন অভিজ্ঞতা আর সম্ভবত প্রেম।"

গঙ্গাপ্রসাদ হাসতে লাগলেন। রোহিণী ভেবে পেল না, সে এই লোকটির ছ্যাঁকা ছ্যাঁকা কথাবার্তায় রেগে উঠবে কিনা।

"কিন্তু আপনি একটি লোকের—সুভাষ গায়েনের মৃত্যু ঘটার জন্য দায়ী, আপনি আসল বলে জাল ছবি বিক্রি করে কিছু লোককে ঠকিয়েছেন এবং আরো ঠকাবেন।"

"হ্যাঁ ঠিক কথাই, কিন্তু তাতে কী হয়েছে। একটা লোক মারা গেল তো বেশ গেলই।" গঙ্গাপ্রসাদ তাচ্ছিল্যে ভরে বললেন, "রোজ কত লোকই তো মারা যাচ্ছে, তাতে দেশের বা সমাজের কোন ক্ষতি হচ্ছে কি? ও লোকটা নিজে সৎ কাজ কিছু করেছে জীবনে?"

"মেরে ফেলার পক্ষে ওটাই কি আপনার যুক্তি?"

"হ্যাঁ। এরা হল আগাছা। উপড়ে ফেলে দেওয়াটাই ভাল। আমাদের দেশে প্রাণের দাম এত শস্তা যে, খুন নিয়ে বাচ্চা ছেলেরাও দুদিন পর রাস্তায় খেলা করবে। কেউ ফিরেও তাকাবে না।"

"আপনি তো একটা ভয়ঙ্কর মানসিক অবস্থার মধ্যে চলে গেছেন! শোভনেশ কি বেশি পাগল ছিল আপনার থেকে?" রোহিণী উঠে দাঁড়াল। ঝোলাটা কাঁধে তুলল।

"এক মিনিট। ভয়ঙ্কর মানসিক অবস্থার কথা বললে না?" গঙ্গাপ্রসাদ মিষ্টি করে হাসলেন, "তাহলে একটা সাধারণ গরিব চাষার কথা বলি। উত্তরপ্রদেশেব লোক, নাম গয়াসিরাম। ঝাঁসি জেলায় বাড়ি। জমিজমা সংক্রান্ত ঝগড়ায় সে নাকি একজনকে খুন করে। সেসন কোর্টে দুবছর পর ফাঁসির হুকুম হয়, পাঁচ মাস পর এলাহাবাদ হাইকোর্ট তা বহাল রাখে, দু বছর পর সুপ্রিম কোর্টেও তার আপিল অগ্রাহ্য হয়। ন' মাস পর ভারতেব রাষ্ট্রপতির কাছে তার প্রাণভিক্ষা কবে আবেদন জানায় গয়াসিরামের বৌ। ফাঁসির হুকুম হয়েছিল দশ বছর আগে, প্রাণভিক্ষার জন্য আবেদন সাত বছর আগে!

"রোহিণী, মানুষেব প্রাণের দাম আমাদের দেশে কতটা? সেটাই জানতে চাও তো? গয়াসিরামের ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করার জন্য গত চার বছরে উত্তরপ্রদেশ গর্ভমেন্ট ২১ বার রিমাইন্ডার পাঠিয়েছে ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রিতে। কিসসু হয়নি। ডিস্ট্রিক্ট জাজ জেলে গিয়ে গয়াসিরামকে দেখে এসে আই জি প্রিজন্সকে রিপোর্ট দেন, লোকটার মানসিক অবস্থা এখন এমনই, গরাদে মাথা ঠুকে নিজেকে হত্যা করবে যে কোন দিন। সেই রিপোর্ট ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রিতে পাঠানো হয় গত বছর, কিসসু হয়নি।

"গয়াসিরাম গত দশ বছর ধরে ঝাঁসির জেলে আছে কিভাবে জান? দশ বর্গফুটের একটা সেল-এ। তাতে পাথরের একটা ধাপ, সেটার উপব শোয়। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য তাকে সেল থেকে বের করে হাঁটিতে দেওয়া হয়। বাকি তেইশ ঘণ্টা সে থাকে দশ বর্গফুটের মধ্যে··· দশ বছর ধরে এভাবেই সে রয়েছে, এখনো! কল্পনা করতে পার রোহিণী? বাইরের কেউ গেলে গয়াসিরাম তাকে শুধু বলে · সাহিব, কছু করো। হামাবি ফাঁসি জলদি লাগওয়ায়ে দেও। লোকটার বয়স এখন ষাট।"

ভারী দেহটা নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ উত্তেজনায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। টেবিলে ঝুঁকে, দাঁড়িয়ে থাকা রোহিণীর মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, "এ দেশে মানুষের প্রাণের দাম? এ দেশে করুণা, মমতা, স্নেহ? কী জঘন্য অত্যাচাব চলেছে এই লোকটির উপর, যেজন্য সে এখন শুধু মরতেই চায়।·· আর আমিই হচ্ছি ভিলেন, বদমাস!"

শুনতে শুনতে রোহিণীর মাথাটা ঝন ঝন করে উঠেছিল। অস্ফুটে বলল, 'গঙ্গাদা এখন আমি আসি।"

আনমনে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফটকের বাইরে এসে দাঁড়াল। এখন অফিসের সময়। কাতারে কাতারে লোক হেঁটে যাচ্ছে। বাস আর মোটর যেন ধাক্কাধাক্কি করছে রাস্তায়। জীবনের এক বিশাল স্রোত সশব্দে তীব্র গতিতে ব্রেবোর্ন রোড ধরে প্রবাহিত হচ্ছে। রোহিণী নিজেকে সুস্থির করার জন্য ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল।

"রুনি, আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি" রাজেন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল "গাড়িটা ওধারে রেখেছি, চলো।"

'একটু দাঁড়াও রাজেন, এক মিনিট।"

ব্রেবোর্ন রোডের পেভমেন্টে জনস্রোতের মাঝে দাঁড়িয়ে রোহিণী বাস্তব জগৎটাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করল। একটু আগে গঙ্গাপ্রসাদ মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের যে বীভৎস কাহিনীটা তাকে শোনালেন, তারপর অসুস্থ বোধ না করে উপায় নেই। দশ বছর ধরে একটা গরিব নিরক্ষর, বুড়ো চাষীকে দশ বর্গফুট ডেথ-সেলে আটকে রেখেছে, রাত দিনে এক ঘণ্টার জন্য মাত্র বাইরে বেরোতে পারে, সে এখন শুধুই মরতে চায়, বাঁচার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে! মানুষকে এই অবস্থায় নিয়ে গেছে মানুষই!

রোহিণী আপন মনেই বলল, "যেন মরেই যায়।"

"হল কি তোমার? কার মরার কথা বলছ? গঙ্গা ব্যানার্জি কী বলল?"

"বলছি সব। চলো।"

রাজেনের বুড়ো হিলম্যানটিকে দেখে কেন জানি রোহিণীর মায়া হল। সস্নেহে রঙচটা তোবড়ানো দরজায় হাত বুলিয়ে সে বলল, "রাজেন, বুড়োকে এবার ছেড়ে দাও।"

"সে কি, ছাড়ব মানে? এখনো ছোকরা মারুতিদের সঙ্গে সমানে টক্কর দেয়। শুধু হাত পা অবশ্য একটু কাঁপে, মাঝে মাঝে কাশেটাশেও—।" বলতে বলতে রাজেন সেল্ফ স্টার্টারের চাবি ঘোরাল। হিলম্যান বার কয়েক কঁকিয়ে উঠে চুপ করে গেল।

"অথচ বাড়ি থেকে বার করার সময় সঙ্গে সঙ্গেই স্টার্ট নিয়েছিল! তুমি চড়লেই ওর যতো ভীমরতি ধরে।" রাজেন হতাশ চোখে ড্যাশবোর্ডের মিটারগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল

"তাহলে আমি কি এখন নামব?" রোহিণী দরজার হাতলে হাত রাখল। "কিন্তু বুড়ো কি তাতে আরো মনমরা হয়ে যাবে না?"

"যেতে পারে।" রাজেন এরপরই ধমকে উঠল, "অ্যাই বুড়ো, এবার যদি স্টার্ট না নাও, তাহলে মল্লিক বাজারের কসাইখানায় কিলোদরে বেচে দিয়ে আসব তোমায়! মনে থাকবে?...নাউ, অন ইওর মার্ক...সেট...গোওও।"

চাবি ঘোরানোমাত্র এঞ্জিন বারদুই খুক খুক করে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"রেগে গেছে বোধহয়।" রোহিণী স্বস্তি বোধ করল।

"ভয় পেয়েছে।" রাজেন হুঁশিয়ার দৃষ্টিতে একটা মিনিবাসকে লক্ষ করতে করতে ক্লাচ ছাড়ল।

"তোমার এখন কাজ কী?"

"সি এ বি-তে যাব। ওখানে জীবুদাকে যদি পাই, তাহলে ভালই। ওর শালার বন্ধু ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, জীবুদাকে নিয়ে তার বাড়িতে যাব। তারপর থাকার ব্যবস্থার খোঁজে যাব জহিরুলের বাড়ি, পার্ক সার্কাসে।"

"আমি এখন পার্ক সার্কাসেই যাব, মীনা চ্যাটার্জির কাছে। তুমি ওখানেই নামিয়ে দাও আমায়।"

"বেশ, ততক্ষণে বলো, গঙ্গা ব্যানার্জির সঙ্গে কি কথা হল। ক্যাসেটটা দিয়েছ?"

"দিয়েছি। উনি জেনে গেছেন, কুন্তী ওই বাড়িতেই থাকে। ক্যাসেটটা পেলে উৎপাত করবেন না কথা দিতে আমি ওঁর হাতে দিলাম।"

"কথা রাখবে তো ?"

"মনে হয় রাখবেন। গঙ্গাদা জাত-ভিলেন বলতে যা বোঝায়, সেরকম ঠিক নন। ওঁর অ্যাম্বিশন এখন ব্যবসা করে বড় হবার দিকে। ছ' সাত বছর আগে এক্সপ্যাণ্ড করার জন্য খুব বেশি ক্যাপিটাল ওঁর ছিল না। কয়েক লাখ টাকার জন্য তখন যে কাজ করেছিলেন, ওই পরিমাণ টাকার জন্য এখন হয়তো আর বন্ধুকে জেলে বা ফাঁসিতে পাঠাবার কথা ভাববেন না। অতীত কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে গেলে বিপদে পড়তে পারেন ভেবেই গত কয়েক দিনে এই সব কাণ্ড করেছেন।"

"ওর সম্পর্কে আমার রীডিংও তাই। শোভনেশ সেনগুপ্ত এখন ওর গলার কাঁটা, সেটা তুলে ফেলার জন্য একটা বক খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার কী মনে হচ্ছে, জান ?"

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে ট্রাম আর দোতলা বাসের মাঝে প্রায় পিষে যাবার মত অবস্থায় হিলম্যান জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে। রাজেন শঙ্কিত চোখে বাঁ দিকের বাসটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "গঙ্গা ব্যানার্জি এখন সেনগুপ্তকে পেলেই খুন করবে। ওঁকে সরিয়ে দিতে পারলেই ব্যানার্জির টিকি আর কেউ ছুঁতে পারবে না।"

বাঁ দিকের বাসটা ঘোঁত ঘোঁত করে এগিয়ে গেল। রাজেন ডান দিকের ট্রামের থেকে এক হাত সরিয়ে আনল গাড়িকে।

"আমারও রীডিং তাই।" রোহিণীর মৃদু স্বরে বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগল। রাজেনের কানে তা ধরা পড়ল। "গঙ্গাদা বললেন, শোভনেশের আর বেঁচে থাকার দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন না। ওঁর যুক্তিটা : হল, পাগলের বংশ, একদিন না একদিন ও পাগল হয়ে যেতই। আচ্ছা রাজেন, তুমিও কি তাই মনে করো ?"

"না, মনে করি না।" কথাটা বলেই রাজেন গাড়ি চালানোয় মন দিল।

মিনিট তিনেক পর রেড রোডের মুখ থেকে বাঁ দিকে পার্ক স্ট্রিট যাবার রাস্তায় বেঁকে রাজেন মুখ খুলল, "কেন মনে করি না, জানতে চাও ?"

রোহিণী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"শোভনেশ সেনগুপ্ত প্রতিভাবান। পাগল বলতে সাধারণত যা আমরা বুঝি, উনি সেই পর্যায়ে পড়েন না। ওঁকে আমাদের স্বাভাবিকত্বের মাপকাঠি দিয়ে মাপলে ভুল করা হবে। আমরা সাধারণ, ছাপোশা, মিডিওকার, ভীতু, নানান সংস্কারে বাঁধা কূপমণ্ডুক। পৃথিবীতে আমরাই সংখ্যায় বেশি। আমরা গাওস্কারকেই পছন্দ করি, হতে চাই ওই রকমই, কিন্তু দূর থেকে অ্যাডমায়ার করি গ্যারি সোবার্সকে। শোভনেশ সেনগুপ্তর মত বাঁধনছেঁড়া নিয়মভাঙা লোককে আমরা ভয় পাই। এঁদের ছোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য একটা পাঁচিল তুলে দিয়ে সেটাকে পাগল বলি। রুনি, তুমি এই পাঁচিলটা টপকাতে গিয়ে পড়ে গেছ।"

শুনতে শুনতে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে গেল রোহিণী। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, "হয়তো তাই। কিন্তু শোভনেশ পাগলই। অস্বাভাবিক। পাগলের ডেফিনিশন যাই হোক না কেন, একটা মেয়ের নিজস্ব কিছু সংজ্ঞা থাকে স্বামী সম্পর্কে। এই নিজস্ব ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যায় না। আমি ভুল নির্বাচন করেছিলাম।"

"আবার সেই ভুল করতে যাচ্ছ না তো ?"

রোহিণী মুখ ফিরিয়ে রাজেনের দিকে তাকাল। হাসি ছড়াল তার মুখে। "শোভনেশের হয়ে ওকালতি শুরু করলে কেন, কি ব্যাপার ?"

"আই অ্যাডমায়ার দ্যাট ম্যান।"

"তাহলে বোধহয় ভুল করতে, যাচ্ছি।"

"সর্বনাশ! তুমি কি আমাকে প্রতিভাবান ভাবলে নাকি? আরে আমার আইডল গাওস্কর!"

"তাহলে ঠিক আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে পাগলামির একটা স্ট্রেক তোমার মধ্যেও ঝলসায়। যাই হোক, সেটা আমি ম্যানেজ করে নেব।"

"আমার মধ্যে পাগলামি? বলছ কি! তোমার মাথাটাও দেখছি বোধহয়—"

"ওইভাবে জয়পুরে সেঞ্চুরি আর টেলিফোন, সুস্থ মাথায় করা যায় না।"

"মাথাটা তো আর আমার হাতে এখন নেই।"

"হয়েছে হয়েছে। এবার একটু দেখে চালাও তো। আর শোন, কাল একটা ব্যাপার আছে। চণ্ডীদাস ঘোষাল নামে এক ভদ্রলোককে গঙ্গাদা কাল শোভনেশের ছবি দেখাতে নিয়ে যাবেন বাসুদেবপুরে। ওখানেই সব ছবিগুলো লুকিয়ে জমা করা আছে।"

"তাহলে হদিশ পাওয়া গেছে!" রাজেন সিধে হয়ে বসল।

"কাল দুপুর বারোটায় মিট করবে এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে। সেখান থেকে রওনা হবে বনগাঁর দিকে। মছলন্দপুর আর গোবরডাঙার মাঝামাঝিই বোধহয় গ্রামটা। ওদের পিছু নিয়ে কাল আমরা যাব।"

"ব্যাপারটা থ্রিলিং হবে মনে হচ্ছে। কুন্তীকে কি—"

"খবরদার! ওকে সঙ্গে নিলে সব গুবলেট করে দেবে। চণ্ডীদাস ঘোষালকে আমিই পাঠাচ্ছি ছবি কেনার ছলে জায়গাটা দেখে আসতে। উনিও শোভনেশের অ্যাডমায়ারার, তবে বৌকে চটাতে চান না।"

"আমিও চটাব না।"

"হ্যাঁ, চটিও না। এখন আমি মীনাকে ব্যাপারটা বলব, দেখি ও কী করে।"

হিলম্যান এসে থামল মীনা চ্যাটার্জির অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নেমে রোহিণী আর একবার মনে করিয়ে দিল, "কাল এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমাকে তুলে নেবে। একটু আগে গিয়েই অপেক্ষা করব। বুড়োকে আজ বেশি খাটিও না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ওকে ওষুধটসুধ দিয়ে, মালিশ করে চাঙ্গা করে রেখ।"

"কিন্তু এখন যে জীবুদা আর জহিরুলের কাছে যেতে হবে। বুড়োকে একটু তো খাটাবই।"

"একটুই, তার বেশি একদম নয়।"

"আমি কি বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে আসব, নাকি—"

"আমার হাতে এখন গোনাগুনতি টাকা, একস্ট্রা বাজার করার পয়সা নেই। দাও তো গোটা কতক টাকা।"

রোহিণী হাত পাতল। পার্সটা বাড়িয়ে দিল রাজেন। চোখ বুঁজে পার্সে আঙুল ঢুকিয়ে কয়েকটা নোট তুলে রোহিণী ঝুলিতে ফেলে দিয়ে বলল, "খেলা থেকে রিটায়ার করলে খাওয়া কমাতে হয়, নইলে চেহারা বেঢপ হয়ে যাবে, এটা খেয়াল রেখ।"

"কিন্তু তুমি যে কাল বললে খেলা কখনো ফুরোয় না। শুধু এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে সরে যায়। অন্য মাঠে খেললে কি খাওয়া বন্ধ করতে হবে? আমি তো ভাবছিলাম, চাকা চাকা করে মুলো কেটে টক্ আর বোয়াল মাছ, আলু, হিংয়ের বড়ি, বেগুন সিম দিয়ে—।"

রোহিণী ততক্ষণে এগিয়ে গেছে বাড়ির ফটকের দিকে।

বেল বাজাতে মীনা চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দাঁড়াল যে লোকটি, তাকে দেখেই রোহিণীর মনে পড়ল, সকালে গঙ্গাদার সঙ্গে আসা লোক দুটোর চেহারা। অনেকটা একই ধাঁচের। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, ছিপছিপে, বুক খোলা কালো স্পোর্টস শার্ট, জীনস, বেল্ট, এলোমেলো চুল, চোখে অমার্জিত ধূর্ত চাহনি, হাতে লোহার বালা। ফিল্মের পোস্টারে অমিতাভ বচ্চন বা মিঠুন চক্রবর্তীকে যেভাবে দেখা যায়, প্রায় সেই রকমেরই।

"মিস চ্যাটার্জি আছেন ?"

"আপনার নাম ? কি দরকার ?"

লোকটির বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ থেকেই রোহিণী বুঝে গেল, মীনা নিরাপদ থাকার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন।

"আমার নাম রোহিণী, ওর পরিচিতই আমি।"

লোকটি তার মুখের উপর চাহনি রাখল কিছুক্ষণ। ঝোলাটার দিকে তাকাল, এবং অবশ্যই গলা থেকে চটি পর্যন্ত বার দুই। রোহিণী ভেবে পেল না, তাকে বিদায় নিতে না অপেক্ষা করতে হবে !

এক মিনিট পরেই দরজা খুলল। "ভেতরে যান।"

লোকটির গা ঘেঁষেই রোহিণীকে ঢুকতে হল। ভিতরের ঘরেব দবজার পর্দা তুলে মীনা দাঁড়িয়ে। কপালে স্টিকিং প্লাস্টার। রোহিণী বিস্ময় দেখাল ভ্রূ তুলে।

"আসুন। এই ঘরেই বসি।"

শোবার ঘরে ঢুকেই রোহিণী খুঁজল ছবিটাকে। নেই।

"কি হয়েছে আপনার কপালে ?" খাটের ধারে বসে বিস্মিত রোহিণীব প্রথম প্রশ্ন।

"কপাল ফেটেছে। মিসেস সেনগুপ্ত, আমার কপালটাই এই রকম, কিছুই আর আস্ত থাকে না। ফাটা কপাল নিয়েই আমাকে দিন কাটাতে হবে।" মীনা নাটকের সংলাপ বলার ঢঙে কথাগুলো বলে এবং বলতে পারার কৃতিত্বে হাসল।

"পড়ে গেছিলেন ? বাথরুমে ? আর একটু নীচে হলেই তো চোখটা যেত ! রাবারের স্লিপার পরেছিলেন নাকি ?"

মীনা মাথা নাড়ল। মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল, যেখানে ছবিটা টাঙানো থাকত। রোহিণীকেও মুখ তুলে দেয়ালের দিকে তাকাতে দেখে ম্লান হেসে মীনা বলল, "দেখেছেন, ছবিটা আর নেই। গঙ্গাপ্রসাদবাবুর লোকেরা এসে আমাকে মেরে ছবিটা নিয়ে চলে গেছে।"

"সে কি !" রোহিণী দাঁড়িয়ে উঠল। "এ কি বলছেন !...অসম্ভব, এ অসম্ভব, অবিশ্বাস্য !"

মীনা জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে। ঠোঁটের কষ মোচড়ান।

"একটা ছবির জন্য কোন মানুষ এমন কাজ করতে পারে ?" রোহিণী প্রশ্নটা করল মীনাকে কথা বলাবার জন্য।

"পারে কি না পারে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। হ্যাঁ, একটা ছবির জন্যই। আপনাকে যখন ফোন করছিলাম, তখনই লোকগুলো এসেছিল।"

"হ্যাঁ, হঠাৎ তখন লাইনটা কেটে গেল দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। তাহলে ব্যাপারটা তখনই ঘটেছিল !"

"কিন্তু গঙ্গা ব্যানার্জিকে আমি সহজে ছাড়ব না। আমার ক্ষমতা কতটা, সেটা ওকে দেখাব। আমি সুযোগ পাই একবার—।" দাঁতে দাঁত চেপে মীনা দু হাত মুঠো করল।

"এভাবে অপমান করবে ? কতকগুলো গুণ্ডাকে পাঠাবে আমার গায়ে হাত তোলার জন্য, আর আমি সেটা মেনে নেব ?" হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত সে কাঁপতে শুরু করল।

এখন কোন কথা বললে ওঁর মাথায় ঢুকবে না। মীনাকে সুস্থির হবার জন্য সময় দিয়ে রোহিণী বলল, "ছবিটাই চলে গেল। একটা মাস্টারপিস ! ...পুলিশে জানিয়েছেন ?"

"দরকার নেই জানাবার। ওটা আমি খুঁজে বার করবই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত খুঁজব, আমার শেষ কপর্দকও আমি খরচ করব। আর ওই লোকটাকে— ।"

রোহিণীর মনে হল চকমকির ঘষা থেকে ছিটকে বেরোনো ফুলকির মত কথাগুলো মীনার দাঁত থেকে বেরিয়ে এল। প্রতিশোধ নেবার বাসনায় ওঁর সুন্দর মুখটা দুমড়ে মুচড়ে বীভৎস দেখাচ্ছে।

"ছবিটা কোথায় পাবেন বলে আপনার ধারণা ?"

মীনা হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল। "জানি না। তবে ওর অফিসে বা বেলেঘাটার প্রেসে নেই। আর বাড়িতে তো রাখবেই না।"

"শুধু তো একটা ছবি নয়, আরো অনেক ছবিই রয়েছে শোভনেশের। সেগুলোই বা কোথায় ?" রোহিণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

মীনার বসার ভঙ্গিটা বদলাচ্ছে। চোখে চিন্তার ছায়া পড়ল। অস্ফুটে বলল, "সব ছবি পুড়িয়ে ফেলা দরকার।"

"পুড়িয়ে ফেলা !" রোহিণী হাঁ করে ফেলল কথাটা শুনে।

"শোভনকাকা চার বছর আগে আমাকে তাই বলেছিলেন। উনি নতুন মানুষ হতে চান, বলেছিলেন, যা এঁকেছি সব বাজে, নষ্ট মনের কাজ। জানেন, সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করি, ওঁর মনের ইচ্ছা আমি পূরণ করব। ওঁকে শান্তি দেব।" মীনা টানা কথা বলে মুখ নামিয়ে রাখল।

"আমার একজন পরিচিত লোক, শোভনেশের ছবি কেনার জন্য গঙ্গা ব্যানার্জির কাছে গেছিল। উনি বলেছেন, ছবিগুলো কলকাতায় নেই, বাইরে আছে।"

"কোথায়, কোথায় আছে ?" বিদ্যুৎ ছুঁয়ে ফেলা প্রাণীর মত মীনার মুখ ছিটকে উঠল।

"কাল দুপুর বারোটায় এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে লোকটিকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। সেখানে ওঁরা মীট করবেন। তারপর রওনা হবেন বাসুদেবপুর বলে একটা গ্রামের দিকে। সেখানেই গঙ্গা ব্যানার্জির বাড়িতে ছবিগুলো আছে।" রোহিণী ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল, যাতে মীনার বুঝতে অসুবিধা না হয়।

"কি বললেন ! কালকেই যাবে ? বাসুদেবপুর ? কোথায় সেটা ?"

"বনগাঁর দিকে। আমি আর কিছু জানি না।"

"কাল বারোটায়, এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে ?"

"হ্যাঁ।"

মীনা প্রায় লাফিয়েই টেলিফোনের কাছে গেল। অধৈর্য হয়ে ডায়াল করতে গিয়ে দুবার আঙুল পড়ল ভুল নাম্বারে। অবশেষে যথাযথ নাম্বারে যোগাযোগ ঘটল। উত্তেজনায় টসটস করছে তার মুখ।

"হ্যালো, কে, শঙ্করবাবু ?...আমি মীনা চ্যাটার্জি বলছি। বাচ্চুদা আছে কি ?...হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে একবার দিন।"

ফোন ধরে অপেক্ষা করতে করতে আঙুল দিয়ে কপালের উপর থেকে চুল সরাচ্ছে মীনা। রোহিণী তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। কি যে ভাবছে মীনা। চোখ দুটো

সরু হয়ে কুটিল, আবার বিস্ফারিত হয়ে ক্রুদ্ধ, পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করে আবেগ দমনে ব্যস্ত। ওর মনের মধ্যে কিসের ওঠাপড়া চলছে, রোহিণী তার খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে।

"হ্যালো, হ্যাঁ, বাচ্চুদা ? আমি মীনা, কি হল ? সেদিন যে বললাম, পরশুর মধ্যে আপনাদের ডিসিশন জানিয়ে দেবেন...হ্যাঁ ? আর বাড়াতে পারবে না ? কিন্তু...হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বুঝলাম, কিন্তু স্টোরি এমনই হ্যাকনিড, বস্তাপচা যে, ধেই ধেই নেচে আর ভেউ ভেউ কেঁদেও তিনদিনের বেশি দর্শক, পারব না। হ্যাঁ, বলুন শুনছি... ।"

রোহিণী লক্ষ করল মীনা কিছু শুনছে না, শুধু কানের কাছে ফোনটা ধরে আছে। প্রথম যখন মীনার সঙ্গে সে দেখা করে, তখন ঘরে তিনটি লোক বসেছিল, বোধহয় কোন ফিল্মে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তাদের একজনকে, বাচ্চুদা, বলে মীনা ডাকে। সম্ভবত তার সঙ্গেই মীনা কথা বলছে।

"বেশ তাহলে রাজি। কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিন ! সামান্য কাজ, আর তা করে দেওয়ার জন্য আপনার হাতে সেরকম লোকও আছে, আমি জানি। ...না না অত বিনয় করতে হবে না বাচ্চুদা, খরচ যা করতে হয় আমিই করব, আপনি শুধু ব্যবস্থাটা করে দিন। ফোনে সব কথা তো বলতে পারব না, অসুবিধে আছে, হাতে সময়ও খুব কম, আপনি এখুনি চলে আসুন, এখুনি।...আভাস মানে এইটুকুই বলতে পারি, কলকাতার বাইরে গ্রামের দিকে কাল একটা ছোট্ট ব্যাপার, কী বলে অ্যাকশন, করে আসতে হবে।... একজনের বাড়িতে।...বাড়িটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসতে হবে।"

রোহিণী দেখল, মীনার চোখমুখ হঠাৎ কিরকম বদলে গেল। শান্ত, পরিহাসের ভঙ্গিটা রূপান্তরিত হয়েছে তেল কমে যাওয়া প্রদীপের দপদপে শিখার মত। রক্ত জমে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখটা।

"হ্যাঁ, বললাম তো, ওই টাকাতেই আমি রাজি, অবশ্য যদি আমার এই কাজটা...বেশ, এখুনি আসছেন ?...আচ্ছা।"

ফোন রেখে মীনা হাসল রোহিণীর দিকে তাকিয়ে। সিরসির করে উঠল রোহিণীর সর্বাঙ্গ। মীনাকে এখন এক দানবী মনে হচ্ছে।

"আমি এখন যাই।"

"হ্যাঁ, আসুন। কাল যদি এমন সময় আসেন বা ফোন করেন, তাহলে ভাল একটা খবর আপনাকে দিতে পারব। গায়ে হাত দেওয়ার বদলা মীনা চ্যাটার্জি কিভাবে নেয়, সেটাই আপনাকে কাল জানাব।" কথাটা বলেই মীনা দু হাত বাড়িয়ে রোহিণীর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে, বলল, "ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ, খবরটা আমায় দেওয়ার জন্য।"

মীনার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার সময় রোহিণীর মনে হল, বাসুদেবপুরে ছবিগুলো আছে, এই খবরটা মীনাকে জানিয়ে বোধহয় সে ভাল কাজ করেনি। কিন্তু টিউব টিপে পেস্ট বার করে ফেলে আর তা টিউবে ঢোকানো তো যায় না ! বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকার সময় সে ভাবল, গঙ্গাদাকে ফোন করে যদি সে বলে দেয়, কাল একটা সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে বাসুদেবপুরে, তাহলে নিশ্চয় সেটা মানবিক কাজ হবে, কিন্তু— ! এই কিন্তুটাকে নিয়ে সে সল্টলেক পর্যন্ত সারাটা পথ নিজেই নিজেকে নাস্তানাবুদ করল। তার বাস্তববোধ এত ভাল ড্রিবল করল কিন্তুটাকে নিয়ে যে, রোহিণীর মানবিকতার ডিফেন্স তছনছ হয়ে গেল।

যা হবার হোক্‌, এই রকম একটা মানসিক অবস্থা নিয়ে সে কুন্তীদের ফ্ল্যাট পেরিয়ে

তিনতলার সিঁড়িতে পা রেখেও ফিরে এসে বেল বাজাল।

দরজা খুললেন মাসীমা।রোহিণীকে,দেখে একগাল হেসে বললেন, "এঁচোড়ের কোপ্তা তোমার নাকি খুব ভাল লেগেছিল ? কই আমাকে একবারও তো সেকথা বললে না ?"

"আপনার হাতের রান্না ভাল হয়েছে, সেকথা আবার বলার অপেক্ষা রাখে নাকি ! তাহলে তো রসগোল্লা খেয়েও বলতে হয়, আহা কি মিষ্টি লাগল !"

পুলকিত মাসীমা ঝটতি প্রতিশ্রুতি দিলেন, "আর একদিন করে খাওয়াব তোমায়।"

"কুন্তী কোথায় মাসীমা ?"

"আর বোল না সে মেয়ের কথা, পল্টু তো গৌহাটি থেকে আজ দুপুরেই ফিরে এসেছে।"

"আরও দুদিন পরে ফেরার কথা না ?"

"আমি তো তাই জানি !" মাসীমা দুধারে তাকিয়ে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "থাকতে পারে না, বুঝলে, বৌকে ছেড়ে দুদিনের বেশি থাকতে পারে না। কাজকম্মো ফেলেই পালিয়ে এসেছে।"

"কুন্তীও খুব ভালবাসে।"

"ছাই বাসে ! পল্টু ফেরামাত্রই শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। তারপর মারামারি। কি বলব তোমায় লজ্জার কথা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল্টুটা গাধার মত মার খেল ! ওর অপরাধ, কেন ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করাচ্ছে না। আচ্ছা তুমি বলো, জ্বর নেই জাবি নেই, থ্রম্বসিস হয়নি, অম্বল হয়নি, একটা ফোঁড়াও হয়নি, এমন একটা মানুষকে কি নার্সিংহোমে দেয় কেউ ?"

"মারমারিতে কি রেজাল্ট হল মাসিমা ?"

"কে জানে। দুটোতে মিলে তো বিকেলবেলায় বেরোলো, সিনেমা টিনেমায় হয়তো গেছে।"

"কিংবা নার্সিংহোমের খোঁজে। আসি মাসীমা। কোপ্তা কিন্তু তাড়াতাড়ি চাই।"

তিনতলায় না থেমে রোহিণী চারতলায় উঠে এসে সুজাতা গুপ্তদের দরজার সামনে উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়াল বেল বাজিয়ে।

একটু দেরী করেই দরজা খুললেন হৃদয়রঞ্জন। টিভি থেকে নাটকের সংলাপ ভেসে আসছে।

"মাসীমার খবর কি ?"

"ফোন করেছিল।" ধীর আশ্বস্ত স্বর। "বহরমপুর থেকে।"

"বহরমপুর !" রোহিণীর চোখের উপর দিয়ে ঝলসে গেল শোভনেশের ভাঙাচোরা মুখ, কয়েকটা ন্যুড ছবি, বালিশে পিঠ দিয়ে আধবসা অবস্থায় মাথাটা পিছনে হেলিয়ে চাদর ঢাকা এক আবছা রমণী।

"কেন, বহরমপুরে কেন গেছেন ?"

"ওখানে ওর মাসতুতো এক দাদার বাড়ি, খাগড়ায়। টেলিফোন করেছিল তুষারবাবুদের ঘরে। আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু আপনি তো বিকেলে তখন ছিলেন না, তাই ওরা আমাকেই ডেকে দেয়। বলল, কি একটা জরুরী কথা আপনাকে জানাতে চায়। আমি বললাম, আমাকে বলো, আমি জানিয়ে দেব। কিন্তু বলল, না, শুধু রোহিণীকেই বলব।"

"আর কিছু বললেন ?" রোহিণী অস্বস্তি আর ভয় নিয়ে তাকিয়ে রইল অভিব্যক্তিহীন

হৃদয়রঞ্জনের মুখের দিকে।

"না। কালকেই ফিরে আসছে, শুধু এইটুকু বলেই ফোন রেখে দিল।"

"কাল কখন? ট্রেনে না বাসে আসবেন?"

"জানি না।"

রোহিণী ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। না বলে-কয়ে হঠাৎ মাসতুতো দাদার বাড়ি বেড়াতে এই বয়সে যান না। নিশ্চয় শোভনেশকে দেখতেই গেছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্য? মামলা আবার শুরু করার জন্য কথাবার্তা বলতে? কিন্তু উনি তো জানেন, শোভনেশ বহরমপুর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে! তাহলে আবাব ওখানে যাওয়া কেন? কাল ওনার ফিরে না আসা পর্যন্ত উত্তরটার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

দরজায় চাবি ঢোকাতে গিয়ে গর্তটা দুবারের চেষ্টায় সে খুঁজে পেল। হাতটা কাঁপছিল। রোহিণীর মনে পড়ল, মীনারও এমন হয়েছিল টেলিফোন ডায়াল করার সময়।

॥ এগারো ॥

রোহিণী স্বপ্ন দেখছিল।

ইংরাজি কথোপকথন শোনানোর জন্য দুই মেয়েকে বাবা মাঝে মাঝে ইংরাজি ফিল্ম দেখাতে নিয়ে যেতেন। টার্জান, চ্যাপলিন, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, লরেল হার্ডির পর রোহিণীর ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় হিচককে প্রোমোশন ঘটে। তখন 'স্পেলবাউন্ড' দেখেছিল। তাতে একটা উদ্ভট স্বপ্নের দৃশ্য ছিল, যার মাথামুণ্ডু সে একদমই বোঝেনি। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে সে স্বপ্নটা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই বাবা বিব্রত হয়ে বলেন, "ওটা হল অবচেতনের ব্যাপার। মানুষের চেতনার তলদেশে অনেক কিছু জমা হয়ে থাকে। কখনো সখনো সেগুলো অদ্ভুত চেহারা নিয়ে উপরে ভেসে ওঠে। এই দৃশ্যটার পরিকল্পনা করেছেন সালভাদোর দালি, খুব বড় একজন আর্টিস্ট। উনি এই ধরনের ছবি এঁকে বিশ্ববিখ্যাত হযেছেন। আরো বড় হও, তখন চেতন-অবচেতন সম্পর্কে আরো জানতে, বুঝতে পারবে।"

তারপর রোহিণী বড় হয়েছে বটে, কিন্তু অবচেতন নিয়ে কখনো জানা বা বোঝার জন্য মাথা ঘামায়নি। এই ধরনের স্বপ্নের বিবরণ গল্পে-উপন্যাসে পড়েছে। কিন্তু নিজের জীবনে সে এই প্রথম দেখল।

একটা চৌকো ঘর, ঘরের গরাদবিহীন জানালাগুলো বন্ধ, শুধু এক দিকের একটার পাল্লা আধখোলা। ব্যাটারি ফুরনো টর্চের মত ম্লান আলো বাইরে থেকে ঘরে এসে পড়েছে। তাইতে দেখা যাচ্ছে, চৌকো আকারের সাদা আর কালো মার্বেলের মেঝে। একটা খাট ঘরের দেয়াল ঘেঁসে। তাতে বালিশে পিঠ দিয়ে আধবসা অবস্থায় একটা মূর্তি। তার মাথাটা পিছনে হেলানো, মুখটা সিলিংয়ের দিকে তোলা, বাঁ হাতটা ঝুলছে খাট থেকে, ডান হাঁটু মুড়ে উঁচু করা, শরীর একটা চাদরে ঢাকা। মূর্তিটা আবছা অন্ধকারে নিথর হয়ে রয়েছে। ঘরটায় গুমোট হয়ে জমে রয়েছে নৈঃশব্দ্য। ঘরে ঢুকল এক রমণী। অন্ধকারে সে দেহ থেকে বসন খুলতে লাগল। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে, মেঝেয় যেখানে টর্চের মত আলো, তার উপর গিয়ে দাঁড়াল। আলোটা ক্রমশ ম্যাজেন্টা রঙে পরিণত

হল। রমণীর মুখ নেই। তার বদলে সেখানে শাদা রঙ করা একটা ক্যানভাসের টুকরো পিন দিয়ে আঁটা। রমণী মেঝেয় উবু হয়ে বসল। দুই হাঁটু জোড়া করে সামনে ঝুঁকে, দুহাতে দুটি পা জড়িয়ে ধরল। মুখটি রাখল হাঁটুতে। স্তনদ্বয় ঊরুতে চেপে রাখা। টানা ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে মাথা থেকে নিতম্ব পর্যন্ত পৃষ্ঠদেশ। রমণী ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে পাথরের মত কঠিন আকার নিল। এই সময় সেই ঘরে ঢুকল একটি কালো বিড়াল। একধারে থাক্ দিয়ে রাখা তোরঙ্গের উপর বিড়ালটি লাফিয়ে উঠল। দুই থাবা সামনে রেখে সে সামনে তাকিয়ে বসে থাকল। ধীরে ধীরে সে জমাট হয়ে গেল। এবার ঘরে ঢুকল একটি দীর্ঘকায় পুরুষ। তার চুল কাঁচাপাকা, ঝাঁকড়া, ফাঁপানো। দক্ষযজ্ঞের শিবের মত। পুরু জুলপিতে গালের অর্ধেক পর্যন্ত ঢাকা। সরু সরু আঙুল, চওড়া কব্জি। চোখ দুটি কোটরে ঢোকানো, জ্বলজ্বলে। ঘন ভুরুর চুলগুলিও ধূসর। লোকটির হাতে বলির খড়্গ। সে সোজা খাটের কাছে গিয়ে খড়্গ দিয়ে মূর্তিটির ঘাড়ে কোপ বসাল। মাথাটা ধড় থেকে ছিটকে মেঝেয় পড়ল। এরপর সে কোপ বসাল মেঝেয় বসা নগ্ন রমণীর ঘাড়ে। তার মাথাটা ছিটকে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে ঘাড় থেকে। মেঝের সাদা কালো রঙ ক্রমশ লাল হয়ে গেল। লোকটি এবার উন্মত্তের মত ধেয়ে গেল বিড়ালটার দিকে। প্রাণভয়ে বিড়ালটি লাফিয়ে মেঝেয় নামল! পালাবার জন্য দরজা খুঁজছে, কিন্তু রক্তাক্ত পাথরের মেঝেয় পিছলে যাচ্ছে তার থাবা। নখ দিয়ে হাঁচোড়-পাঁচোড় করছে এগোবার জন্য কিন্তু, এগোতে পারছে না। তাকে ধরার জন্য লোকটি পা বাড়াতেই পিছলে পড়ল। তখন সে হামা দিয়ে এগোতে লাগল বিড়ালটির দিকে।

এই সময় স্বপ্ন দেখার মধ্যেই নড়েচড়ে উঠল রোহিণী। গলগল ঘামে তার বুক পিঠ ভিজে গেছে। মুখ দিয়ে ক্ষীণ একটা ভীত স্বর বেরোচ্ছে। অস্ফুটে সে কিছু যেন বলে উঠল। লোকটি তখন তার লাল পাঞ্জা বাড়িয়ে বেড়ালটিকে ধরল। মুঠিটা ক্রমশ ছোট হতে লাগল গলায়। ধীরে ধীরে নিস্পন্দ হয়ে গেল বিড়ালটি। লোকটি তখন সেটিকে নামিয়ে রাখল মেঝেয়। কাটা মাথা দুটি কুড়িয়ে এনে রাখল মৃত বিড়ালটির পাশে। সারাক্ষণ ঘরে একটুও শব্দ হয়নি। কিন্তু স্বপ্নটি দেখতে দেখতে রোহিণী এবার "মাগো" বলে চেঁচিয়ে, উঠে বসল। কাটা মাথা দুটির মুখ এবং বেড়ালটির মুখ, একজনেরই। রোহিণীর। তার নিজেরই।

নিজের ঘাড়ে হাত রেখে সে কুঁজো হয়ে বিছানায় বসে থাকল অনেকক্ষণ। জানালা দিয়ে ভোরের কমলা রোদ মেঝেয় এসে পড়েছে। সে মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

স্বপ্নটা তার মনকে বসিয়ে দিয়ে গেল অনিশ্চিত একটা জঙ্গলের মধ্যে। নানান কাঁটাঝোপ আর ঘন গুল্ম। এর মাঝে কোথাও একটা বাঘ লুকিয়ে আছে, এমন একটা সন্দেহ সারা সকাল ধরে মাঝে মাঝেই তার মনে উঁকি দিয়েছে। গৌরীর মা কাজে এল। খাঁটি পেশাদারের মত সে দ্রুত হাতে কাজ করতে লাগল বাড়তি কোন কথা না বলে। রোহিণী তাতে অবাক হল। সে আশা করেছিল, জামাইবাবু সম্পর্কে গতকালের অপ্রতিভতা কাটাতে, একঝুড়ি না হোক, একথলি কৌতূহল নিয়ে গৌরীর মা আজ আসবে। কিন্তু তার বদলে মুখ এত গম্ভীর কেন!

"গৌরীর মা, আজ একজন ভাত খাবে। তুমি দোকান থেকে—"।

রোহিণী কথা শেষ হবার আগেই গৌরীর মা উদাসীন স্বরে বলে উঠল, "আমার এখন

দুঘরের কাজ বাকি রয়েছে। আমি যেতে পারব না।"

রোহিণী ঘড়ি দেখল। খবরের কাগজ খুলে খাবার টেবিলে বসে, পড়তে পড়তে আড়চোখে গৌরীর মা'কে মাঝে মাঝে লক্ষ করে গেল। বাঘটা বোধহয় উঁকি দিচ্ছে। একটা অস্বস্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে মনের মধ্যে। কাজ শেষ করে, "যাচ্ছি" বলে যখন গৌরীর মা দরজার দিকে এগিয়েছে, তখন রোহিণী বলল, "হয়েছে কি তোমার, এত গম্ভীর কেন ?"

থেমে, ইতস্তত করে গৌরীর মা বলল, "দ্যাখো বাপু, আমি নয় বোকাসোকা মানুষ, ভুলটুল করতেই পারি। কিন্তু তোমরা তো বইটই পড়া, শিক্ষিত ভদ্দর নোক। বিয়ে না করে পুরুষমানুষের সঙ্গে রাত্তির কাটানো, এটা কেমন কথা ? তোমাদের নয় বদনামের ভয় নেই, কিন্তু আমাদের তো আছে। সোয়ামি নিরুদ্দেশ, বেঁচে আছে কি মরে গেছে জানো না, এখনো সধবাই, আর কিনা এর মধ্যেই এইসব কাণ্ড শুরু করে দিয়েছ ? এমন ঘরে বাপু আর আমি কাজ কত্তে পারব না।" প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে সে দরজা খুলে বেরিয়ে, দড়াম করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

শব্দটা যেন ঠাস করে রোহিণীর গালে চড় বসাল। গুম হয়ে সে তাকিয়ে থাকল খবরের কাগজের দিকে। একটা অক্ষরও তার মগজে ঢুকছে না। গৌরীর মা'র একটা কথা তার মাথায় দপদপ করে যাচ্ছে—এখনো সধবাই, আর কিনা এর মধ্যেই এই সব কাণ্ড শুরু করে দিয়েছ ?

কিছুক্ষণ পর রোহিণী উঠল। ভেবে কোন লাভ নেই। গৌরীর মা'র নৈতিক বোধ তারই থাক, সে কখনো আমার মত অবস্থায় জীবন যাপন করেনি। পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলাই হচ্ছে জীবন। কে কি বলছে বা ভাবছে, তাই দিয়ে নিজেকে চালালে মানুষ কখনোই কিছু করে উঠতে পারে না। আমার নিজস্ব একটা সত্তা আছে, রোহিণী বিড়বিড় করে নিজেকেই শুনিয়ে বলল, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কারুরই হস্তক্ষেপ মানব না। আমার মর্‍্যালিটি আমার কাছে, সেখানে আমি পরিষ্কার। ব্যস। রাজেন এলে ওকে ভাতে ভাতই খেতে হবে।

তাই খেতে হল রাজেনকে। সে সাড়ে দশটায় এসে হাজির হয়। এসেই প্রথম কথা, "কাল যা যা খাব বলেছিলাম—"

"তার একটাও রাঁধা সম্ভব হয়নি। দোকান বাজার আমাকেই করতে হয়, এটা খেয়াল থাকে না কেন ?" রোহিণীর ধীর গম্ভীর স্বর রাজেনকে মিইয়ে দিল।

"কেন ? গৌরীর মা ?"

"সে আমার মত দুশ্চিরত্রার কাজ আর করবে না। আজই বলে গেল, যার সোয়ামী বেঁচে আছে কি মরে গেছে তার ঠিক নেই, সে তো এখনো সধবাই। আর কিনা এই সব কাণ্ড, অর্থাৎ রাত্রে তুমি ছিলে— এটা যেভাবেই হোক ও জেনেছে। সুতরাং চরিত্র রক্ষার জন্য তিনি রিজাইন করবেন জানিয়ে গেছেন।"

"কিন্তু আমরা তো কোনরকম—"

"আহ্ রাজেন," মাছি তাড়াবার মত করে হাতটা মুখের সামনে নেড়ে রোহিণী বলল, "বাদ দাও তো এসব। কাল গেছিলে ?"

"ওহ্, হ্যাঁ। জীবুদার কাছে গেছিলাম, নিয়ে গেলেন সেই ভদ্রলোকের কাছে। তিনি বললেন, আগে ডিভোর্সটা করিয়ে নিতে। বিয়ের রেজিস্ট্রির ব্যাপারটা একদিনেই হয়ে যাবে, বাড়িতে বসেই তিনি করে দেবেন। দু-তিনদিনের মধ্যেই ডিভোর্স স্যুট ফাইল করা

হয়ে যাবে।"

"আর বাড়ির ব্যাপারটা ?"

"জহিরুল নিয়ে গেল ওর পাড়াতেই একটা ফ্ল্যাট দেখাতে। একতলায়, একটু ভেতরের দিকে, দুখানা ঘর। ডাইনিং, কিচেন, যা যা থাকার ঠিকই আছে। টাইল্‌সের মেঝে, জানালা দরজার রঙও ভাল, পেলমেট আছে, দেয়াল পেইন্ট করা, কনসিলড ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং। মুস্কিলটা হল, ভাড়া দু হাজার, পনেরো হাজার সেলামি দিলে ওটা দেড় হাজার।"

"নিয়ে নাও দু' হাজারেই।" রোহিণী বলে উঠল রাজেনের কথা শেষ হওয়ামাত্রই। "এখন তো উঠে যাই। তারপর আরো কমে কোথাও খুঁজে নেব। এই ফ্ল্যাটে আর একমুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না। গঙ্গাদার অনুগ্রহ যথেষ্ট নিয়েছি, আর নয়।"

রাজেন কয়েক সেকেণ্ড রোহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বাসুদেবপুর থেকে ফিরে আজই জহিরুলের কাছে যাব।"

ঠিক সওয়া এগারোটায় তারা তিনতলা থেকে নীচে নেমে এল। এখান থেকে এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে পৌঁছতে বুড়োর পক্ষে মিনিট কুড়ি হয়তো লাগবে। একটু আগে পৌঁছনোই ভাল। একটা জায়গা বেছে নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। চণ্ডীদাস ঘোষাল আসবে নিজের গাড়িতে, গঙ্গাপ্রসাদও তাই। ওরা কেউই বুড়োকে বা রাজেনকে আগে দেখেনি, সুতরাং চিনবে না।

একতলায় নেমেই রোহিণী মাথায় আঁচল তুলে, কালো চশমা পরল। রাজেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই বলল, "ছদ্মবেশ।"

"ফিল্ম অ্যাকট্রেস ভেবে এতে আরো বেশি লোকে তাকাবে। আমার সান হ্যাটটা গাড়িতেই আছে। ওটা পরে সামনে একটু টেনে নামিয়ে নাও, মুখটা আড়াল হবে।"

কথা বলতে বলতে ওরা গেটের কাছে এসে দেখল, তুষার দত্ত কোমরে হাত রেখে খুব মন দিয়ে বুড়োকে নিরীক্ষণ করছে। রোহিণীকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "ঘোমটা! বিয়ে করেছেন নাকি ?"

"করতে যাচ্ছি।"

"কাকে ?"

গাড়ির দরজা খুলে রাজেন ভিতরে ঢুকছে। রোহিণী আঙুল দিয়ে তাকে দেখাতেই তুষার দত্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

"প্রেম করে ?"

"হ্যাঁ।"

"তলায় তলায় তাহলে এই সব চালিয়ে যাচ্ছিলেন ?"

"উপরে উপরে কি প্রেম চালিয়ে যাওয়া যায় ?"

তুষার দত্তর মুখ কালো হয়ে গেল। ত্যারছা চোখে হিলম্যানটার দিকে তাকিয়ে বলল, "শেষে এই একটা ওল্ড লঝ্‌ঝড় গাড়ি জুটল। আমি তো ভেবেছিলুম, মার্সিডিজ নয়তো টয়োটা, নিদেন কণ্টেসা চেপে বিয়ে করতে যাবেন।"

তুষার দত্তর গলায় কেমন যেন একটা জ্বালা রয়েছে, যেটা রোহিণীর কানে সহজেই ধরা পড়ল। কিন্তু রাজেনের গাড়িকে লঝ্‌ঝড় বলাটা তার মনঃপূত হল না।

"লঝ্‌ঝড়ে বুড়োরা খুব ফেইথফুল হয়। কাজ নিয়ে কথা। ও তো আর মোটরশ্রী কনটেস্টে নামতে যাচ্ছে না।" কথা বলে রোহিনী গাড়ির দরজা খুলে রাজেনের পাশের

সিটে বসল।

হঠাৎই তুষার দত্তর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। একটু কুঁজো হয়ে রোহিণীর চোখে চোখ রেখে বলল, "আমার মেয়েকে নষ্ট করতে চাইছেন কেন? সকালে দেখলুম, একটা সেমিজ পরে রয়েছে। রাত্তিরে ওটা পরেই নাকি শুয়েছিল। আমায় দেখে লুকোতে যাচ্ছিল। ক্যাঁক করে ধরে, এমন অসভ্য জিনিস কোথা থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করায়, প্রথমে বলতে চাইছিল না। দুটো থাপ্পড় কষাতে, বলল, আপনি নাকি দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ দিয়েছি!"

"ক্যানোওও।" তুষার দত্ত চেঁচিয়ে উঠে গাড়ির চালে রোহিণীর ঠিক মাথার উপরে কিল বসাল। "নিজে পরেন বলে কি সবাইকে পরাতে হবে? য়্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির মেয়েরা কি এসব পরে?"

রোহিণীর মনে হল, বাঘটা আবার উঁকি দিচ্ছে। মর‍্যালিস্টের পর এবার এই য়্যারিস্টোক্র্যাট! রাতের সেই বীভৎস স্বপ্ন কী যে অশুভ দিন বয়ে আনল, আর এর শেষ যে কিভাবে হবে! পাশে মুখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে সে বলল, "রাজেন আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

রাজেন স্টার্ট দিল। রোহিণীকে স্বস্তি দিয়ে বুড়ো কাশাকাশি না করেই গর্জন করে উঠল। তুষার দত্তর দিকে তাকিয়ে নড করে, রাজেন গাড়ি ছাড়ল।

"এখানে থাকতে হলে ভদ্রভাবে থাকতে হবে, বুঝলেন?..." তুষার দত্তর চিৎকার পিছনে ফেলে হিলম্যান সল্ট লেক থেকে বেরিয়ে এল। রাজেন শুধু একবার বলেছিল, "অ্যাডভান্‌টেজ নেবার চেষ্টা করেছিল?"

"হ্যাঁ।" রোহিণীর মুখে ফিকে একটা হাসি ফুটতে ফুটতেও মিলিয়ে গেল। "মেয়েটা আর বৌয়ের জন্য কষ্ট হয়।"

"এই রকম বাপ আর স্বামী হাজার হাজার আছে, সুতরাং কষ্টটা মন থেকে ঝেড়ে ফেল।"

"বলামাত্রই ঝেড়ে ফেলা যায় কি? গৌরীর মা, তুষার দত্ত, এরা ছারপোকার জাত। কামড়ালে চুলকোয়, পিষে মারলে আঙুলে গন্ধ লেগে থাকে। বারবার তোষক-গদি উল্টেপাল্টে খুঁজতে হয়, কোথায় এরা লুকিয়ে আছে!"

"তার থেকে অনেক নিশ্চিন্ত হতে পারবে, যদি পুরণো তোষক-গদি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, মানে মন থেকে চিন্তা থেকে নির্মূল করে, একেবারে নতুন হয়ে উঠতে পার। আর তা করতে হলে প্রথমেই তোমাকে এই বাসুদেবপুর যাওয়াটা বন্ধ করতে হবে।"

রাজেন গাড়ির গতি কমাল।

"কেন বন্ধ করব! এতদূর পর্যন্ত এসে শেষ না দেখে ফেরা যায় না।"

"যায়, জীবনকে খুব বাস্তব দিক থেকে দেখার চেষ্টা করলে, এই যাওয়ার কোন পজিটিভ লাভ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধরা যাক, শোভনেশ সেনগুপ্তর দামী দামী অনেক ছবি গঙ্গাপ্রসাদ বাড়ুজ্জে হাতিয়ে নিয়ে বাসুদেবপুরে রেখে দিয়েছে, সেগুলো বিক্রি করে সে বহু টাকা কামাচ্ছে বা কামাবে।" রাজেন কয়েক সেকেণ্ড কথা বন্ধ রেখে বলল, "তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি! তুমি কি ওই টাকার ভাগ চাও?"

"মোটেই না। আমি তো বরাবরই বলে এসেছি—" রাজেন বাঁ হাত তুলে রোহিণীকে থামিয়ে দিল।

"তাহলে আমাদের কী দরকার, এই তথাকথিত একটা রহস্যর পিছু নিয়ে সময় নষ্ট

করার আর গাড়ির তেল পোড়াবার ? রুনি একটা কথা বলো, গত দশ-বারো দিনে তুমি এমন কী পেয়েছ— ভয়, অপমান আর মানসিক কষ্ট ছাড়া, যার মধ্যে নিজেকে পরিচ্ছন্ন, তাজা, আনন্দভরা মনে হয়েছে ? বেঁচে থাকার একটা.........কিছুই পাওনি। আজেবাজে লোকেদের নোংরামি আর স্বার্থপরতা দেখে আর ভেবে—।"

"এবার থামো তো। গত দশদিনে আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ জানাটা জেনেছি.....বুড়োকে ঘোরাও।"

রোহিণীর গজদাঁতটা দেখা গেল ঠোঁটদুটো একটু বেশি ছড়িয়ে পড়ায়। রাজেন ব্রেক কষল। রোহিণী সান গ্লাস খুলে চোখ দুটি মেলে দেখাল তার অহঙ্কারের সুখাবেশ।

"কী জেনেছ ?"

"জেনেছি, ভালবাসার পরীক্ষা দেবার জন্য একটা লোক কী কঠোর ভাবে নিজেকে ডিসিপ্লিনড করতে পারে, জেনেছি, আমি খুব সাধারণ তুচ্ছ নই, জেনেছি......।" আবেগে রোহিণীর কথা বন্ধ হল।

"বলে যাও, থেমো না।" মৃদু স্বরে রাজেন বলল।

"আর আমি জানি না। সব যেন কেমন এই মুহূর্তে গুলিয়ে যাচ্ছে....একটা দুর্দান্ত ফিলিংস রাজেন, যা সব মেয়েই জীবনে পেতে চায়, সর্বক্ষণ জমিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। পৃথিবীতে গাদাগুচ্ছের সেঞ্চুরি হচ্ছে, তার মধ্যে একটা শুধু আমার জন্যই হবে, এটা জানিয়ে, প্রতিজ্ঞা নিয়ে একজন মাঠে নেমে সেটা করে নিয়ে এল। আমাকে সে মর্যাদা দিল, সম্মান দিল, আমি কি যে সে মেয়ে !"

মুখোমুখি দুজনের দৃষ্টি একটি বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। উভয়ের দৃষ্টিপথ বেয়ে প্রবাহিত হল গাঢ় অনুরাগ, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

"ভীষণ খিদে পাচ্ছে।" রাজেন বলল।

"না না, রাস্তার মধ্যে ওসব নয়, বাড়ি ফিরে—"

"আরে, সত্যিকারের খিদে পেয়েছে !"

"তার মানে ? তোমার তো একটাই খিদে !"

"কখন আলু ভাতে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি বল তো ? এটা পাকস্থলির বাস্তব খিদে।"

"বাগুইআটি তো সামনেই, দই আর সন্দেশ কিনে খেয়ে নাও।"

"উঁহু। এয়ারপোর্টে হোটেলেই আমরা যাব তবে অন্য উদ্দেশ্যে, লাঞ্চ করতে।"

"সেই ভাল। আমারও বেশ খিদে পাচ্ছে।"

রাজেন গাড়ি ছাড়ল। বাগুইআটির মোড় পার হয়ে সে বলল, "মানুষ কত রকম ঝোঁকের মধ্যে যে জীবনকে টেনে নিয়ে যায়, তা এইসব লোকগুলোকে দেখলে বোঝা যায়। টাকার ঝোঁক, প্রেমের ঝোঁক, প্রতিহিংসার ঝোঁক, উন্মাদ হয়ে যাবার ঝোঁক।"

"আমিও কৌতূহলের ঝোঁকে পড়েছিলাম।"

"এখন আর নেই ?"

"এখন শুধু ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর ঝোঁক।" স্টিয়ারিং থেকে রাজেনের বাঁ হাতটা তুলে রোহিণী তার ডান উরুর উপর রাখল, রাজেন হেসে ফেলল।

এয়ারপোর্ট হোটেলের সামনে কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। হোটেলের পার্কিং জোন-এ একটি অ্যাম্বাসাডরও একটি জিপ। তাদের পাশেই রাজেন হিলম্যানকে রাখল।

হোটেলের রেস্টুরেন্টে ঢুকেই তাদের চোখ পড়ল ঘরের শেষপ্রান্তে এক কোণে টেবিলে মুখোমুখি বসে তিনটি লোক। তারা খাওয়ায় ব্যস্ত। টেবিলের ওপর চারটি বীয়ারের

বোতল। চতুর্থ চেয়ারটি খালি কিন্তু প্লেটে আধ খাওয়া একটা তন্দুরী চিকেন রয়েছে। দরজার দিকে তাকিয়ে বসা লোক দুজন রাজেন ও রোহিণীর দিকে তাকাল। রোহিণীর ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

"ওদিকে বসব না, এখানেই দেয়ালের পাশে বসা যাক্।" রোহিণী চাপা স্বরে বলল।

"কেন, আর একটু এগিয়ে—"

"না।" রোহিণী টেবিলে ঝোলাটা রেখে চেয়ার টেনে লোকগুলির দিকে পিছন ফিরে বসে বলল, "ওখানে বসা একটা লোকের মুখ কালই দেখেছি মীনা চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে, মীনাকে পাহারা দিচ্ছিল।"

রাজেন সামনে তাকিয়ে বলল, "ওরা তোমার দিকে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে তোমাকে নিয়েই কিছু যেন বলছে।"

"বলুক গে। কিন্তু এই সময় ওরা এখানে কেন! বাসুদেবপুর যাবার তো এটাই রাস্তা। তাহলে কি—।"

রোহিণী কথা অসমাপ্ত রাখল রাজেনের চোখ দেখে। সে যে অপ্রত্যাশিত কিছু একটা দেখতে পেয়েছে।

"মাই গড!" রাজেন ফিসফিস করল। "এখানে মীনা চ্যাটার্জি! খালি চেয়ারটায় বসল, টয়লেট থেকে এসে। গ্লাসে বীয়ার ঢালছে। একটা লোক ওকে কি যেন বলল, বীয়ার ঢালা বন্ধ করে শুনছে, পিছনে তাকিয়ে দেখছে, তোমাকেই। চেয়ার থেকে উঠল, আমাদের দিকে আসছে, হাতে ভর্তি গ্লাস, মুখে মস্ত হাসি, পায়ের স্টেপিং গোলমেলে, বোধ হয় অনেকক্ষণ বসে খাচ্ছে।" রিলে করার মত রাজেন বলে গেল রোহিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে এবং কোনরকম ভাবান্তর না ঘটিয়ে।

"হ্যালো মিসেস সেনগুপ্ত।" মীনা একটা হালকা থাপ্পড় কষাল রোহিণীর কাঁধে। রোহিণী এতটা উৎফুল্ল ঘনিষ্ঠতা আশা করেনি। একটু বেশি করেই চমকে উঠে রোহিণী বলল, "আরে আপনি এখানে?"

"কেন আমি কি এখানে আসতে পারি না? শুধু কি আপনিই আসবেন?" রোহিণীর পাশের চেয়ারে বসে মীনা হাসিমুখে রাজেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইনি?"

"আমার বন্ধু।"

"বাড়ি থেকে এতদূরে.....বন্ধুর সঙ্গে।" বলেই মীনা তার কথার তাৎপর্যটা বোঝাতে হাসল। তারপর চুমুক দিয়ে গ্লাসটা অর্ধেক করে টেবলে ঠকাস্ করে রাখল। "আমিও এসেছি বন্ধুদের নিয়ে, ভুল বললাম, বন্ধুদের রিসিভ করার জন্য। ওরা একটা মহত কাজে গেছিল।" মীনা ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, "কাজটা কী, জানেন মিসেস সেনগুপ্ত?"

রোহিণীর মনে হল একটা কেউটে ফণা তুলে তার মুখের কাছে দুলছে। তার শরীর সিরসির করে উঠল। মাথা নেড়ে শুকনো গলায় বলল, "না, জানি না।"

"শোভনেশ সেনগুপ্তর আঁকা সব ছবি, ওঁর নষ্ট মনের কাজ আর লোকের চোখের সামনে আসবে না। সব ভস্মীভূত, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

"কোথায়, কবে, কখন পুড়ল?" রোহিণী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল।

গ্লাসের বাকি বীয়ারটুকু শেষ করে মীনা চোখ বুঁজে বসে রইল। কী একটা আবেগ যেন দমন করার জন্য সে নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চালাচ্ছে। হঠাৎ চোখ খুলে বলল, "উনি যা চেয়েছিলেন আমি তাই করেছি, কোন অন্যায় কোন পাপ আমি করিনি....করেছি কি?"

"ছবিগুলো তো বাসুদেবপুরে—"

"গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ি আজ ভোরেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মীনা চ্যাটার্জির সঙ্গে লাগতে এলে, তার কী ফল হতে পারে, ওই মোটা বেঁটে মর্কটটার এবার তা মালুম হবে। সুখবরের জন্য আমি দশটা থেকে এখানে অপেক্ষা করছিলাম। আধঘন্টা আগে ওরা ফিরল। কাম ফতে।" মীন শেষ শব্দটা বলল টেবলে ঘুঁষি মেবে এবং উঠে দাঁড়াল।

"কিন্তু ওইসব ছবির মধ্যে তো অনেকগুলো আসল কাজও ছিল, খুব ভাল কাজ।"

"যাক্ আসল ছবি, যাক ভাল কাজ।" মীনা হঠাৎ গলা চড়িয়ে দেহটা টানটান করে বলল, "ধ্বংস হয়ে যাক্ অতীত তার ভাল আর মন্দ নিয়ে, শোভনেশ সেনগুপ্ত আবার নতুন করে শুরু করবে, আবার সে রঙতুলি নিয়ে দাঁড়াবে ক্যানভাসের সামনে।" মীনার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে, দেহ ঈষৎ টলে উঠল। "আমি ওকে দাঁড় কবাব। বুঝলেন, আমি ওকে—"

মীনার চিৎকার শুনে ওর সঙ্গীরা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন উঠে দ্রুত মীনাব কাছে এসে দু হাতে ওর দুকাঁধ ধরে বলল, "বী কোয়ায়েট মীনা, বী কোয়ায়েট.......এবাব আমবা যাব, চলো এখন। এটা পাবলিক প্লেস, এখানে ইনডিসেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।"

লোকটিকে বোহিণী মীনার ফ্ল্যাটে প্রথম দিন দেখেছে। মীনা একে 'বাচ্চুদা' বলে ডেকেছিল। গতকাল টেলিফোনেও মীনা এর কাছেই সাহায্য চেয়েছিল।

"মিস চ্যাটার্জি, কাগজেব লোকজন সর্বত্রই আছে। ব্যাড পাবলিসিটি পেয়ে গেলে আপনার ক্ষতিই হবে।" কথাগুলোকে বলে রোহিণী যা আশা করেছিল, তাই হতে দেখল। মীনার চোখমুখ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এল, বাচ্চুদার হাতদুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "এক্সকিউজ মী, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, হবার মতই একটা ঘটনা, নয় কি ?"

"অবশ্যই," রোহিণী ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "শোভনকাকাকে কলঙ্কমুক্ত করলেন, ভবিষ্যতে মানুষ আব তার খাবাপ ছবিগুলো দেখতে পাবে না, এটা তো উত্তেজিত হবার মতই ব্যাপার। এবার আপনি নিজের টেবিলে গিয়ে বসুন।"

বোহিণী তাকে ব্যঙ্গ করল কিনা, সেটা মীনা ঠাওর করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আপনি কি খুব কষ্ট পেলেন ?"

"মোটেই না। কেননা আমিও আমার অতীত ধ্বংস করার জন্য উদগ্রীব, তাই শোভনেশ সেনগুপ্ত নামটাও আর শুনতে চাই না। মনে আছে, কী উপদেশ আমায় দিয়ে ছিলেন ? সেটাই এবার পালন করব। সামনে যে লোকটি বসে, উনিই আমার ভবিষ্যৎ স্বামী," রোহিণী উঠে দাঁড়াল। মীনা হতভম্বের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে। "রাজেন ওঠো, এখানে আর আমার ভাল লাগছে না, অন্য কোথাও খেয়ে নেব।"

ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে রোহিণী কারুর মুখের দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাজেন লাফিয়ে উঠে তার পিছু নিল।

হোটেলের গেট থেকে গাড়ি বেরোতেই রোহিণীর চোখে পড়ল, কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে জলপাই রঙের মারুতি। চণ্ডীদাস ঘোষাল অপেক্ষা করছে। কোন লাভ নেই অপেক্ষা করে, গঙ্গাপ্রসাদ ব্যানার্জি আর আসবে না। এই কথাগুলো ওকে বলে দেবে কিনা, রোহিণী তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতেই গাড়ি অনেক দূর চলে গেল। থাক্‌গে, দাঁড়িয়ে আছে তো থাকুক। অনেক কিছুই তো জীবনে না-বলা থেকে যায়। ওর বাড়িতে অত যত্নে শ্রদ্ধায় টাঙানো ছবিটা যে জাল, সে কথা তো চণ্ডিদাসকে বলা যায়নি। আসল ভেবে যদি

পুজো করে তৃপ্ত হয়, তাহলে দরকার কী ভুলটা ভাঙ্গিয়ে। এতে কারুরই তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না !

"কি ভাবছ ?" রাজেন জানতে চাইল।

"মনটা কি রকম হয়ে গেল। ছবিগুলোর জন্য তো বটেই, মীনা চ্যাটার্জির মানসিক অবস্থার কথা ভেবেও। প্যাথেটিক।"

"আসলে হালভাঙ্গা, পাল ছেড়া জীবনের এই অবস্থাই হয়। যখন যেরকম আবেগের ধাক্কা, পরিস্থিতির ধাক্কা লাগে, ওরা তখন সেইদিকেই ভেসে যায়। জীবন আর জগৎ সম্পর্কে একটা ধারণা, একটা দৃষ্টিভঙ্গি— অর্থাৎ কি চাই, কি করণীয়, করার জন্য একাগ্রভাবে লেগে থাকা, অচঞ্চল অটলভাবে ঝড়ঝাপটার বিরুদ্ধে সাহস নিয়ে দাঁড়ানো......এসবের জন্য চাই চরিত্র, সেটাই ওই মীনার মত লোকদের নেই। তাই অত রোমাণ্টিক হয়, আজেবাজে কথা বলে, আচরণ করে।" কথা বলতে বলতে রাজেন আড়চোখে দেখল, রোহিণী ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেপের ক্যাসেট বার করল, হাতটা তুলেছে সেটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলার জন্য। রাজেন সিলি পয়েণ্টে ক্যাচ ধরার মত বিদ্যুৎগতিতে বাঁ হাত বাড়িয়ে রোহিণীর হাত থেকে ক্যাসেটটা ছিনিয়ে নিল।

"পাগল হয়েছ ! কেউ কুড়িয়ে পেয়ে ওটা যদি বাজিয়ে শোনে, তাহলে ?"

"আমি আর ওটা রাখতে চাই না, ওটাও ধ্বংস হোক।"

"ওতে আছে পরমেশের কনফেসন। পাগলের প্রলাপ বলে কোর্টে হয়তো উড়িয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু গীতার কথা সত্যি বলে ধরে নিলে শোভনেশ সেনগুপ্ত খুনী নন।"

"তোমাকে আবার বলছি রাজেন, এসব নিয়ে আর একটা কথাও আমি শুনতে চাই না ! কে খুনি আর কে নয়, তাতে আমার আর কোন কৌতূহল নেই। আমি ভুলে যেতে চাই, ভুলে যেতে চাই, ভুলে যেতে চাই।" রোহিণী প্রায় মীনা চ্যাটার্জির মতই চীৎকার করে দুহাতের তালুতে মুখ ঢাকল।

সারা পথে একবার ছাড়া তার আর কথা বলেনি। পথে মিষ্টির দোকান দেখে রাজেন বলেছিল; "কিছু কি কিনব ?"

"খিদে নেই।"

সল্ট লেকে ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নামার সময় রাজেন হালকা চালে বলল, "মীনা চ্যাটার্জি তখন চীৎকার করে বলল, 'আমি ওকে দাঁড় করাব', কিন্তু যাকে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকাবে, সেই লোকটির তো পাত্তা নেই !"

"গঙ্গাদার ওপর প্রতিশোধ নেবার আনন্দে বোধহয় ওর এটা মনে ছিল না।"

"তুমি ওপরে যাও, আমি আর একবার জহিরুলের কাছে ঘুরে আসি, ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা আর একদিনও দেরি করা ঠিক হবে না। যা টাকা চাইছে, তাতেই রাজি হয়ে যাই।"

"আজ থাক্, বড় ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে। বরং কাল যেও। এখন একা থাকলে আমিই বোধহয় পাগল হয়ে যাব।"

তিন তলায় উঠে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে তারা ভিতরে ঢুকল। পাল্লাটা বন্ধ করার সময় রোহিণী বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখল, চারতলার সিঁড়িতে সুজাতা গুপ্ত দাঁড়িয়ে। বিস্রস্ত মলিন শাদা সাড়ি, চুল বাঁধা নেই, মুখ শুকনো, চোখ বসা। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি, যার অর্থ বোঝা অসম্ভব।

"মাসীমা ! কখন এলেন ?" রোহিণী প্রাথমিক চমক কাটিয়ে, পাল্লাটায় হাত রেখে স্বস্তিভরে বলল।

হাসিটা মুখে রেখেই সুজাতা ধীর পদক্ষেপে নেমে এলেন।

"বহরমপুর গেছিলাম। সেখান থেকে তোমার জন্য সুখবর এনেছি।"

রাজেন এসে দাঁড়াল রোহিণীর পাশে। সুজাতা তাকে দেখে বললেন, "ইনিই তোমার হবু স্বামী?"

"হ্যাঁ।"

"সুখে থাকো দু'জনে।" সুজাতার স্বরে শ্রান্তি, চোখ শান্ত।

"কিন্তু সুখবরটা কি মাসিমা?" রোহিণী ব্যগ্র হল।

"শোভনেশ মারা গেছে। তুমি বিধবা হয়েছো।"

কথাটা বলেই সুজাতা ঘুরে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, তখন রোহিণীর আর্তনাদটা শুনলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন।

"আমি জেল সুপারের সঙ্গে কথা বলেছি। হাসপাতাল থেকে শোভনেশ আর তার সঙ্গে একজন পালিয়ে গেছিল ঠিকই। পালিয়ে গেছিল নসিপুর স্টেশনে, ট্রেনেও ওঠে। তখন ওখানে কম্যুনাল রায়ট চলছে। দাড়ি গোঁফ, লুঙ্গি, এই সবই ওর কাল হল। ট্রেন থেকে নামিয়ে বহু লোককে মারা হয়, তার মধ্যে শোভনেশ আর তার সঙ্গীও ছিল। শোভনেশের লাশ পুলিশ সনাক্ত করেছে। পুড়িয়েও দিয়েছে।"

সুজাতা গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন দেয়াল ধরে ধরে। সিঁড়ি ঘোরার সময়ে আর একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। রাজেনের বুকে মুখ চেপে রোহিণী তখন ফোঁপাচ্ছে। রাজেনের বাহু পিঠে বেড় দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে ওর কাঁধ।

সুজাতা গুপ্ত দেখে শুধু মাথা নাড়লেন।

রাজেন দুহাতে জড়িয়ে রোহিণীকে এনে ডাইনিংয়ের চেয়ারে বসাল। এখন কথা বলার সময় নয়। রোহিণী শুধু শূন্য দৃষ্টিতে রাজেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রাজেন জানে, এই শূন্যতা প্রকৃতির নিয়মের মতই বেশিক্ষণ থাকবে না। সে চায়ের জল চড়াতে গেল রান্নাঘরে।
